শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শাঙ্কর দর্শন

(প্রথম ভাগ)

শ্রী[illegible] এম. এ. ।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শাঙ্কর দর্শন

প্রথম ভাগ।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত এম. এ।
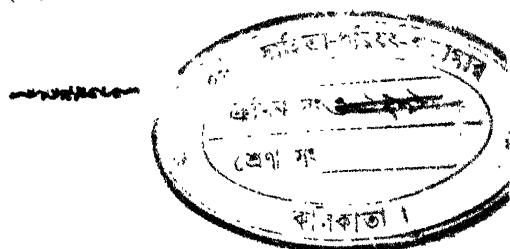
আষাঢ়, ১৩২০ বাং।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পাট বা নালিতা।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত, এম, এ, এ-আর-এ-ছি,

ভূত-পূর্ব্ব কৃষি অধ্যাপক, শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ

প্রণীত।

নব্য-ভারত ঃ— "পাট বা নালিতা উপযুক্ত হাতে পড়িয়া সার্থক হইয়াছে। ইহার ভাষা সুন্দর ও সকলের বোধগম্য। যে সকল যুবক চাকুরীতে নারাজ, তাহারা এই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া বেশ দশটাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন।"

ভারতী ঃ— "গ্রন্থকার শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে কৃষি-অধ্যাপক ছিলেন। গ্রন্থখানি তাঁহার গবেষণা ও বহুদর্শিতার ফল। গ্রন্থ খানিতে পাটের চাষ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে পাট সম্বন্ধে বেশ জ্ঞান লাভ করা যায়। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি ব্যবসায় সাহিত্য বিভাগে বাঙ্গলা ভাষায় একটি গুরুতর অভাব মোচন করিয়াছে।"

নায়ক (২৭ ভাদ্র) ঃ—গ্রন্থকার শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ভূতপূর্ব্ব কৃষি অধ্যাপক। তিনি বৈজ্ঞানিক ভাষায় পাটের চাষ হইতে শিল্পে পাটের ব্যবহার পর্য্যন্ত পাট সংক্রান্ত তাবৎ বিষয়ের বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুলভ।

J. E. Webster, I. C. S :— "It seems to be a very learned and instructive work."

প্রাপ্তব্য —ঃউক্ত 'পাঠ বা নালিতা' এবং এই 'শঙ্করাচার্য্য ও শাঙ্কর দর্শন' নামক গ্রন্থদ্বয় কলিকাতা নিম্ন লিখিত স্থানে প্রাপ্তব্য।

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি, ৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
সিটিবুক সোসাইটি, ৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট্।
ইণ্ডিয়ান পাবলিসিং হাউস, ২২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সনস্ ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

শঙ্করের জন্ম ও বাল চরিত।

বিষয়		খণ্ড	পৃষ্ঠা।
আনন্দগিরি মতে শঙ্করের জন্ম	...	১	১— ২
মাধবাচার্য্যের বর্ণিত শঙ্করের জন্ম	...	২	২— ৮
শঙ্করের বাল চরিত্র এবং গুরু-গৃহে বাস	...	৩	৯—১১

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শঙ্করের শিষ্যবর্গের অভ্যুদয়।

বিষয়		খণ্ড	পৃষ্ঠা।
শঙ্করের শিষ্যবর্গ	...	৪	১২—১৪
উভয়-ভারতী ও মণ্ডনমিশ্র	.	৫	১৪—২১

তৃতীয় অধ্যায়।

শঙ্করের কুমার-চরিত এবং সন্ন্যাস গ্রহণ।

বিষয়		খণ্ড	পৃষ্ঠা।
শঙ্করের মাতৃ-সেবা	..	৬	২২—২৪
সরস্বতী নদী কর্ত্তৃক শূদ্র ব্রহ্মর্ষি কবষের অনুগমন		৭	২৪—২৫
কেরলরাজ রাজশেখর	..	৮	২৫—২৭
উপমন্যু প্রভৃতি ঋষিগণের সমাগম	...	৯	২৭—২৯
শঙ্করের জীবন-সন্ধি	...	১০	৩০—৩২
শঙ্করের সন্ন্যাসে মাতার অনুমতি দান	...	১১	৩২—৩৪
গোবিন্দনাথের আশ্রমে শঙ্করের প্রবেশ	...	১২	৩৫—৩৭
গোবিন্দনাথের নিকটে শঙ্করের দীক্ষা	...	১৩	৩৭—৪০
শঙ্করের সমাধি ...	...	১৪	৪১—৪২
শঙ্করদ্বারা জলপ্লাবনে পীড়িত লোকের দুঃখ-নিবারণ		১৫	৪২—৪৪
শঙ্করের প্রতি গোবিন্দনাথের উপদেশ		১৬	৪৪—৪৬
শঙ্করের অদ্বৈত বিদ্যার প্রভাব	...	১৭	৪৬—৪৮

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠা।

শঙ্করের কাশীগমন	...	১৮	৪৯—৫০
সনন্দনের শিষ্যত্ব	... ...	১৯	৫০—৫১
চণ্ডাল কর্ত্তৃক শঙ্করের পরীক্ষা	...	২০	৫১—৫৫
মহাদেবের আবির্ভাব ও শঙ্করের স্তব	...	২১	৫৫—৫৭
ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা	...	২২	৫৮—৬০
সনন্দনের পদ্মপাদ নামকরণ	...	২৩	৬০—৬১
ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যার ইতিহাসে শঙ্করের স্থান		২৪	৬২—৭০

পঞ্চম অধ্যায়।

শঙ্করের সিদ্ধান্ত ও বিচার।

শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত	...	২৫	
শঙ্করের অদ্বৈত মত	...	„ (ক)	৭১—৭৭
আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ	...	„ (খ)	৭৭—৮২
ব্রহ্ম-জ্ঞান বিষয়ে শ্রুতিপ্রভৃতির প্রামাণ্য-বিচার		„ (গ)	৮২—৯১
ব্রহ্ম-বিদ্যায় শূদ্রের অধিকার বিচার	...	„ (ঘ)	৯১—৯৮
ব্যবহারিক দ্বৈতবাদ	...	„ (ঙ)	৯৮—১০৩
জীবের পুরুষকার এবং ঈশ্বরের বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য		„ (চ)	১০৪—১১০
ঈশ্বরই জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ		„ (ছ)	১১০—১২২
দেহাত্মবাদ খণ্ডন	... ...	২৬	১২২—১৩৭

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শঙ্করের অপরাপর দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

আত্মানাত্ম-বিবেক	... ...	২৭	
কার্য্যকরণ-সঙ্ঘাত	... ...	„ (ক)	১৩৮—১৪০
পঞ্চকোষরূপে দেহেন্দ্রিয়াদির কল্পনা	...	„ (খ)	১৪০—১৪৭

ব্রহ্মসূত্রে "আনন্দময়" ...	,, (গ)	১৪৭—১৫০
বিবেক-চূড়ামণিতে পঞ্চকোষ বিভাগ ...	,, (ঘ)	১৫০—১৫৩
স্থূল, সূক্ষ্ম, এবং কারণ শরীর ...	,, (ঙ)	১৫৩—১৫৪
বৃহদারণ্যক ভাষ্যে আত্মার ব্যতিরিক্তত্ব বিচার	,, (চ)	১৫৫—১৬১
বৃহদারণ্যকে বুদ্ধ্যাদির সহিত আত্মার সম্বন্ধ বিচার	,, (চ)	১৬২—১৬৪
বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে আত্মার স্বয়ং-জ্যোতি-স্বরূপত্ব	,, (ছ)	১৬৫—১৬৮
বুদ্ধদেব এবং বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ...	,, (জ)	১৬৯—১৭৫
বাহ্যার্থের ব্যতিরিক্ত-চৈতন্য গ্রাহ্যত্ব ...	২৮	১৭৫—১৭৭
বিজ্ঞানের ব্যতিরিক্ত-চৈতন্য গ্রাহ্যত্ব ...	২৯	১৭৭—১৮২
বৌদ্ধদিগের ক্ষণভঙ্গবাদ খণ্ডন ...	৩০	১৮৩—১৮৭
শঙ্করের মায়াবাদে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের প্রভাব	৩১	১৮৭—২০০
পুনর্জন্মবাদ—	৩২	
ঋগ্বেদে জীবের অমরত্ব	,, (ক)	২০১—২০৩
পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা	,, (খ)	২০৩—২১০
কঠোপনিষদে পুনর্জন্মবাদ ...	,, (গ)	২১০—২১১
পৌরাণিকমতে পুনর্জন্মবাদ ...	,, (ঘ)	২১১—২১৫
শারীরক সূত্রে পুনর্জন্ম মত ...	,, (ঙ)	২১৫—২১৬
স্মৃতির বিচ্ছেদে ব্যক্তিগত একত্বের বিচ্ছেদ	,, (চ)	২১৬—২১৯
জাতিস্মর কল্পনা	,, (ছ)	২১৯—২২২
পুনর্জন্মবাদের সহিত ক্রমবিকাশবাদের তুলনা	,, (জ)	২২৩—২২৬

উৎসর্গ-পত্র।

উনবিংশ শতাব্দিতে যে মহাপুরুষ স্বীয় জীবনে বিশ্ব-প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন,

যাঁহার প্রদর্শিত বিশ্ব-প্রেমের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, মূর্খ-জ্ঞানী, সকলেই মনে করিতেন, তিনি আমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করেন,

যে মহাত্মা ক্রম-বিকাশের সূত্রে পৃথিবীর ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সকলকে সর্ব্বাত্মবাদের উচ্চনীচ সোপান-পরম্পরারূপে প্রদর্শন করিয়া 'সর্ব্বধর্ম্ম' নামে একত্রে গ্রথিত করিয়া নিয়ত বলিতেন,—"ঋজু-কুটিল-পথ-জুষাং নৃণামেকোগমাস্তমসি পয়সামর্ণব ইব",

পূতিগন্ধযুক্ত গলিত কুষ্ঠীর গায়ের দুর্গন্ধে অন্য কেহ নিকটে তিষ্ঠিতে না পারিলেও,—যিনি সেই গলিত কুষ্ঠীকেও কলিকাতার কুষ্ঠাশ্রম হইতে সঙ্গে আনিয়া সর্ব্বদা পুত্রবৎ পার্শ্বে বসাইয়া আহার করাইতেন, এবং তাহার মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বেও আদরে তাহার সেই বাঙ্গিফাটা গাত্র সর্ব্বদা স্পর্শ করিতেন,

যিনি বুভুক্ষু শীর্ণকায় মলিন-বসন পথের উন্মাদকেও সন্তানের ন্যায় হাত ধরিয়া সাদরে বসাইয়া, স্বহস্তে তাহার মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেন,

যাঁহার সর্ব্বময় জীবনের উজ্জ্বল আলোক লাভ করিয়া এই গ্রন্থকারের চিত্ত শঙ্করাচার্য্যের সর্ব্বাত্মবাদের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল।

বৈদিক ঋষি বামদেব যেমন সর্ব্বাত্মত্বে সিদ্ধিলাভ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমিই মনু হইয়াছিলাম, আমিই সূর্য্য"—উনবিংশ শতাব্দিতে যিনি সর্ব্বাত্মসিদ্ধিলাভ করিয়া গান করিয়াছিলেন,—"মিশে গেল শরীরমন, আমার বলে নাই কিছু ধন, আমার দেহের পরমাণু বলে নিলাম আমি জগতের ভার,"

স্বর্গত সেই আচার্য্যদেব

শ্রীমৎ স্বামী আনন্দচন্দ্র নন্দী।

মহাশয়ের নামে এই গ্রন্থ সাদরে সবিনয়ে ভক্তির উপহার স্বরূপ উৎসর্গীকৃত হইল।

ভূমিকা।

—o—

আজ প্রায় পচিশ বৎসরের ও অধিক হইল, আমি শঙ্করাচার্য্যের জীবনী এবং গ্রন্থাবলীর অনুবাদ প্রকাশ করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, এবং বন্ধু বান্ধবদিগকে তাহা জানাইয়াছিলাম। সেই সময়ে বেদান্তবাদ (Vedantism), এবং শঙ্করাচার্য্য নামে আমার দুইটি ইংরাজি বক্তৃতা ও প্রকাশিত হইয়াছিল। অধ্যাপক মোক্ষমূলার তাহার রচিত 'হিন্দু ষড়্‌দর্শন' (The Six Systems of Hindu Philosophy) নামক গ্রন্থে স্থানে স্থানে* সেই বক্তৃতাদ্বয় এবং তৎপরে প্রকাশিত 'মোক্ষ' ('Moksha' published in the journal of the Royal Asiatic society of Great Britain and Ireland, vol X X, part 4) নামক প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। ভ্রমবশতঃ তিনি আমার নাম 'দ্বিজদাস' স্থলে 'দিব্যদাস' করিয়াছেন। সেই সময়ে আমার নিজের ব্যবহারের জন্য মাধবাচার্য্যকৃত শঙ্করদিগ্বিজয়ের একটী বঙ্গানুবাদ করিয়া রাখিয়াছিলাম, এবং ভারতী ও নব্যভারত পত্রিকায় 'মণ্ডন-শঙ্কর সম্বাদ' প্রভৃতি শঙ্করের জীবনের কোন কোন অংশ প্রকাশ ও করিয়াছিলাম। কিন্তু "কর্ম্মণ্যেবা[illegible]রস্তে মা ফলেষু কদাচন।" সঙ্কল্প করা এবং সঙ্কল্পসিদ্ধির [illegible] তেই মাত্র মানুষের অধিকার। সঙ্কল্পের সিদ্ধি ভগবানের অধিকার। ঘটনার চক্রে আমাকে অন্য দিকে এরূপ ব্যাপৃত থাকিতে হইল, যে ২৫ বৎসরের মধ্যে সঙ্কল্পিত কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার অবসর পাইলাম না। এমন কি, আমার সমস্ত পরিশ্রমের ফল,

* See pages 55, 155, 165 and 166 of Max Muller's Six Sytems of Hindu Philosophy.

লিখিত কাগজ পত্রাদি নষ্ট হইয়া যাইত, যদি আমার পুত্র শ্রীমান উল্লাসকরের চিত্ত আমার সঙ্কল্পিত কার্য্যের প্রতি আকৃষ্ট না হইত। শঙ্কর সম্বন্ধে আমার হস্ত-লিখিত পুস্তকাদি এবং সংগৃহিত গ্রন্থাদি দেখিয়া উল্লাস আহ্লাদের সহিত একদিন আমাকে বলিল, "বাবা, তোমার শঙ্করাচার্য্য প্রকাশের এখন সময় আসিয়াছে। আমি তোমার এই কার্য্যে সাহায্য করিব।" এই বলিয়া উল্লাসকর সেই সমস্ত পুঁথিপত্র যত্নের সহিত একত্র বান্ধিয়া রাখিল। উল্লাসের সাহায্যলাভ করা আর আমারপক্ষে ঘটিয়া উঠিল না। বৃদ্ধ বয়সে, ক্ষীণ চক্ষু, এবং ক্ষীণমস্তিষ্ক লইয়া আমাকে একাকীই সঙ্কল্পিত কার্য্য শেষ করিতে হইতেছে। তবে আমার অনেক আত্মীয় এবং আত্মীয়া দয়া করিয়া হস্তলিপি এবং প্রূফ সংশোধন দ্বারা আমার অনেক সাহায্য করিয়াছেন। তাহাদের সকলের নিকটে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ভ্রম-প্রমাদ অনেক রহিয়াছে। সারা জীবনের পরিশ্রম মাটি হইবে, এই ভয়ে "বামনের চান্দে হাত" মনে না করিয়া, আমি শাঙ্কর দর্শন দেশে সুপরিচিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি, কারণ শাঙ্কর দর্শন ভারতমাতার মস্তকের মণিস্বরূপ। ভবিষ্যতে যখন উপযুক্ত লোক এই কার্য্য সাধনে ব্রতী হইবেন, আমার এই পরিশ্রমদ্বারা যদি তাহার কোন সাহায্য হয়, তবেই আমার এই বৃদ্ধ বয়সের যত্ন সফল মনে করিব। যদি ও সমস্ত গ্রন্থেরই রচনা কার্য্য শেষ হইয়াছে, তথাপি মফস্বল সহরে মুদ্রাঙ্কন কার্য্যে এত বিলম্ব হয়, যে অধুনা প্রথম খণ্ডই মাত্র প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইল।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।
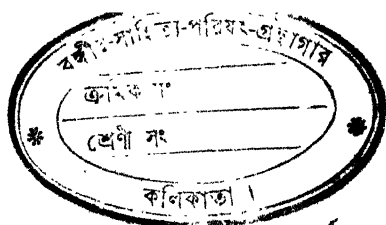
শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য।
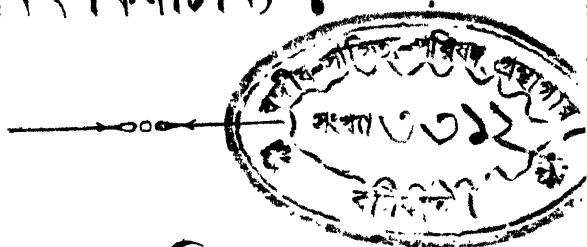
অনুক্রমণিকা।

১। শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়কালে দেশে ধর্ম্মের অবস্থা।

শঙ্করাচার্য্য আনুমানিক খৃষ্টীয় অষ্টম কি নবম শতাব্দিতে দাক্ষিণাত্যে কেরল প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। মান্দ্রাজ প্রদেশের পশ্চিম সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থানেরই প্রাচীন নাম কেরল। শঙ্করাচার্য্য যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন সেই সময়ে ভারতের ধর্ম্ম-জীবন অত্যন্ত মলিনদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। শঙ্করের জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতেই ধ্যান ও সমাধি প্রধান উদার বৌদ্ধ ধর্ম্মের জীবন্ত প্রভাবে ক্রিয়া-কলাপ-বহুল বৈদিক ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। কালচক্রে সেই বৌদ্ধধর্ম্মও আবার শুষ্ক তর্কমূলক নিরীশ্বর-বাদ এবং শূন্যবাদে পরিণত হইয়া হতপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। তখন দেশের জনসমাজ অসংখ্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া, পরস্পর জিগীষা এবং হিংসা-দ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ধর্ম্মসাধন অনেক স্থলে, বাহ্য চিহ্ন ধারণে, অথবা মদ্য মাংসাদি আহারে পরিণত

হইয়াছিল। আনন্দগিরি বলিতেছেন, যে শঙ্করের জন্মের প্রাক্‌কালে ব্রাহ্মণেরা বৈদিক আচার ভ্রষ্ট হইয়া, নানাপ্রকার কাল্পনিক ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন, এবং শরীরকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিয়া অঙ্গে নানাপ্রকার চিহ্ন অঙ্কিত করিতেন। তিনি সে কালের প্রচলিত অসংখ্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিতেছেন যথা—শৈব, বৈষ্ণব, অগ্ন্যুপাসক, সৌর বা সূর্য্যোপাসক, গাণপত্য, শাক্ত, কাপালিক, ইন্দ্রের ও নাগেশের উপাসক, কুবেরের উপাসক, গন্ধর্ব্ব ও সাধ্যদিগের উপাসক, এবং ভূত-বেতালের উপাসক ইত্যাদি। তাঁহারা যে সকল চিহ্ন শরীরে অঙ্কিত করিতেন অথবা শরীরে ধারণ করিতেন, আনন্দগিরি তাহারও উল্লেখ করিতেছেন, যথা—ত্রিশূল, ডমরু, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, কমণ্ডলু, জটা, কণ্ঠমালা ইত্যাদি। এক একটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আবার অসংখ্য শাখা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এতদ্‌ভিন্ন বৌদ্ধগণও নানাপ্রকার শাখা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল, যথা—বৈভাষিক, মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ইত্যাদি। অনেক লোক আবার জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল।

শঙ্করের জন্মের প্রাক্‌কালে সমাজে ধর্ম্মের যে কিরূপ দুর্গতি হইয়াছিল, তাঁহার অবতারত্ব সম্বন্ধে মাধবাচার্য্য যে আখ্যায়িকার উল্লেখ করিতেছেন তাহাতেই তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। "একদা মহাদেব কৈলাস ভবনে বিশ্রাম করিতেছিলেন,—তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া মনের দুঃখে বলিতে লাগিলেন :—হে দেব, আপনার অবিদিত নাই, ভগবান বিষ্ণু জগতের হিতের জন্য বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অধুনাতন শিষ্যেরা তদীয় ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়া, আত্ম-প্রবঞ্চিত হইতেছেন, তাঁহাদের দূষিতমতে পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়াছে। সর্ব্বত্র অনাচার, বেদের নিন্দা, এবং অনাদর। কেহ কেহ বা বলিয়া থাকেন, যে বেদ ভণ্ড কাপুরুষ

ব্রাহ্মণদিগের জীবিকার উপায়* মাত্র। সন্ধ্যা-বন্দনাদি সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে; কেহ আর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করে না। লোক সকল পাষণ্ড হইয়াছে; যজ্ঞের নাম করিলেও লোকে কাণে হাত দেয়। দেবগণ আর বলি পাইতেছেন না। ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তে, কেবলমাত্র লিঙ্গ চক্রাদি চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করেন। জঘন্য কাপলিকেরা সদ্যঃকৃত্ত দ্বিজমুণ্ডে উগ্র-ভৈরবের পূজা করিয়া থাকেন। ঈদৃশ আরও আরও কুপথ আশ্রয় করিয়া জনগণ ক্লিষ্ট হইতেছে। হে ভগবন্, আপনি স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করিয়া এই সকল দূষিত মত খণ্ডন না করিলে লোকের আর উপায়ান্তর নাই।" মহাদেব তথাস্তু বলিয়া দেবগণের মনোরথ পূর্ণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন "অধর্ম্মের নাশ এবং সদ্ধর্ম্মের রক্ষার জন্য আমি স্বয়ং ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিব। বিষ্ণুর ভুজ চতুষ্টয়ের ন্যায় আমার চারিজন প্রধান শিষ্য হইবে। ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত মর্ম্ম আমি প্রকাশ করিব, জ্ঞান বিস্তার করিয়া লোকের মোহের নিদানভূত অবিদ্যাজনিত দ্বৈতভাব আমি দূর করিব। কিন্তু হে দেবগণ, তোমরাও সকলে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমার সাহায্য করিবে, তবেই তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে।" এইরূপে দেবগণকে আশ্বস্ত করিয়া, মহাদেব স্বীয় পুত্র স্কন্দের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন "হে সৌম্য যে উপায়ে জগতের উদ্ধার সাধিত হইবে, তাহা তোমাকে বিশেষরূপে বলিতেছি। সৎকর্ম্ম, উপাসনা বা যোগ, এবং জ্ঞান, বেদের এই তিন কাণ্ড, জগতের রক্ষার জন্য এই কাণ্ডত্রয়েরই উদ্ধার প্রয়োজন।

---

* "বুদ্ধি-পৌরুষ-হীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ"।
"ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারঃ ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচরাঃ॥"
চার্ব্বাক দর্শন॥

উপাসনা বা যোগকাণ্ডের উদ্ধারার্থ বিষ্ণু, শঙ্কর্ষণ (বলদেব) নামে, এবং নাগপতি শেষ, পতঞ্জলি নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আমি স্বয়ং শঙ্কররূপে অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞানকাণ্ডের উদ্ধার সাধন করিব, দেবগণের নিকট এইমাত্র প্রতিশ্রুত হইলাম। অবশিষ্ট কর্ম্মকাণ্ডের উদ্ধারের জন্য অধুনা তোমাকে সুব্রহ্মণ্য (কুমারিল) নামে সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া বেদ বিরোধী বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাজয় পূর্ব্বক জৈমিনি প্রবর্ত্তিত কর্ম্মশাস্ত্রের, (তন্ত্রাদির) পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। ব্রহ্মাও তোমার সাহায্যার্থ মণ্ডণ নামে অবতীর্ণ হইবেন। ইন্দ্র ও সুধন্বা নামে রাজা হইয়া তোমার সহায়তা করিবেন।" স্কন্দ মহাদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন।

এ স্থলে অবতারবাদ সম্বন্ধে একটী কথা আমাদিগকে বলিতে হইতেছে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যাহা কিছু শক্তিসম্পন্ন, শ্রীসম্পন্ন, অথবা তেজস্বী, সে সকলই ভগবানের অংশ স্বরূপ। শাস্ত্রকারগণ এই সত্যকেই ভিত্তি করিয়া, তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মাগণকে নানারূপ দেবতার অবতার বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। সাধুদিগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের এই চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসরণ করিয়াই মাধবাচার্য্য শঙ্করকে শিবের অবতার বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। তবে স্থল-বিশেষে তিনি শঙ্করকে বিষ্ণুর অবতার, অথবা হিরণ্যগর্ভের অবতার বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। কোথাও বা তিনি শঙ্করকে ব্রহ্মা এবং শিব উভয় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নামের সাদৃশ্য হেতুই বোধ হয়, শঙ্কর বিশেষভাবে শিবের অংশ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন।

২। সুধন্বা এবং সুব্রহ্মণ্য বা কুমারিল ভট্ট।

শঙ্করের সমকালিক সুধন্বা নামে একজন বিদ্যোৎসাহী প্রজা-পালন-নিরত রাজা ছিলেন। তিনি প্রথমে সুব্রহ্মণ্য বা কুমারিল ভট্টের

বৌদ্ধ বিনাশ কার্য্যের এবং পরে শঙ্করের কাপালিক বিনাশ কার্য্যের বিশেষ সহায় হইয়াছিলেন। তিনি কোথাকার রাজা অথবা কোথায় তাঁহার রাজধানী, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। তবে যতদূর জানা যায় কুমারিল ভট্ট একজন বিহার দেশীয় পণ্ডিত। খৃঃ অষ্টম শতাব্দিতে তাঁহার অভ্যুদয়। তাঁহারই প্রভাবে জৈমিনিকৃত মীমাংসা দর্শনের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়, এবং তৎসঙ্গে লুপ্তপ্রায় বৈদিক ক্রিয়া কলাপ পুনর্জীবিত হয়। কথিত আছে যে, তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত গমন করেন, এবং তথায় রুদ্রপুর নামক স্থানে তত্রত্য রাজার সাহায্যে বৌদ্ধ ও জৈনদিগের বিনাশ সাধন করেন। দাক্ষিণাত্যে রুদ্রপুর কোথায় আছে আমরা বলিতে পারি না। হয়ত সুধন্বা সেই অপরিজ্ঞাত রুদ্রপুরেরই রাজা। সুধন্বার রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে মাধবাচার্য্য যাহা বলিতেছেন তাহার সার মর্ম্ম এই—সুধন্বা নামে একজন নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়া যথাবিধি রাজ-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুরী পৃথিবীতে অমরাবতী তুল্য শোভা ধারণ করিয়াছিল। বিদ্যার প্রতি তাঁহার যেরূপ সমাদর ছিল, তাহাতে রাজসভায় অসংখ্য বৌদ্ধ পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছিল। এই সময়েই সুব্রহ্মণ্য বা কুমারিল ভট্টেরও জন্ম। কুমারিল বা ভট্টপাদ সুশিক্ষা লাভ করিয়া জৈমিনি কৃত কর্ম্ম-মীমাংসা-সূত্রের শবর ভাষ্যের উৎকৃষ্ট বার্ত্তিক রচনা করিয়া বৈদিক ক্রিয়া কলাপের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ করিলেন। কুমারিল দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া পরিশেষে রাজা সুধন্বার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন, এবং রাজাও তাহাকে যথোচিত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। তিনি রাজসভায় আসীন হইলে পর, নিকটস্থ বৃক্ষে একটী কোকিলের ধ্বনি শুনিতে পাইয়া বলিলেন "হে রাজ-কোকিল, যদি হেয় বেদ-নিন্দুক কাকদিগের সঙ্গদোষে তোমাকে দূষিত না করিয়া থাকে, তবেই তুমি ধন্য।" এইরূপ অবজ্ঞাসূচক বাক্য শ্রবণমাত্র উপস্থিত বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ পাদাহত সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া

উঠিলেন। তখন বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের সহিত কুমারিলের বিচার আরম্ভ হইল। কুমারিল তদীয় সুতীক্ষ্ণযুক্তি কুঠারের আঘাতে বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন। কোলাহলে গগন মেদিনী পূর্ণ হইল। বৌদ্ধেরা বিচারে পরাজিত হইল, এবং কুমারিল বেদের তাৎপর্য্য সকল ব্যাখ্যা করিয়া রাজাকে শুনাইলেন। কিন্তু রাজা সুধন্বা স্বীয় অভিমত এইরূপ প্রকাশ করিলেন, যে তর্কে জয় পরাজয় দ্বারা সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য প্রমাণ হয় না; তাহাতে কেবল পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াও আহত হইবেন না, তাহারই সিদ্ধান্ত আমরা সত্য বলিয়া জানিব। এই-রূপ অদ্ভুত কথা শুনিয়া বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভট্টপাদ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে নিকটস্থ গিরিশৃঙ্গে আরোহন করিলেন, এবং বলিলেন যদি বেদ সত্য হয়, তবে এই গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূতলে পতিত হইলেও আমার শরীরে কোন আঘাত লাগিবে না। বলিতে বলিতে তিনি শৃঙ্গ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার পতনে তুলাপিণ্ড পতনের ন্যায় শব্দ-মাত্র হইল, কিন্তু তাঁহার গায়ে কোন আঘাত লাগিল না। এই অলৌকিক ব্যাপারের কথা শ্রবণ করিয়া দিগ্‌দিগন্ত হইতে জনগণ কুমারিলকে দেখিতে আসিল। এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে রাজারও বৈদিক ধর্ম্মে শ্রদ্ধা জন্মিল, এবং এতকাল যে তিনি বেদ-নিন্দুকদিগের সঙ্গ-দোষে দূষিত হইয়াছিলেন, সেজন্য আত্মগ্লানির সঞ্চার হইল। অপর-দিকে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন,যে ইহার দ্বারা কোন সিদ্ধান্তের সত্যতার পরিচয় পাওয়া যায় না। যেহেতু মন্ত্র এবং ঔষধাদির বলেও এইরূপ শরীর রক্ষা সম্ভব। (বোধ হয় তাঁহাদের প্যারাসুটের কথা জানা ছিল না)। প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রতি বৌদ্ধদিগের এইরূপ অনাদর দেখিয়া, রাজা ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন, "আমি একটী প্রশ্ন করিব, তাহার উত্তর দানে

যাহারা অক্ষম হইবে, শিলাঘাতে তাহাদের মস্তক চূর্ণ করিব।" এই বলিয়া রাজা কলসী মধ্যে একটী সর্প রাখিয়া, তাহার মুখ ঢাকিয়া রাজসভায় উপস্থিত করিলেন, এবং ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ উভয় দলকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, বলুন দেখি ইহার মধ্যে কি আছে? এই কথা শুনিয়া পণ্ডিতগণ, বহু অনুনয় বিনয় দ্বারা রাজাকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন, যে কল্য প্রাতে এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা স্বস্বগৃহে চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণেরা আকণ্ঠ জলে অবতরণ করিয়া, সূর্য্যদেবের স্তব করিতে লাগিলেন, এবং সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের যাহা বক্তব্য তাহা বলিয়া দিলেন। বৌদ্ধরাও কলসীতে কি আছে স্থির করিলেন। পরদিন প্রাতে সকলে রাজ-সভায় আসীন হইলে পর, বৌদ্ধরা বলিলেন যে কলসীর ভিতরে একটী সর্প আছে। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন যে কলসী মধ্যে বিষ্ণু স্বয়ং শেষ-ফণায় শয়ান আছেন। ব্রাহ্মণদিগের উত্তর শুনিয়া রাজার মুখ মলিন হইল। কিন্তু তখনই তিনি আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন, "হে মহারাজ! ব্রাহ্মণদিগের কথাই সত্য, তাহাতে সংশয় করিও না।" আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া রাজাও কলসী মধ্যে বিষ্ণুর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, এবং তাহাতে তাঁহার সমস্ত সংশয় দূর হইল। রাজা সুধন্বা সেই অবধি বৌদ্ধ ও জৈনদিগের পরম শত্রু হইলেন। তিনি সেতু হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত আবাল-বৃদ্ধ বেদ-নিন্দুকদিগের বধের আদেশ প্রদান করিলেন। রাজা সুধন্বা কুমারিল ভট্টের প্ররোচনায়, বৌদ্ধ ও জৈনদিগের সমূল উচ্ছেদ সাধন করিলেন। তাহাদের বিনাশের পর, কুমারিল বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা বেদের কর্ম্মকাণ্ডের উদ্ধার ক্রিয়া সাধন করিলেন।

৩। মাধবাচার্য্য কৃত শঙ্কর দিগ্‌বিজয় ও আনন্দগিরি নামীয় শঙ্কর বিজয়।

আমরা যে দুটী গ্রন্থকে প্রধান ভিত্তি করিয়া শঙ্করাচার্য্যের জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তৎসম্বন্ধে এস্থলে দুই একটী কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। প্রথম গ্রন্থ, মাধবাচার্য্য কৃত শঙ্কর দিগ্‌বিজয়। ইহাই আমাদের প্রধান অবলম্বন। দ্বিতীয় গ্রন্থ আনন্দগিরি নামীয় শঙ্কর-বিজয়। ইহাকে নানা কারণে আমরা শঙ্করের সমসাময়িক শিষ্য বিখ্যাত আনন্দগিরি রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে একটীতে অপরটীর কথার কোনও উল্লেখ নাই। মাধবাচার্য্যই বিখ্যাত বৈদিক ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য। কেহ বলেন যে তিনি সায়নাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ সহোদর। তাহার সময়ে যদি এই আনন্দগিরি নামীয় শঙ্কর-বিজয় গ্রন্থ বর্ত্তমান থাকিত, তবে নিশ্চয়ই তিনি তাহার উল্লেখ করিতেন। খৃষ্টের আনুমানিক চতুর্দ্দশ শতাব্দি পরে এবং শঙ্করের আনুমানিক ৫।৭ শতাব্দি পরে মাধবাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি শঙ্করাচার্য্যের একজন বিখ্যাত প্রশিষ্য মধ্যে পরিগণিত। তাহার গুরুর নাম বিদ্যাতীর্থ। বিখ্যাত সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ নামক গ্রন্থ মাধবাচার্য্যেরই রচনা। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের এই-রূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। সত্য সত্যই স্বয়ং আনন্দগিরি কৃত শঙ্কর-বিজয় গ্রন্থ তাঁহার সময়ে বর্ত্তমান থাকিলে, তিনি নিশ্চয় তাহার ব্যবহার করিতেন, অন্ততঃ তাহার উল্লেখ করিতেন। মাধবাচার্য্য "শঙ্কর-জয়" নামক অপর একটী লুপ্ত গ্রন্থের উল্লেখ করিতেছেন, তিনি বলিতেছেন যে তাঁহার শঙ্কর দিগ্‌বিজয় গ্রন্থ প্রাচীন শঙ্কর-জয়েরই সার-সংগ্রহ। "প্রাচীনে শঙ্কর-জয়ে সারঃ সংগৃহ্যতে ময়া।" উল্লিখিত শঙ্কর-জয় নামক প্রাচীন গ্রন্থ শঙ্করের সমসাময়িক শিষ্য আনন্দগিরি কর্ত্তৃক লিখিত হওয়া সম্ভব। সেই লুপ্ত গ্রন্থ নিশ্চয়ই একটী বিস্তীর্ণ গ্রন্থ ছিল, কারণ মাধবাচার্য্য স্বকৃত শঙ্কর-দিগ্‌বিজয়কে

তাহার তুলনায় লঘু-সংগ্রহ আখ্যায় অভিহিত করিতেছেন। আনন্দ-গিরি-নামীয় বর্ত্তমান শঙ্কর-বিজয় গ্রন্থ, মাধবাচার্য্যের গ্রন্থের তুলনায় নিশ্চয় আধুনিক বলিতে হইবে। পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে মাধবাচার্য্যের সহিত এই গ্রন্থকারের কোন তুলনাই হইতে পারে না। প্রাচীন শঙ্করজয় গ্রন্থ, এমন কি মাধবাচার্য্য কৃত গ্রন্থ ও বোধ হয়, এই গ্রন্থকারের হস্তগত হয় নাই। মাধবাচার্য্যের ও শতাধিক বৎসর পরে কেবল মাত্র জনশ্রুতি অবলম্বনে, এবং কল্পনার সাহায্যে, এই শঙ্কর বিজয়-গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। লোকের সমাদর লাভ করিবার উদ্দেশ্যে, গ্রন্থকার শঙ্করের সমসাময়িক শিষ্য আনন্দগিরি রচিত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে, যে শঙ্করের জীবনের অতি মৌলিক ঘটনা সম্বন্ধেও গ্রন্থকারদ্বয়ের মত-বিরোধ। মাধবাচার্য্য বলিতেছেন শঙ্করের পিতার নাম শিবগুরু, মাতার নাম সতী, পিতামহের নাম বিদ্যাধিরাজ, জন্মস্থানের নাম কালটি গ্রাম। আনন্দগিরি নামীয় গ্রন্থকার বলিতেছেন, যে শঙ্কর বিশ্বজিৎ নামা ব্রাহ্মণের পতি-বিরহিতা পত্নীর দেব-প্রভাবে উৎপন্ন সন্তান। পিতামহের নাম সর্ব্বজ্ঞ, পিতামহীর নাম কামাক্ষী। মাধবাচার্য্যের কথার ভিত্তি তাঁহার উল্লিখিত শঙ্কর-জয় গ্রন্থ। আনন্দগিরি নামীয় গ্রন্থের ভিত্তি, শঙ্করের মৃত্যুর বহু শতাব্দী পরের প্রচলিত কিম্বদন্তি মাত্র। উল্লিখিত কারণ সকল পর্য্যালোচনা করিয়া মাধবাচার্য্যের কৃত শঙ্কর-দিগ্‌বিজয় গ্রন্থকেই অধিকতর নির্ভর ও বিশ্বাস যোগ্য জ্ঞানে, আমাদের গ্রন্থের প্রধান ভিত্তি করিতেছি।

পরিশেষে আমাদের ইহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে চিৎ-বিলাস নামক অপর একজন শঙ্কর-শিষ্যের নামে প্রচলিত আর একখানি ক্ষুদ্র শঙ্কর-বিজয় গ্রন্থও পাওয়া যায়, কিন্তু কেহই তাহা প্রমাণ-যোগ্য মনে করেন না।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য।

প্রথমাধ্যায়।

শঙ্করের জন্ম ও বাল-চরিত।

১। আনন্দ গিরিমতে শঙ্করের জন্ম।

শঙ্করাচার্য্যের জন্মস্থান দাক্ষিণাত্যের কেরল প্রদেশ। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে মাদ্রাজ প্রদেশের ত্রিবাঙ্কুর ও মালাবার বিভাগের প্রাচীন নাম কেরল প্রদেশ। যে গ্রামে শঙ্করের জন্ম হয়, তাহার নাম, মাধবাচার্য্য বলিতেছেন কালটি, আনন্দগিরি বলিতেছেন চিদম্বরপুর। শঙ্করের পিতা-মাতার নাম, এবং জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধেও এই উভয় গ্রন্থকারের মধ্যে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে শঙ্করের মৃত্যুর বহু শতাব্দি পরে, তাহার জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয়, এবং শঙ্করবিজয়-গ্রন্থকার আনন্দগিরি, শঙ্করের সমসাময়িক তদীয় প্রধান শিষ্য আনন্দগিরি নহেন। শঙ্করবিজয়কার আনন্দগিরি বলিতেছেন যে চিদম্বরপুরে সর্ব্বজ্ঞ নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং কামাক্ষী নামে তাহার স্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের এক কন্যা জন্মিয়াছিল, তাহার নাম বিশিষ্টা। অষ্টমবর্ষ বয়সে বিশ্বজিৎ নামে একজন ব্রাহ্মণের সহিত বিশিষ্টা-দেবীর শুভ বিবাহ হয়। বিশিষ্টা-দেবী সর্ব্বদা শিবের আরাধনায়ই রত থাকিতেন। কিছু দিনান্তে তদীয় স্বামী বিশ্বজিতের মনে বিরাগের সঞ্চার হয়, এবং তিনি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। বিশিষ্টা দেবীও তদবধি চিদম্বরস্থিত আকাশলিঙ্গ নামক শিব-বিগ্রহের সেবায় দিনাতিপাত করেন।

হইয়াছিল। আনন্দগিরি বলিতেছেন, যে শঙ্করের জন্মের প্রাক্‌কালে ব্রাহ্মণেরা বৈদিক আচার ভ্রষ্ট হইয়া, নানাপ্রকার কাল্পনিক ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন, এবং শরীরকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিয়া অঙ্গে নানাপ্রকার চিহ্ন অঙ্কিত করিতেন। তিনি সে কালের প্রচলিত অসংখ্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিতেছেন যথা—শৈব, বৈষ্ণব, অগ্ন্যুপাসক, সৌর বা সূর্য্যোপাসক, গাণপত্য, শাক্ত, কাপালিক, ইন্দ্রের ও নাগেশের উপাসক, কুবেরের উপাসক, গন্ধর্ব্ব ও সাধ্যদিগের উপাসক, এবং ভূত-বেতালের উপাসক ইত্যাদি। তাঁহারা যে সকল চিহ্ন শরীরে অঙ্কিত করিতেন অথবা শরীরে ধারণ করিতেন, আনন্দগিরি তাহারও উল্লেখ করিতেছেন, যথা—ত্রিশূল, ডমরু, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, কমণ্ডলু, জটা, কণ্ঠমালা ইত্যাদি। এক একটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আবার অসংখ্য শাখা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধগণও নানাপ্রকার শাখা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল, যথা—বৈভাষিক, মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ইত্যাদি। অনেক লোক আবার জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল।

শঙ্করের জন্মের প্রাক্‌কালে সমাজে ধর্ম্মের যে কিরূপ দুর্গতি হইয়াছিল, তাঁহার অবতারত্ব সম্বন্ধে মাধবাচার্য্য যে আখ্যায়িকার উল্লেখ করিতেছেন তাহাতেই তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। "একদা মহাদেব কৈলাস ভবনে বিশ্রাম করিতেছিলেন,—তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া মনের দুঃখে বলিতে লাগিলেনঃ—হে দেব, আপনার অবিদিত নাই, ভগবান বিষ্ণু জগতের হিতের জন্য বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অধুনাতন শিষ্যেরা তদীয় ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়া, আত্ম-প্রবঞ্চিত হইতেছেন, তাঁহাদের দূষিতমতে পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়াছে। সর্ব্বত্র অনাচার, বেদের নিন্দা, এবং অনাদর। কেহ কেহ বা বলিয়া থাকেন, যে বেদ ভণ্ড কাপুরুষ

ব্রাহ্মণদিগের জীবিকার উপায়* মাত্র। সন্ধ্যা-বন্দনাদি সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে; কেহ আর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করে না। লোক সকল পাষণ্ড হইয়াছে; যজ্ঞের নাম করিলেও লোকে কাণে হাত দেয়। দেবগণ আর বলি পাইতেছেন না। ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তে, কেবলমাত্র লিঙ্গ-চক্রাদি চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করেন। জঘন্য কাপলিকেরা সদ্যঃকৃত্ত দ্বিজমুণ্ডে উগ্র-ভৈরবের পূজা করিয়া থাকেন। ঈদৃশ আরও আরও কুপথ আশ্রয় করিয়া জনগণ ক্লিষ্ট হইতেছে। হে ভগবন্, আপনি স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করিয়া এই সকল দূষিত মত খণ্ডন না করিলে লোকের আর উপায়ান্তর নাই।” মহাদেব তথাস্তু বলিয়া দেবগণের মনোরথ পূর্ণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন “অধর্ম্মের নাশ এবং সদ্ধর্ম্মের রক্ষার জন্য আমি স্বয়ং ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিব। বিষ্ণুর ভুজ চতুষ্টয়ের ন্যায় আমার চারিজন প্রধান শিষ্য হইবে। ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত মর্ম্ম আমি প্রকাশ করিব, জ্ঞান বিস্তার করিয়া লোকের মোহের নিদানভূত অবিদ্যাজনিত দ্বৈতভাব আমি দূর করিব। কিন্তু হে দেবগণ, তোমরাও সকলে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমার সাহায্য করিবে, তবেই তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে।” এইরূপে দেবগণকে আশ্বস্ত করিয়া, মহাদেব স্বীয় পুত্র স্কন্দের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন “হে সৌম্য যে উপায়ে জগতের উদ্ধার সাধিত হইবে, তাহা তোমাকে বিশেষরূপে বলিতেছি। সৎকর্ম্ম, উপাসনা বা যোগ, এবং জ্ঞান, বেদের এই তিন কাণ্ড, জগতের রক্ষার জন্য এই কাণ্ডত্রয়েরই উদ্ধার প্রয়োজন।

* “বুদ্ধি-পৌরুষ-হীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ” ॥
“ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারঃ ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচরাঃ ॥”
চার্ব্বাক দর্শন ॥

উপাসনা বা যোগকাণ্ডের উদ্ধারার্থ বিষ্ণু, শঙ্কর্ষণ (বলদেব) নামে, এবং নাগপতি শেষ, পতঞ্জলি নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আমি স্বয়ং শঙ্কররূপে অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞানকাণ্ডের উদ্ধার সাধন করিব, দেবগণের নিকট এইমাত্র প্রতিশ্রুত হইলাম। অবশিষ্ট কর্ম্মকাণ্ডের উদ্ধারের জন্য অধুনা তোমাকে সুব্রহ্মণ্য (কুমারিল) নামে সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া বেদ বিরোধী বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাজয় পূর্ব্বক জৈমিনি প্রবর্ত্তিত কর্ম্মশাস্ত্রের, (তন্ত্রাদির) পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। ব্রহ্মাও তোমার সাহায্যার্থ মণ্ডণ নামে অবতীর্ণ হইবেন। ইন্দ্র ও সুধন্বা নামে রাজা হইয়া তোমার সহায়তা করিবেন।" স্কন্দ মহাদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন।

এ স্থলে অবতারবাদ সম্বন্ধে একটী কথা আমাদিগকে বলিতে হইতেছে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যাহা কিছু শক্তিসম্পন্ন, শ্রীসম্পন্ন, অথবা তেজস্বী, সে সকলই ভগবানের অংশ স্বরূপ। শাস্ত্রকারগণ এই সত্যকেই ভিত্তি করিয়া, তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মাগণকে নানারূপ দেবতার অবতার বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। সাধুদিগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের এই চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসরণ করিয়াই মাধবাচার্য্য শঙ্করকে শিবের অবতার বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। তবে স্থল-বিশেষে তিনি শঙ্করকে বিষ্ণুর অবতার, অথবা হিরণ্যগর্ভের অবতার বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। কোথাও বা তিনি শঙ্করকে ব্রহ্মা এবং শিব উভয় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নামের সাদৃশ্য হেতুই বোধ হয়, শঙ্কর বিশেষভাবে শিবের অংশ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন।

২। সুধন্বা এবং সুব্রহ্মণ্য বা কুমারিল ভট্ট।

শঙ্করের সমকালিক সুধন্বা নামে একজন বিদ্যোৎসাহী প্রজা-পালন-নিরত রাজা ছিলেন। তিনি প্রথমে সুব্রহ্মণ্য বা কুমারিল ভট্টের

বৌদ্ধ বিনাশ কার্য্যের এবং পরে শঙ্করের কাপালিক বিনাশ কার্য্যের বিশেষ সহায় হইয়াছিলেন। তিনি কোথাকার রাজা অথবা কোথায় তাঁহার রাজধানী, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। তবে যতদূর জানা যায় কুমারিল ভট্ট একজন বিহার দেশীয় পণ্ডিত। খৃঃ অষ্টম শতাব্দিতে তাঁহার অভ্যুদয়। তাঁহারই প্রভাবে জৈমিনিকৃত মীমাংসা দর্শনের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়, এবং তৎসঙ্গে লুপ্তপ্রায় বৈদিক ক্রিয়া কলাপ পুনর্জীবিত হয়। কথিত আছে যে, তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত গমন করেন, এবং তথায় রুদ্রপুর নামক স্থানে তত্রত্য রাজার সাহায্যে বৌদ্ধ ও জৈনদিগের বিনাশ সাধন করেন। দাক্ষিণাত্যে রুদ্রপুর কোথায় আছে আমরা বলিতে পারি না। হয়ত সুধন্বা সেই অপরিজ্ঞাত রুদ্রপুরেরই রাজা। সুধন্বার রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে মাধবাচার্য্য যাহা বলিতেছেন তাহার সার মর্ম্ম এই—সুধন্বা নামে একজন নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়া যথাবিধি রাজ-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুরী পৃথিবীতে অমরাবতী তুল্য শোভা ধারণ করিয়াছিল। বিদ্যার প্রতি তাঁহার যেরূপ সমাদর ছিল, তাহাতে রাজসভায় অসংখ্য বৌদ্ধ পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছিল। এই সময়েই সুব্রহ্মণ্য বা কুমারিল ভট্টেরও জন্ম। কুমারিল বা ভট্টপাদ সুশিক্ষা লাভ করিয়া জৈমিনি-কৃত কর্ম্ম-মীমাংসা-সূত্রের শবর ভাষ্যের উৎকৃষ্ট বার্ত্তিক রচনা করিয়া বৈদিক ক্রিয়া কলাপের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ করিলেন। কুমারিল দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া পরিশেষে রাজা সুধন্বার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন, এবং রাজাও তাহাকে যথোচিত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। তিনি রাজসভায় আসীন হইলে পর, নিকটস্থ বৃক্ষে একটী কোকিলের ধ্বনি শুনিতে পাইয়া বলিলেন "হে রাজ-কোকিল, যদি হেয় বেদ-নিন্দুক কাকদিগের সঙ্গদোষে তোমাকে দূষিত না করিয়া থাকে, তবেই তুমি ধন্য।" এইরূপ অবজ্ঞাসূচক বাক্য শ্রবণমাত্র উপস্থিত বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ পাদাহত সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া

উঠিলেন। তখন বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের সহিত কুমারিলের বিচার আরম্ভ হইল। কুমারিল তদীয় সুতীক্ষযুক্তি কুঠারের আঘাতে বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন। কোলাহলে গগন মেদিনী পূর্ণ হইল। বৌদ্ধেরা বিচারে পরাজিত হইল, এবং কুমারিল বেদের তাৎপর্য্য সকল ব্যাখ্যা করিয়া রাজাকে শুনাইলেন। কিন্তু রাজা সুধন্বা স্বীয় অভিমত এইরূপ প্রকাশ করিলেন, যে তর্কে জয় পরাজয় দ্বারা সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য প্রমাণ হয় না; তাহাতে কেবল পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াও আহত হইবেন না, তাহারই সিদ্ধান্ত আমরা সত্য বলিয়া জানিব। এই-রূপ অদ্ভুত কথা শুনিয়া বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভট্টপাদ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে নিকটস্থ গিরিশৃঙ্গে আরোহন করিলেন, এবং বলিলেন যদি বেদ সত্য হয়, তবে এই গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূতলে পতিত হইলেও আমার শরীরে কোন আঘাত লাগিবে না। বলিতে বলিতে তিনি শৃঙ্গ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার পতনে তুলাপিণ্ড পতনের ন্যায় শব্দ-মাত্র হইল, কিন্তু তাঁহার গায়ে কোন আঘাত লাগিল না। এই অলৌকিক ব্যাপারের কথা শ্রবণ করিয়া দিগ্‌দিগন্ত হইতে জনগণ কুমারিলকে দেখিতে আসিল। এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে রাজারও বৈদিক ধর্ম্মে শ্রদ্ধা জন্মিল, এবং এতকাল যে তিনি বেদ-নিন্দুকদিগের সঙ্গ-দোষে দূষিত হইয়াছিলেন, সেজন্য আত্মগ্লানির সঞ্চার হইল। অপর-দিকে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, যে ইহার দ্বারা কোন সিদ্ধান্তের সত্যতার পরিচয় পাওয়া যায় না। যেহেতু মন্ত্র এবং ঔষধাদির বলেও এইরূপ শরীর রক্ষা সম্ভব। (বোধ হয় তাঁহাদের প্যারাসুটের কথা জানা ছিল না)। প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রতি বৌদ্ধদিগের এইরূপ অনাদর দেখিয়া, রাজা ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন, "আমি একটী প্রশ্ন করিব, তাহার উত্তর দানে

যাহারা অক্ষম হইবে, শিলাঘাতে তাহাদের মস্তক চূর্ণ করিব।” এই বলিয়া রাজা কলসী মধ্যে একটী সর্প রাখিয়া, তাহার মুখ ঢাকিয়া রাজসভায় উপস্থিত করিলেন, এবং ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ উভয় দলকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, বলুন দেখি ইহার মধ্যে কি আছে? এই কথা শুনিয়া পণ্ডিতগণ, বহু অনুনয় বিনয় দ্বারা রাজাকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন, যে কল্য প্রাতে এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা স্বস্বগৃহে চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণেরা আকণ্ঠ জলে অবতরণ করিয়া, সূর্য্যদেবের স্তব করিতে লাগিলেন, এবং সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের যাহা বক্তব্য তাহা বলিয়া দিলেন। বৌদ্ধরাও কলসীতে কি আছে স্থির করিলেন। পরদিন প্রাতে সকলে রাজ-সভায় আসীন হইলে পর, বৌদ্ধরা বলিলেন যে কলসীর ভিতরে একটী সর্প আছে। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন যে কলসী মধ্যে বিষ্ণু স্বয়ং শেষ-ফণায় শয়ান আছেন। ব্রাহ্মণদিগের উত্তর শুনিয়া রাজার মুখ মলিন হইল। কিন্তু তখনই তিনি আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন, “হে মহারাজ! ব্রাহ্মণদিগের কথাই সত্য, তাহাতে সংশয় করিও না।” আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া রাজাও কলসী মধ্যে বিষ্ণুর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, এবং তাহাতে তাঁহার সমস্ত সংশয় দূর হইল। রাজা সুধন্বা সেই অবধি বৌদ্ধ ও জৈন-দিগের পরম শত্রু হইলেন। তিনি সেতু হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত আবাল-বৃদ্ধ বেদ-নিন্দুকদিগের বধের আদেশ প্রদান করিলেন। রাজা সুধন্বা কুমারিল ভট্টের প্ররোচনায়, বৌদ্ধ ও জৈনদিগের সমূল উচ্ছেদ সাধন করিলেন। তাহাদের বিনাশের পর, কুমারিল বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা বেদের কর্ম্মকাণ্ডের উদ্ধার ক্রিয়া সাধন করিলেন।

৩। মাধবাচার্য্য কৃত শঙ্কর দিগ্‌বিজয় ও
আনন্দগিরি নামীয় শঙ্কর বিজয়।

আমরা যে দুটী গ্রন্থকে প্রধান ভিত্তি করিয়া শঙ্করাচার্য্যের জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তৎসম্বন্ধে এস্থলে দুই একটী কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। প্রথম গ্রন্থ, মাধবাচার্য্য কৃত শঙ্কর দিগ্‌বিজয়। ইহাই আমাদের প্রধান অবলম্বন। দ্বিতীয় গ্রন্থ আনন্দগিরি নামীয় শঙ্কর-বিজয়। ইহাকে নানা কারণে আমরা শঙ্করের সমসাময়িক শিষ্য বিখ্যাত আনন্দগিরি রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে একটীতে অপরটীর কথার কোনও উল্লেখ নাই। মাধবাচার্য্যই বিখ্যাত বৈদিক ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য। কেহ বলেন যে তিনি সায়নাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ সহোদর। তাহার সময়ে যদি এই আনন্দগিরি নামীয় শঙ্কর-বিজয় গ্রন্থ বর্ত্তমান থাকিত, তবে নিশ্চয়ই তিনি তাহার উল্লেখ করিতেন। খৃষ্টের আনুমানিক চতুর্দ্দশ শতাব্দি পরে এবং শঙ্করের আনুমানিক ৫।৭ শতাব্দি পরে মাধবাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি শঙ্করাচার্য্যের একজন বিখ্যাত প্রশিষ্য মধ্যে পরিগণিত। তাহার গুরুর নাম বিদ্যাতীর্থ। বিখ্যাত সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ নামক গ্রন্থ মাধবাচার্য্যেরই রচনা। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের এই-রূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। সত্য সত্যই স্বয়ং আনন্দগিরি কৃত শঙ্কর-বিজয় গ্রন্থ তাঁহার সময়ে বর্ত্তমান থাকিলে, তিনি নিশ্চয় তাহার ব্যবহার করিতেন, অন্ততঃ তাহার উল্লেখ করিতেন। মাধবাচার্য্য "শঙ্কর-জয়" নামক অপর একটী লুপ্ত গ্রন্থের উল্লেখ করিতেছেন, তিনি বলিতেছেন যে তাঁহার শঙ্কর দিগ্‌বিজয় গ্রন্থ প্রাচীন শঙ্কর-জয়েরই সার-সংগ্রহ। "প্রাচীনে শঙ্কর-জয়ে সারঃ সংগৃহ্যতে ময়া।" উল্লিখিত শঙ্কর-জয় নামক প্রাচীন গ্রন্থ শঙ্করের সমসাময়িক শিষ্য আনন্দগিরি কর্ত্তৃক লিখিত হওয়া সম্ভব। সেই লুপ্ত গ্রন্থ নিশ্চয়ই একটী বিস্তীর্ণ গ্রন্থ ছিল, কারণ মাধবাচার্য্য স্বকৃত শঙ্কর-দিগ্‌বিজয়কে

তাহার তুলনায় লঘু-সংগ্রহ আখ্যায় অভিহিত করিতেছেন। আনন্দ-গিরি-নামীয় বর্ত্তমান শঙ্কর-বিজয় গ্রন্থ, মাধবাচার্য্যের গ্রন্থের তুলনায় নিশ্চয় আধুনিক বলিতে হইবে। পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে মাধবাচার্য্যের সহিত এই গ্রন্থকারের কোন তুলনাই হইতে পারে না। প্রাচীন শঙ্করজয় গ্রন্থ, এমন কি মাধবাচার্য্য কৃত গ্রন্থ ও বোধ হয়, এই গ্রন্থকারের হস্তগত হয় নাই। মাধবাচার্য্যের ও শতাধিক বৎসর পরে কেবল মাত্র জনশ্রুতি অবলম্বনে, এবং কল্পনার সাহায্যে, এই শঙ্কর বিজয়-গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। লোকের সমাদর লাভ করিবার উদ্দেশ্যে, গ্রন্থকার শঙ্করের সমসাময়িক শিষ্য আনন্দগিরি রচিত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে, যে শঙ্করের জীবনের অতি মৌলিক ঘটনা সম্বন্ধেও গ্রন্থকারদ্বয়ের মত-বিরোধ। মাধবাচার্য্য বলিতেছেন শঙ্করের পিতার নাম শিবগুরু, মাতার নাম সতী, পিতামহের নাম বিদ্যাধিরাজ, জন্মস্থানের নাম কালটি গ্রাম। আনন্দগিরি নামীয় গ্রন্থকার বলিতেছেন, যে শঙ্কর বিশ্বজিৎ নামা ব্রাহ্মণের পতি-বিরহিতা পত্নীর দেব-প্রভাবে উৎপন্ন সন্তান। পিতামহের নাম সর্ব্বজ্ঞ, পিতামহীর নাম কামাক্ষী। মাধবাচার্য্যের কথার ভিত্তি তাঁহার উল্লিখিত শঙ্কর-জয় গ্রন্থ। আনন্দগিরি নামীয় গ্রন্থের ভিত্তি, শঙ্করের মৃত্যুর বহু শতাব্দী পরের প্রচলিত কিম্বদন্তি মাত্র। উল্লিখিত কারণ সকল পর্য্যালোচনা করিয়া মাধবাচার্য্যের কৃত শঙ্কর-দিগ্‌বিজয় গ্রন্থকেই অধিকতর নির্ভর ও বিশ্বাস যোগ্য জ্ঞানে, আমাদের গ্রন্থের প্রধান ভিত্তি করিতেছি।

পরিশেষে আমাদের ইহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে চিৎ-বিলাস নামক অপর একজন শঙ্কর-শিষ্যের নামে প্রচলিত আর একখানি ক্ষুদ্র শঙ্কর-বিজয় গ্রন্থও পাওয়া যায়, কিন্তু কেহই তাহা প্রমাণ-যোগ্য মনে করেন না।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য।

প্রথমাধ্যায়।

শঙ্করের জন্ম ও বাল-চরিত।

১। আনন্দ গিরিমতে শঙ্করের জন্ম।

শঙ্করাচার্য্যের জন্মস্থান দাক্ষিণাত্যের কেরল প্রদেশ। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে মান্দ্রাজ প্রদেশের ত্রিবাঙ্কুর ও মালাবার বিভাগের প্রাচীন নাম কেরল প্রদেশ। যে গ্রামে শঙ্করের জন্ম হয়, তাহার নাম, মাধবাচার্য্য বলিতেছেন কালটি, আনন্দগিরি বলিতেছেন চিদম্বরপুর। শঙ্করের পিতা-মাতার নাম, এবং জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধেও এই উভয় গ্রন্থকারের মধ্যে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে শঙ্করের মৃত্যুর বহু শতাব্দি পরে, তাহার জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয়, এবং শঙ্করবিজয়-গ্রন্থকার আনন্দগিরি, শঙ্করের সমসাময়িক তদীয় প্রধান শিষ্য আনন্দগিরি নহেন। শঙ্করবিজয়কার আনন্দগিরি বলিতেছেন যে চিদম্বরপুরে সর্ব্বজ্ঞ নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং কামাক্ষী নামে তাহার স্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের এক কন্যা জন্মিয়াছিল, তাহার নাম বিশিষ্টা। অষ্টমবর্ষ বয়সে বিশ্বজিৎ নামে একজন ব্রাহ্মণের সহিত বিশিষ্টা-দেবীর শুভ বিবাহ হয়। বিশিষ্টা-দেবী সর্ব্বদা শিবের আরাধনায়ই রত থাকিতেন। কিছু দিনান্তে তদীয় স্বামী বিশ্বজিতের মনে বিরাগের সঞ্চার হয়, এবং তিনি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। বিশিষ্টা দেবীও তদবধি চিদম্বর-স্থিত আকাশলিঙ্গ নামক শিব-বিগ্রহের সেবায় দিনাতিপাত করেন।

বিশিষ্টার সেবায় প্রসন্ন হইয়া, মহাদেব বিশিষ্টার মুখবিবর দ্বারা তাহার শরীর মধ্যে গর্ভরূপে প্রবেশ করিলেন। দশমাস পরে মহাদেব ভূমিষ্ঠ হইয়া জগতে শঙ্করাচার্য্য নামে পরিচিত হইলেন। যীশুখৃষ্টের জন্ম-কাহিনীর সহিত শঙ্করের এই জন্মকাহিনীর কিরূপ সাদৃশ্য, পাঠক চিন্তা করিবেন।

২। মাধবাচার্য্যের বর্ণিত শঙ্করের জন্ম।

শঙ্করের জন্মের কিছুকাল পূর্ব্বে মহাদেব দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বোক্ত কেরল প্রদেশে, বৃষপর্ব্বতে, শিবলিঙ্গরূপে আবির্ভূত হইলেন। কেরলরাজ রাজশেখর বারম্বার স্বপ্নে সেই শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্যের পরিচয় পাইয়া, তথায়, নিকটস্থ পূর্ণানদী তীরে, একটী অতি উৎকৃষ্ট দেব মন্দির নির্ম্মাণ করত, তাহারই মধ্যে সেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই মন্দিরের অনতিদূরে কালটি নামে এক অতি মনোরম ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম ছিল, তথায় বিদ্যাধিরাজ নামে একজন পণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহার একটী পুত্র ছিল, নাম শিবগুরু। শিবগুরু ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুগৃহে বাস করিয়া, অতি নিষ্ঠার সহিত গুরু সেবা এবং গুরু সমীপে বেদাধ্যয়ন করিতেন। তিনি প্রাতে এবং সায়াহ্নে বিধিমত হোম করিতেন। প্রত্যহ পাঠান্তে তিনি বেদের দুরুহ তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বিচার করিতেন। শিবগুরু এইরূপে বিধি পূর্ব্বক বেদ-পাঠাদি সমাপন করিলে পর, তাঁহার গুরু তাঁহাকে বলিলেন "বৎস তুমি সাঙ্গোপাঙ্গ বেদপাঠ সমাপন করিয়া বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণে সক্ষম হইয়াছ। তুমি সুদীর্ঘকাল আমার আলয়ে বাস করিয়া ভক্তির সহিত গুরুসেবা করিয়াছ। এখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর। হয়ত তোমার বন্ধু বান্ধবেরা তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, এখন গৃহে যাইয়া তাঁহাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন কর। বৎস, জীবন অনিত্য, উপযুক্ত সময়ে শস্য বপন করিলে, যেরূপ ফল লাভ হয়, অকালে বপন করিলে সেরূপ

হয় না। অতএব উপযুক্ত বয়স থাকিতেই তোমার বিবাহাদি করা সঙ্গত, নতুবা নিষ্ফল হইতে পারে। তোমার পিতা-মাতা হয়ত সর্ব্বদা তোমার বয়স গণনা করিতেছেন। উপনয়ন হইলেই মাতা-পিতা সন্তানের বিবাহের চিন্তা মনে স্থান দিয়া থাকেন। কারণ বিবাহ হইলেই তাঁহারা আশা করিতে পারেন, যে পিতৃলোকের পিণ্ডলোপ হইবে না। বিশেষতঃ সস্ত্রীক না হইলে, বৈদিক ক্রিয়াকলাপে অধিকার লাভ হয় না।

গুরুর কথা শুনিয়া শিবগুরু উত্তর করিলেন "হে গুরো আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিক, তথাপি এমন কোন নিয়ম নাই যে গুরুগৃহে বেদাধ্যায়ন করিয়া গৃহী হইতেই হইবে, অন্য আশ্রম গ্রহণ করা যাইবে না। যদিও গার্হস্থ্যই সাধারণ পথ, যাহার নিত্যানিত্য বিবেক, এবং অনিত্যে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, তাহার সন্ন্যাস আশ্রয়ই কর্ত্তব্য। আমি সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক আজীবন আপনার কাছে অবস্থান করিব, দণ্ডাজিন ধারণ পূর্বক হোম করিব, এবং নিরন্তর বেদ পাঠ করিব। যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গলাভ হয় বটে, কিন্তু বিধিগত যজ্ঞানুষ্ঠান সংসারে দুষ্কর। গৃহী নির্ধন হইলে, তাহার পক্ষে নরক যন্ত্রণাও শ্রেয়ঃ; কারণ ইচ্ছানুরূপ ভোগ বা দান করিবার শক্তি থাকে না। আবার যদি গৃহীর গৃহ ধনে পূর্ণও হয়, তথাপি তাহার ধনতৃষ্ণা যায় না। বহু কষ্টে বাসনানুরূপ ধন সঞ্চয় করিলেও, পূর্ব্ব সঞ্চিতের ক্ষয় হয়, এবং নূতন অর্থ সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়।"

গুরু শিষ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময়ে শিবগুরুর পিতা, পুত্রকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাধিরাজ সবিনয়ে বহু অর্থ গুরু দক্ষিণারূপে প্রদান করিয়া, পুত্রকে লইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন। দীর্ঘকালের পর শিবগুরু গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি সকলকে যথাবিধি সম্মান পূর্ব্বক অভ্যর্থনা

করিলেন। পিতা এবং বন্ধুদিগের সহিত তিনি বেদ, ন্যায়, সাংখ্য, এবং বৈশেষিক প্রভৃতি সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে গভীর আলোচনা দ্বারা বিশেষ ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিলেন। পুত্রের শাস্ত্রাধিকার, এবং বিচার নিপুণতা দেখিয়া পিতার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। অল্পকাল মধ্যেই নানাদিক্ হইতে শিবগুরুর বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল, শিবগুরুর গুণের কথা শুনিয়া অনেক ব্রাহ্মণ বহু অর্থ সহ কন্যাদান করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু বিদ্যাধিরাজ সে সকল প্রস্তাব তুচ্ছ করিয়া, মঘ-পণ্ডিত নামে একজন সৎবংশীয় ব্রাহ্মণের নিকট স্বীয় পুত্রার্থে তাঁহার কন্যা যাচ্ঞা করিলেন। মঘ-পণ্ডিত ও সম্মত হইলেন। বিবাহ কন্যাকর্ত্তার গৃহে হইবে বা বরকর্ত্তার গৃহে হইবে, এই লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। কন্যাকর্ত্তা বলিলেন যে বিবাহ যদি আমার গৃহে হয়, তবে আমি যে অর্থদান করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহার দ্বিগুণ অর্থ প্রদান করিব। বরকর্ত্তা বলিলেন, আমার গৃহে বিবাহ হইলে আমি অর্থ গ্রহণ করিব না। এইরূপ তর্ক চলিতেছিল, এমন সময়ে কন্যাকর্ত্তার কোনও বুদ্ধিমান আত্মীয় তাঁহাকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন, যদি আমরা এখনই বিবাহ স্থির না করিয়া চলিয়া যাই, হয়ত অপর কেহ তোমাদের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া স্বীয় কন্যা এই পাত্রে দান করিবে; এই কথা শুনিয়া কন্যাকর্ত্তা আপত্তি পরিত্যাগ করিলেন, এবং বিদ্যাধিরাজের কথায় সম্মত হইলেন। অনন্তর দেবপূজা-পূর্ব্বক শুভক্ষণে বাক্‌দান ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বিবাহের লগ্ন স্থির করিবার জন্য উভয় পক্ষের জ্যোতির্বিদেরা আসিয়া মিলিত হইল। শুভ মুহূর্ত্তে, শাস্ত্রীয় বিধিমতে, শিবগুরুর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল; এবং নবদম্পতি হর-পার্ব্বতীর ন্যায় সুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। গৃহে অগ্ন্যাধান না করিলে যজ্ঞ-ফল-লাভে অধিকার জন্মে না জানিয়া, তিনি গৃহে অগ্নিস্থাপন করিয়া স্বর্গ-লাভার্থ বহু ব্যয়সাধ্য যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। দেব-

গণ, পিতৃগণ, এবং প্রাণীগণ, সকলে নিজ নিজ অভিলষিত বলি লাভ করিয়া প্রীত হইলেন। সেই সাধু পরোপকারী, নিত্য-বেদাধ্যায়ী মহাত্মার সদনুষ্ঠানে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এবং বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল। যদিও তিনি রূপে, বিদ্যায়, এবং ধনে দেশের সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন, তথাপি তাহার চরিত্রে গর্ব্ব বা ঔদ্ধত্যের লেশ মাত্রও ছিল না। তিনি তৃণের ন্যায় বিনীত, এবং পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল ছিলেন।

শিবগুরু ক্রমে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন। বহু ধনজন এবং সম্মানের অধিকারী হইয়া ও পুত্র মুখ না দেখিতে পাইয়া তাহার মনস্তাপের সীমা রহিল না। হায়, এত সদনুষ্ঠানের পর ও তাহার সন্তান লাভ হইল না. কেবল আশায় আশায় দিন কাটিয়া গেল। তিনি মনের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া একদিন স্বীয় ভার্য্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। "হে সুভগে অর্দ্ধবয়স কাটিয়া গেল, পুত্রলাভ হইল না। ইহলোকেও আমাদের কোন আশা নাই, পরলোকেও কোন আশা নাই। বৃথাই পিতা আমায় জন্ম দিয়াছিলেন। পুত্র পরম্পরায় সংসারে নাম থাকে, পুত্রহীনকে কে স্মরণ করিবে? স্বামীর এই মর্ম্মান্তিক দুঃখের কথা শুনিয়া, তাঁহার ভার্য্যা উত্তর করিলেন ঃ—"হে নাথ, চল আমরা যাইয়া শিবরূপ কল্প-বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করি। তাঁহারই প্রসাদে অমোঘ ফললাভ হইবে। সেই ভক্ত বৎসল ভিন্ন কাহাকে ডাকিব। কে ই বা আমাদের বাসনা পূর্ণ করিতে পারে। দুঃখিনীর পুত্র উপমন্যু শিবের তপস্যা করিয়া ক্ষীর সমুদ্রের অধিপতি হইয়াছিলেন। শিবগুরু স্ত্রীর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া, ভগবান্ উমাপতির তপস্যা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ব্রাহ্মণ-দম্পতি অদূরস্থ পূর্ণা নদীতে স্নান করিয়া পূর্ব্বোক্ত বৃষ-পর্ব্বতস্থিত শিব মন্দিরে গিয়া শিব পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা কিছুদিন কন্দমূল মাত্র আহার করিয়া, পরে তাহারও পরিবর্ত্তে কেবল মাত্র শিব-

চরণামৃত পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন; বহুদিন এইরূপ নিয়ম ও কৃচ্ছ্রাদি সাধন দ্বারা শরীর ক্ষয় করিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন শিবগুরু অবসন্ন হইয়া নিদ্রিতের ন্যায় পড়িয়া আছেন, এমন সময়ে ভক্ত বৎসল মহাদেব দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহার নয়ন-গোচর হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি চাও, কেন এইরূপ কৃচ্ছ্র সাধন করিতেছ? শিবগুরু উত্তর করিলেন "হে দেব আমি পুত্র কামনা করিতেছি।" মহাদেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি বহু গুণশালী জ্ঞানী একটী মাত্র পুত্র চাও, অথবা মুর্খ, গুণহীন, এবং দীর্ঘায়ু, বহু পুত্র চাও।" শিবগুরু উত্তর করিলেন, "হে দেব আমি বহু-গুণযুক্ত জ্ঞানী এবং খ্যাতনামা একটী মাত্র পুত্র কামনা করি।" মহাদেব আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "তোমার কামনা পূর্ণ করিলাম, আর তপস্যা করিও না। গৃহিণীকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাও।" মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন, এবং শিবগুরু সংজ্ঞা লাভ করিয়া আপন সুস্বপ্ন গৃহিণীর নিকট জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার ভার্য্যা বলিলেন, নিশ্চয় আমরা বহু-গুণশালী একটী পুত্র লাভ করিব। দম্পতির আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। গৃহে ফিরিয়া গিয়া তাঁহারা এই সুস্বপ্ন পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিলেন। অনন্তর শিবগুরু একদিন অসংখ্য ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া, নিজে সকলের প্রসাদান্ন ভোজন করিলেন। তখন শৈব তেজ সেই অন্ন মধ্যে প্রবেশ করিল। তাঁহার পতি-পরায়ণা স্ত্রীও সেই ভুক্তাবশেষ অন্ন ভোজন করিলেন। ব্রাহ্মণী গর্ভবতী হইলেন। গর্ভস্থ সন্তান দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি অলস বোধ করিতে লাগিলেন, এবং আহারেও তাঁহার অরুচি জন্মিল। তাঁহার অরুচির কথা শুনিয়া বন্ধু বান্ধবেরাও বিবিধ সুমিষ্ট খাদ্যাদি লইয়া আসিতে লাগিলেন। সে সকল আস্বাদন করিয়া তিনি সাতিশয় প্রীত হইলেন। একদিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, যে একটী ধবল বর্ণ বৃষ তাহাকে বহন করিতেছে, এবং কোথাও বা তাহার

জয়ধ্বনি, এবং কোথাও বা "রক্ষঃ রক্ষঃ" শব্দ হইতেছে। এই সময়ে তাঁহার মনে নিয়ত সাত্ত্বিক ভাবের উদ্রেক হইত, এবং বিষয়-সুখে স্পৃহা থাকিত না। এইরূপে গর্ভস্থ শিশুর অলোক-সামান্য প্রভাব মাতার মনে প্রকাশ পাইতে লাগিল। অনন্তর শুভলগ্নে পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল; তিনিই ভবিষ্যতে শঙ্করাচার্য্য নামে জগতে পরিচিত হইলেন। শঙ্করের জন্মের সন তারিখ নির্দ্ধারণ করা কঠিন। মাধবাচার্য্য তিথি-নক্ষত্রের যে সমাবেশ দিয়াছেন তাহা এই:—

জায়া সতী শিবগুরো নিজতুঙ্গ-সংস্থে
সূর্য্যে কুজে রবিসুতে চ গুরৌ চ কেন্দ্রে॥

'অর্থাৎ সূর্য্য, কুজ (মঙ্গল), এবং রবি-সুত (শনি) যখন নিজ নিজ উচ্চ-স্থানে অবস্থিত, অর্থাৎ সূর্য্য মেষ রাশিতে, কুজ মকর রাশিতে, রবিসুত তুলারাশিতে, এবং গুরু বা বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থ, অর্থাৎ চতুর্থাদি অন্যতম রাশি-স্থিত, তখন শিবগুরুর ভার্য্যা সতী বিনা কষ্টে শিশু সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন।' উক্ত রাশি-নক্ষত্র দৃষ্টে, শঙ্করের জন্মের সন তারিখ নির্দ্ধারণ করা যায় কিনা, জ্যোতির্বিদেরা দেখিবেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেকেই অনুমান করিয়াছেন, যে ৭৮৮ খৃঃ অব্দে শঙ্করের জন্ম হয়। শঙ্কর ভূমিষ্ঠ হইলে পর, শিশুর মুখজ্যোতিতে সূতিকাগৃহ আলোকিত হইল। পুত্র-মুখদর্শনে শিবগুরুর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে গো, ভূমি, এবং ধনাদি দান করিলেন। চারিদিকে শিশুর মাহাত্ম্য সূচক লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ হিংসা-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, প্রেমে পরস্পরের গাত্র কণ্ডূয়ন করিতে লাগিল, তরুলতা সকল ফল-ফুলে সজ্জিত হইয়া হাস্য-মুখে ধরণীর পানে চাহিয়া রহিল; নদী সকল, আনন্দ ধারার ন্যায়, নির্ম্মল জলধারা বহন করিতে লাগিল। পর্জ্জন্য-দেব প্রেমে আকুল হইয়া সহসা অশ্রু-বর্ষণ করিল, উপনিষদ্ সকলের মুখ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল, ভগবান ব্যাস দেবের হৃদয়-কমল বিকশিত হইল; গন্ধবহ

সুগন্ধি হিল্লোলে দিঙমণ্ডল ব্যাপ্ত করিল। জ্যোতির্বিদেরা শিশুর জন্মের তিথি-নক্ষত্র আলোচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, যে এই সন্তান অসীম জ্ঞানের অধিকারী হইয়া পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাজয় করিবে, স্বতন্ত্র শাস্ত্র প্রণয়ন করিবে, এবং যতকাল পৃথিবী থাকিবে, ততকাল তাহারও নাম ঘোষিত হইবে। শিশুর পরমায়ুর কথা শিবগুরুও ভুলক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন না, এবং পণ্ডিতেরাও কিছু বলিলেন না। শিশুর মুখ-দর্শনে সকলের মনে আনন্দের সঞ্চার হইত বলিয়াই হউক, অথবা বহু তপস্যার পর শঙ্করের কৃপাতে এই পুত্র-রত্ন লাভ হইয়াছে বলিয়াই হউক, পিতা ইহার নাম শঙ্কর রাখিলেন। এ কথা ও এ স্থলে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, যে শঙ্করকে পুত্র-রত্ন রূপে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শঙ্করের পাঁচ শতাব্দির ও অধিককালের পরবর্ত্তী, শঙ্কর দিগ্বিজয়ের রচয়িতা, শঙ্করের পিতার ও শিবগুরু (বা শিবের গুরু) নামকরণ করিয়া থাকিতে পারেন। সে যাহা হউক, শিশু শঙ্কর, বালেন্দুর ন্যায় কলায় কলায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, ক্রমে হাসিতে শিখিল, ও হামা দিতে শিখিল, এবং দুই পায়ে চলিতে শিখিল। বালকের মুখে কথা ফুটিল। পণ্ডিতগণ বালকের মস্তকে চন্দ্র চিহ্ন, কপালে নেত্র চিহ্ন, ও স্কন্ধে শূল চিহ্ন দেখিয়া, তাহাকে শিবাবতার বলিয়া স্থির করিলেন। সন্তানের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, মাতা-পিতার ও মনের আনন্দ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। লোক সকল যখন পথ-হারা হইয়া, অন্ধ পথিকের ন্যায় বিপথে ভ্রমণ করিতেছিল, মোক্ষমার্গ যখন বিষম কন্টকময় অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, তখনই জীবের দুঃখ-ভার মোচনের জন্য, পূর্ণ শশধরের ন্যায় ভগবান শঙ্কর ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

৩। শঙ্করের বালচরিত্র এবং গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য সাধন।

শঙ্কর ক্রমে শৈশব-সুলভ ক্রীড়ায় নিমগ্ন হইল। কিন্তু শিশুর সেই চপলতার মধ্যেও তাঁহার ভাবি জীবনের মহৎ লক্ষণ সকল প্রকাশ হইতে লাগিল। শিশুর বয়ঃক্রম তিন বৎসর হইতে না হইতেই পাঠাভ্যাসে তাঁহার বিশেষ অভিনিবেশ দৃষ্ট হইল। শিশুর অলোক-সামান্য স্বাভাবিক শক্তির প্রভাবে, তাহাকে শিক্ষা দান করিতে গুরুর অনুমাত্রও পরিশ্রম হইত না। বরং সেই দেব-শিশু তাহার সহপাঠীদিগের পাঠাভ্যাসে সাহায্য করিয়া গুরুর শ্রমের লাঘব করিত। শঙ্করের বয়ঃক্রম তিন বৎসর হইলে পর, তাহার চূড়া-করণ ক্রিয়া বিধিমত সম্পন্ন হইল। এই ঘটনার কিছু দিন পরে শঙ্করের বয়ঃক্রম যখন তিন বৎসর মাত্র, তাহার পিতা বৃদ্ধ শিবগুরু পুত্র-মুখ-দর্শন-সুখ অনুভব করিয়া পরলোক গমন করিলেন। বন্ধুবান্ধবেরা সেই পতিরত্ন-বিরহিতা শোকাকুলা শঙ্কর-জননীকে নানাপ্রকারে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। স্বামীর প্রেতকৃত্য সকল, পত্নী যাহা পারিলেন নিজেই সম্পন্ন করিলেন, আর যাহা না পারিলেন, আত্মীয়বর্গ দ্বারা করাইলেন। শিবগুরুর মৃত্যুর পর তদীয় পত্নী দীক্ষা ধারণ পূর্ব্বক সম্বৎসরকাল কাটাইলেন। শঙ্করের পঞ্চম বর্ষ বয়সে তদীয় মাতা শুভ মুহূর্ত্তে পুত্রের উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন। পঞ্চম-বর্ষ বয়স হইতে না হইতেই শঙ্কর সম্যক্ উচ্চারণ পূর্ব্বক, বিনা সাহায্যে, সমস্ত বেদ পাঠ করিতে শিখিল। অতঃপর গুরুগৃহে বাস করিয়া শঙ্কর সাঙ্গোপাঙ্গ চতুর্ব্বেদ বিধিমত অধ্যয়ন করিল। বালকের উচ্চারণের পারিপাট্য এবং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া পণ্ডিতগণও মুগ্ধ এবং লজ্জিত হইত। সমপাঠি বালকেরা এই সময় হইতেই শঙ্করের সহিত একত্রে পাঠ করিতে অনিচ্ছুক হইত, এবং গুরু স্বয়ং ও শঙ্করের শিক্ষা-দান কার্য্য তত সহজসাধ্য মনে করিতেন না। নিতান্ত বালক হইয়া ও শঙ্কর যেন মূর্ত্তিমান ব্যাসের ন্যায় বেদের গূঢ় তাৎপর্য্য

সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিল। ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, এবং বৈশে-ষিক প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করিতে তাহার আর অধিক বিলম্ব হইল না। কিন্তু অদ্বৈতবিদ্যার অনুশীলনেই শঙ্করের মন নিয়ত মগ্ন থাকিত। গুরুগৃহে বাসকালে শঙ্করের সম্বন্ধে একটি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঘটনার সত্যাসত্যতা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু শঙ্করের হৃদয় শিশুকাল হইতেই পরের দুঃখে কিরূপ অভিভূত হইত—এই ঘটনা দ্বারা তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। ঘটনাটি এই :—একদা সমপাঠিদিগের সঙ্গে শঙ্কর এক অতি দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন। সেই গৃহের গৃহিণী বাল-ব্রহ্মচারীদিগকে দেখিয়া শ্রদ্ধাভরে বলিতে লাগিলেন :— "আপনাদিগের সেবার সাহায্য করিবার শক্তি যাহাদের আছে তাহারাই ধন্য। বিধাতা সে শক্তি হইতে আমাদিগক বঞ্চিত করিয়া-ছেন। ব্রহ্মচারীদিগকে ভিক্ষা দিবার যোগ্য আমাদিগের কিছুই নাই। বৃথাই আমরা জীবন ধারণ করিতেছি।" এইরূপে আক্ষেপ করিতে করিতে গৃহিণী শঙ্করের হস্তে একটি ক্ষুদ্র আমলক প্রদান কলিলেন। গৃহিণীর দরিদ্রতা দর্শনে শঙ্করের কোমল প্রাণ বিগলিত হইল। তাহার দরিদ্রতা নিবারণের জন্য শঙ্কর সুমধুর বাক্যে লক্ষ্মীদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীদেবী ও তাহার স্তুতি বাক্যে প্রসন্ন হইয়া সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইলেন, এবং সহাস্য মুখে বলিতে লাগি-লেন :—"বৎস, আমি তোমার মনের কথা জানিয়াছি, কিন্তু কি করিব, এই দরিদ্র পরিবার পূর্ব্বজন্মে এমন কোন সুকৃত করে নাই, যাহার জন্য অদ্য আমি ইহাদিগকে পুরস্কার দিতে পারি।" শঙ্কর উত্তর করিল "মাতঃ, গৃহিণী এই মাত্র আমাকে একটি আমলক প্রদান করিয়াছে, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে অদ্যই ইহাদিগকে এই কার্য্যের পুরস্কার প্রদান কর।" বালকের এই কথায় লক্ষ্মীদেবী অতিশয় প্রীত হইয়া সেই দরিদ্রার গৃহ সুবর্ণ

আমলকে পূর্ণ করিয়া দিলেন। এইরূপে শঙ্কর সেই দরিদ্রার গৃহে অতুল ধনরাশি প্রদান করিয়া, সমপাঠিদিগের সঙ্গে গুরু গৃহে প্রত্যা-বর্ত্তন করিলেন।

মাধবাচার্য্য বলিতেছেন যে অতি বাল্যকালেই সরহস্য সমস্ত বিদ্যা শঙ্করের আয়ত্ত হইয়াছিল। ন্যায়, সাংখ্য, মীমাংসা, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র, সৌত্রান্তিক, যোগাচার, মাধ্যমিক, এবং বৈভাষিক প্রভৃতি বৌদ্ধ দর্শন, জৈন এবং চার্ব্বাক্ দর্শন সমস্তই তিনি অতি বাল্যকালে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ইতিহাস, পুরাণ, এবং স্মৃতি শাস্ত্র— এ সকলের কিছুই তাঁহার অধ্যয়ন করিতে বাকি ছিল না। তাঁহার জ্ঞান এবং বুদ্ধির এই অলৌকিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার শরীর ও দিন দিন দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, এবং শ্রীসম্পন্ন হইতে লাগিল। শরীরের শোভার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার নির্ম্মল, উদার চরিত্র ও দিন দিন অনুপম শোভা ধারণ করিতে লাগিল। পর-দুঃখ মোচনের ইচ্ছা তাঁহার অন্তরে দিন দিন প্রবলতর হইতে লাগিল। ক্ষমা সাধনা দ্বারা তিনি ক্রোধ ও হিংসার উচ্ছেদ সাধন করিলেন। সন্তোষের প্রভাবে তিনি বিষয় বাসনা, লোভ এবং মিথ্যাচারকে জয় করিলেন। পরের দোষের পরিবর্ত্তে, পরের গুণালোচনাতেই তিনি সর্ব্বদা রত থাকি-তেন। একদিকে যেমন তিনি বিদ্যাতে অদ্বিতীয়, অপরদিকে চরি-ত্রের নির্ম্মলতাতেও তিনি উপমা-রহিত। এইরূপে শঙ্কর, জীবের দেহাত্মবোধ উন্মুলিত করিয়া, জীবের দুঃখভার হরণ করিয়া, জগৎকে নিত্য সুখের অধিকারী করিবার উপযুক্ততা লাভ করিতে লাগিলেন। অথচ এই সময়ে শঙ্করের বয়ঃক্রম মাত্র সাত বৎসর। বর্ণনা পাঠ করিয়া অনেকেরই হয়ত বিশ্বাস হইবে না, যে এ সপ্তবর্ষ বয়স্ক বালকের বর্ণনা।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শঙ্করের শিষ্যবর্গের অভ্যুদয়।

৪। শঙ্করের শিষ্যবর্গ।

শঙ্করের প্রধান প্রধান শিষ্যগণও এই সময়েই জন্ম গ্রহণ করেন। শঙ্করবিজয়ে প্রধান শিষ্যদিগের যে সকল নাম পাওয়া যায় তাহা এই :— পদ্মপাদ, হস্তামলক, সমিৎপাণি, চিৎবিলাস, জ্ঞানকন্দ, বিষ্ণুগুপ্ত, শুদ্ধকীর্ত্তি, ভানুমরীচি, কৃষ্ণদর্শন, বুদ্ধিবৃদ্ধি, বিরিঞ্চিপাদ, শুদ্ধানন্তা-নন্দগিরি প্রমুখ, "শিষ্যবরৈঃ, সেব্যমানঃ, সর্ব্বজ্ঞঃ, শ্রীশঙ্কর ভগবৎ-পাদাচার্য্যঃ।" আনন্দগিরি প্রধান শিষ্য মধ্যে মণ্ডনের উল্লেখ করিতেছেন না। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে শঙ্করবিজয়কারের মতে, যিশু খৃষ্টের ন্যায় শঙ্করেরও দ্বাদশজন প্রধান শিষ্য ছিল। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, যে আনন্দগিরি কৃত শঙ্করের জন্মের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে যিশু খৃষ্টের জন্মের সহিত কতক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। পাঠক পরে দেখিতে পাইবেন, যে খৃষ্ট-শিষ্য জুডসের ন্যায় (Judas Iscariot) গুরুমারা বিদ্যায়-নিপুণ অভিনব-গুপ্ত নামে শঙ্করেরও একজন বিশ্বাসঘাতক শিষ্য ছিল ; তিনি বিষ প্রয়োগ দ্বারা শঙ্করের বধের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এতদ্দৃষ্টে অনুমান করিতে হয় যে আনন্দগিরি নামীয় শঙ্করবিজয় গ্রন্থ, খৃষ্টীয় প্রচারকদিগের আগমনের বহুকাল পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের

সমসাময়িক শিষ্য শুদ্ধানন্তানন্দগিরি কর্ত্তৃক তাহা লিখিত হওয়া সম্ভবপর নয়। সে যাহা হউক আমরা মাধবাচার্য্য কৃত শঙ্কর দিগ্বিজয় নামক গ্রন্থ এবং ধনপতি সূরিকৃত তাহার টীকাই অধিকতর নির্ভর এবং বিশ্বাস যোগ্য মনে করিতেছি। মাধবাচার্য্য শঙ্করের প্রধান প্রধান শিষ্যদিগের জন্মাদি সম্বন্ধে যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা এইঃ—পদ্মপাদ বিমল নামক ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি বিষ্ণুর অবতার। হস্তামলক, প্রভাকর নামক ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি পবন দেবের অবতার। তোটক'ও পবন দেবেরই অন্যতম অবতার। উদঙ্ক নন্দীর অবতার। সুরেশ্বর, যাঁহার অন্যতর নাম মণ্ডন মিশ্র বা বিশ্বরূপ, ব্রহ্মার অবতার ছিলেন। আনন্দগিরি বৃহস্পতির অবতার, এবং চিৎসুখ বা চিৎবিলাস বরুণ দেবের অবতার। সুরেশ্বর বা মণ্ডন মিশ্রের সহধর্ম্মিণী উভয়ভারতী সরস্বতীর অবতার। তবে এস্থলে ইহাও উল্লেখ করিতে হয় যে আনন্দগিরির মতে মণ্ডনপত্নীর নাম সরসবাণী। "মণ্ডনমিশ্র পত্নীং কৃত্বা সরসবাণী-নাম্নীং"। আনন্দগিরি মতে তিনি কুমারিল ভট্টের ভগিনী, কারণ কুমারিল ভট্ট বলিতেছেন যে মণ্ডনমিশ্র তাহার ভগিনীপতি "মদ্ভগিনী-ভর্ত্তা মণ্ডনমিশ্রঃ।" উভয়-ভারতীরূপে সরস্বতীর অবতরণ সম্বন্ধে মাধবাচার্য্য একটী সুন্দর আখ্যায়িকার উল্লেখ করিতেছেন—পুরাকালে ব্রহ্মার নিকটে ঋষিগণ বেদ পাঠ করিতেছিলেন, কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসাও তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। কোপনস্বভাব লোকদিগের কথা বলিবার সময়ে প্রায়ই মুখে বাক্য ঠেকিয়া থাকে। বেদ পাঠ-কালে দুর্ব্বাসার মুখেও বাক্য ঠেকিতেছিল। তরলমতি বালিকা সরস্বতী তাহা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তদ্দর্শনে দুর্ব্বাসা ক্রোধে অধীর হইলেন। তাহার নেত্রযুগল হইতে অগ্নিবর্ষণ হইতে লাগিল। ভ্রুকুটি সহকারে সরস্বতীর প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিয়া, তিনি বলিতে লাগিলেন "হে দু-দু-দুর্ব্বিনীতে, তু-তু-তুমি যাইয়া ভূ-ভূ-ভূতলে জ-জ-জন্ম গ্রহণ

কর।" শাপগ্রস্তা হইয়া সরস্বতী ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন, দুর্ব্বাসার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অপরাপর মুনিগণও সরস্বতীর কাতরতা দেখিয়া স্নেহবশে দুর্ব্বাসাকে বলিলেন "হে ভগবন্ বালিকার অপরাধ ক্ষমা কর, পিতা কি কখনও সন্তানের অপরাধ গ্রাহ্য করে।" দুর্ব্বাসা প্রসন্ন হইয়া সরস্বতীর শাপ মোচনের সময় নির্দ্ধারণ করিয়া বলিলেন "মর্ত্তালোকে শঙ্করের সঙ্গে তোমার সমাগম হইলে পর, তুমি দেবলোকে ফিরিয়া আসিবে।" পাঠক দেখিবেন হর্ষ চরিতে সরস্বতীর অবতরণের গল্পটি প্রায় এইরূপ :— অত্রিপুত্র দুর্ব্বাসা সামগান করিবার সময়ে মন্দপাল ঋষির সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়াতে, একস্থলে তাঁহার উচ্চারণে দোষ ঘটিয়াছিল। তাহা শুনিয়া সরস্বতী তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিলেন। দুর্ব্বাসা ক্রোধভরে তাঁহাকে অভিশাপ করিলেন, যে তিনি মর্ত্তালোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া একটি সন্তান হওয়ার কাল পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিবেন।

৫। উভয়-ভারতী এবং মণ্ডনমিশ্র (বা সুরেশ্বর বা বিশ্বরূপ)।

সরস্বতী দেবী শোন নদী তীরে বিষ্ণুমিত্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণের কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। কন্যার নাম উভয়ভারতী, তিনি অসীম গুণে ও জ্ঞানে বিভূষিতা হইলেন। বিদ্যা সকল যেন তাহাদের নৈসর্গিক বাসভূমির ন্যায় বিনা আয়াসে সেই কন্যার ভিতরে প্রবেশ করিল। সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা, এবং বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্র, বেদ চতুষ্টয়, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, এবং জ্যোতিষ প্রভৃতি বেদাঙ্গ, এবং সমগ্র কাব্যশাস্ত্র অবলীলাক্রমে তাঁহার আয়ত্ত হইল। তাঁহার এইরূপ অলোকসামান্য, বিদ্যাবত্তা দেখিয়া লোক সকল চমৎকৃত হইল। এদিকে আবার ব্রহ্মাও সুরেশ্বর নামে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহারই অপর

নাম মণ্ডনমিশ্র বা বিশ্বরূপ। এই বিশ্বরূপ জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ভট্টপাদ বা কুমারিলের প্রধান শিষ্য। তাঁহারও শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। উভয়ভারতী এবং বিশ্বরূপ উভয়েই লোক মুখে পরস্পরের অসামান্য রূপলাবণ্য, এবং গুণের কথা শুনিতে পাইলেন। শুনিতে পাইয়া, বয়ঃপ্রাপ্ত কুমার কুমারীর যাহা হইয়া থাকে, তাহাদেরও তাহাই হইল,—দুজনেরই পরস্পরের প্রতি অনুরাগ জন্মিল,—পরস্পর দর্শনের ইচ্ছা হইল,—ক্রমে সেই ইচ্ছা ঘনীভূত হইয়া ব্যাকুলতাতে পরিণত হইল। সাধারণ প্রণয়ী-যুগলের ন্যায় তাহারাও পরস্পরের শুভ দর্শন কল্পনা করিতে করিতে নিদ্রিত হইতেন, এবং স্বপ্নে পরস্পরের দর্শন লাভ, এবং পরস্পরের সহিত আলাপ করিতেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইবামাত্র পুনরায় সেই শুভ নিদ্রাকে আহ্বান করিতেন। যতক্ষণ জাগিয়া থাকিতেন মন সর্ব্বদা চঞ্চল এবং ব্যাকুল থাকিত। পরস্পর দর্শনের প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও লজ্জায় কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেন না। উভয়েরই আহারবিহারে বিরাগ জন্মিল, শরীর দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল। এইরূপে তাহারা উভয়ে মনাগুণে নিয়ত দগ্ধ হইতে-ছিলেন। কিন্তু জ্বলন্ত বহ্নি আর কতকাল যাপ্যভাবে থাকিবে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, শঙ্করের সময়েও ভারতে স্ত্রীশিক্ষা, এবং যৌবন বিবাহের প্রথা কিরূপ প্রচলিত ছিল।

ইতিমধ্যে বিশ্বরূপের প্রতি তাহার পিতার দৃষ্টি পড়িল। পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তোমার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে, মনও যেন নিস্তেজ হইতেছে, তোমার শরীরে কোনরূপ ব্যাধির লক্ষণ দেখিতেছি না, অনেক ভাবিয়াও তোমার কষ্টের কারণ ঠিক্ করিতে পারিতেছি না। দরিদ্রতার কষ্ট তোমার নাই, দুর্ব্বহ কুটুম্বভার তোমাকে বহন করিতে হয় না, মূর্খ বলিয়া অবমানিত হইবার আশঙ্কা তোমার নাই, কাহারও

সহিত বিচারে পরাজিত হইবার সম্ভাবনাও তোমার নাই, স্বপ্নেও দুষ্কর্ম্ম কর নাই, তবে কেন তোমার মুখচ্ছবি দিন দিন ম্লান হইতেছে।" অপরদিকে বিষ্ণুমিত্রও, তাঁহার কন্যার মুখকান্তি গ্রীষ্ম-কালের সরোবরের ন্যায় দিন দিন শুষ্ক হইতেছে দেখিয়া, পুনঃ পুনঃ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বহু অনুরোধ উপরোধের পর, পিতা মাতার কষ্টে দয়ার্দ্র হইয়া, তাহারা উভয়েই স্ব স্ব মনের ভাব প্রকাশ করিলেনঃ—বিশ্বরূপ পিতাকে বলিলেন, "মনের কথা তোমা-দিগকে বলা উচিত কিনা ইহা ভাবিতেও লজ্জা বোধ হয়, শোন নদী তীরে বিষ্ণুমিত্র নামে একজন ব্রাহ্মণের একটী কন্যা আছে, অভ্যাগত-দিগের মুখে সেই কন্যার রূপলাবণ্য ও বিদ্যার কথা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি; এবং তাহাকে বিবাহ করিবার আমার ইচ্ছা হইয়াছে।" পুত্রের মনের কথা জানিতে পারিয়া, পিতা হিমমিত্র অবিলম্বে সেই কন্যার উদ্দেশে, দুইটী সুচতুর ঘটক ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিলেন। অপরদিকে উভয়-ভারতীও তাহার পিতার নিকট মনোগত ভাব প্রকাশ করিলেন। "রাজস্থানে বিশ্বরূপ নামে একজন ব্রাহ্মণ কুমার আছেন, তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া, তাঁহার পদসেবা করিবার জন্য আমার নিয়ত অভিলাষ হইতেছে, হে তাত, যদি পার, তবে তুমি আমার এই কার্য্যের সহায়তা কর।" পাঠক লক্ষ্য করি-বেন, যে শঙ্করের সময়ে বরকন্যার পরস্পরের মনোনয়ন প্রথা কিরূপ প্রচলিত ছিল। এ দিকে হিমমিত্র-প্রেরিত ব্রাহ্মণদ্বয় আসিয়া বিষ্ণুমিত্রের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণুমিত্র তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক, আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া, জানিতে পারি-লেন, যে তাঁহার কন্যার সহিত বিশ্বরূপের বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য, বিশ্বরূপের পিতা হিমমিত্র তাহাদিগকে পাঠাইয়াছেন। বিষ্ণু-মিত্র তাঁহাদিগকে এপ্রস্তাবে নিজের সম্মতি জানাইয়া, বলিলেন, যাহা-হউক একবার গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। বিষ্ণুমিত্র ভার্য্যার

নিকট যাইয়া বলিলেন "ভদ্রে কি করিব বল, তোমার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব লইয়া রাজস্থান হইতে দুইজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, ভাবিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় বল, বাক্য যেন প্রত্যাহার করিতে না হয়"। ভার্য্যা উত্তর করিলেন. "দূর দেশ, বিদ্যা, কুল, বিত্ত, এবং বয়স বিষয়ে আমি কিছুই জানি না, আমি আর কি বলিব। বিদ্বান, সদ্বংশজ, এবং সচ্চরিত্র পাত্র দেখিয়া কন্যা প্রদান করা কর্ত্তব্য।" "হে অনঘে, যিনি দুর্জ্জয় বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাজয় করিয়া, বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, বিশ্বরূপ সেই কুমারিল ভট্টেরই শিষ্য।" —পাঠক লক্ষ্য করিবেন বিষ্ণুমিত্রের কথা দ্বারা মনে হইতে পারে না যে 'কুমারিল' বিষ্ণুমিত্রেরই পুত্র, অথবা মণ্ডনের ভাবী পত্নী, বিখ্যাত বৌদ্ধবিজয়ী কুমারিলেরই ভগিনী। অথচ আনন্দ-গিরি মণ্ডনমিশ্রকে কুমারিলের ভগ্নিপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ("মদ্ভগ্নীভর্ত্তা মণ্ডনমিশ্রঃ")। সে যাহা হউক আমরা মাধবাচার্য্যেরই অনুসরণ করিতেছি। বিষ্ণুমিত্র বলিতে লাগিলেন "ব্রাহ্মণের বিদ্যাই ধন। যাহা সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তাহাই প্রকৃত ধন। তাহাই ধন, যাহার যশঃসৌরভ চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়, তাহাই ধন, যাহা রাজা অথবা চোর হরণ করিতে পারে না। পরন্তু কন্যার বয়স হইয়াছে, আর অধিককাল গৃহে রাখা উচিত নয়। যাহা হউক আমাদের মধ্যে এ বিষয় লইয়া আন্দোলন না করিয়া, চল, কন্যাকেই যাইয়া তাহার মত জিজ্ঞাসা করি।" কন্যার মত লইয়া বিবাহ স্থির করিবার প্রথাও তখন প্রচলিত দেখা যায়। মাতাপিতা উভয়ে তখন কন্যাসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "বিশ্বরূপের বিবাহের পাত্রীর অনু-সন্ধানে দুইজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন। এখন বল আমাদের কি কর্ত্তব্য।" পিতার এই কথা শুনিবা মাত্র, আনন্দে কন্যার শরীর পুল-কিত হইল। পিতামাতা তাহাই প্রশ্নের সমুচিত উত্তর মনে করি-

লেন। বিষ্ণুমিত্র অভ্যাগত ব্রাহ্মণদিগকে আপন সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অন্তঃপুর হইতে গণিতশাস্ত্রজ্ঞা উভয়ভারতী পিতাকে লিখিয়া জানাইলেন, যে আজ হইতে চতুর্দ্দশ দিবসে শুভ যামিত্র লগ্ন। ব্রাহ্মণদ্বয়, কন্যা-পক্ষীয় অপর একজন ব্রাহ্মণ সঙ্গে লইয়া, হিমমিত্রের আলয়ে যাইয়া কার্য্য সিদ্ধির কথা জানাইলেন। কন্যা-পক্ষের ব্রাহ্মণ স্বীয় হস্ত-স্থিত পত্র, হিমমিত্রকে প্রদান করিলে, তিনি তাহা পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইলেন, এবং বিশ্বরূপকে শুভ সংবাদ দিবার জন্য, অপর একজন ব্রাহ্মণের উপর ভার দিলেন। বিবাহ স্থির হইয়াছে জানিয়া, বিশ্বরূপের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

বিশ্বরূপ বিবাহের জন্য সুসজ্জিত হইয়া, শুভ মুহূর্ত্তে যাত্রা করিয়া শোননদীতীরে উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণুমিত্র ও তাহার আগমন সংবাদ পাইয়া, বহু বাদ্যসহকারে বরকে গৃহে লইয়া গেলেন, এবং বর পক্ষীয় ব্রাহ্মণগণকে আসন ও পাদুকা প্রদান করিলেন। অনন্তর বরকে অর্ঘ্য এবং বহুমূল্য পাত্রে মধুপর্ক প্রদান করিয়া, সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন "আমি এবং এই আমার কন্যা সকলই তোমার, আমার গো ধনাদি সকলই তোমার। বিবাহোপলক্ষে তোমার দর্শন লাভ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম, এবং আমার কুল পবিত্র হইল, কোথায় তুমি পণ্ডিত-গণের অগ্রগণ্য, আর কোথায় আমি নিতান্ত জ্ঞানহীন।" তৎপরে বরের পিতাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে ভগবন্ এই গৃহে যাহা কিছু তোমার প্রীতিকর, সমস্তই আজ হইতে তোমার হইল"। হিমমিত্র উত্তর করিলেন, "যাহা কিছু তোমার, সকলই আমার।" এইরূপ পরস্পরের মধুর আলাপে তাঁহারা পরম পরিতোষ লাভ করি-লেন। এদিকে বর কন্যাও পরস্পরের দর্শনজন্য ব্যাকুল হইল। তাহাদের স্বাভাবিক রূপলাবণ্য এত অধিক ছিল, যে অলঙ্কারাদির কোন প্রয়োজন ছিল না; তথাপি করিতে হয় বলিয়াই যেন তাহারা বেশভূষা করিতে লাগিলেন। বিবাহের লগ্নের কথা

গণকেরা উভয়ভারতীকেই জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারই উপদেশ মতে বিবাহের শুভ মুহূর্ত্ত স্থির করিয়া, হিমমিত্র-পুত্র মণ্ডন মহাসমারোহের সহিত বিষ্ণুমিত্রের কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। বর গৃহ্যসূত্রোক্ত বিধি অনুসারে অগ্নি স্থাপিত করিয়া, তাহাতে হোম করিলেন, এবং বধূ তাহাতে লাজাহুতি প্রদান করিয়া ধূম গ্রহণ করিলেন। পরিশেষে বর অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন। হোমক্রিয়া শেষ হইলে পর, বন্ধুবর্গেরা বিদায় গ্রহণ করিল। বিশ্বরূপ দীক্ষা ধারণ পূর্ব্বক বধূ সহ চারিদিন অগ্নিগৃহে বাস করিলেন। অতঃপর বরের স্বগৃহে প্রত্যাগমনের সময় উপস্থিত হইল। তখন কন্যার মাতাপিতা জামাতাকে একান্তে ডাকিয়া সস্নেহে বলিতে লাগিলেন; "বৎস, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। এই কন্যা নিতান্ত শিশু, কিছুই জানে না; এখনও সারাদিন পুতুল লইয়া সমবয়স্কাদের সহিত খেলা করিয়া কাটায়। ক্ষুধায় কাতর হইলে পর গৃহে ফিরিয়া আসে। এই আমাদের একমাত্র কন্যা, আজ পর্য্যন্ত তাহাকে গৃহকর্ম্মে নিয়োগ করা হয় নাই। নিজের কন্যার ন্যায় সর্ব্বদা ইহাকে রক্ষা করিবে। ইহার প্রতি সর্ব্বদা মৃদু ব্যবহার করিবে। কটু কথা দ্বারা ইহাকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিবে না। এ কন্যা রুষ্টা হইলে, তাহা দ্বারা কোন কার্য্যই করাইতে পারা যায় না। এই কন্যা আমাদের অতি আদরের ধন। একদা কোন এক বিশুদ্ধাত্মা মহাপুরুষ এই কন্যাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"এই কন্যা যদিও মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইনি কোন দেবতা হইবেন। তোমরা কদাপি ইহার প্রতি কোনরূপ কটূক্তি করিবে না। ইহার মধ্যে সর্ব্বজ্ঞত্বের লক্ষণ সকল বর্ত্তমান। একদিন ইনি প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতদিগের বিচারে মধ্যস্থ নিযুক্ত হইবেন।" কন্যার শ্বাশুরীকেও আমাদের হইয়া বলিও "এই কন্যা এখন তোমার হাতে সমর্পিত হইল। অল্পে অল্পে গৃহকর্ম্মে নিয়োগ করিবে। তরলমতি শিশু কতই না অপরাধ করিবে। গৃহকর্ত্রীর পক্ষে তাহা গ্রাহ্য

করা উচিত হইবে না। আমাদের সাধ্য নাই যে নিজে যাইয়া সকল কথা তোমার মাতাকে বুঝাইয়া বলি। নিজের সংসারবাস ফেলিয়া কিরূপে যাইব? যাহা হউক তুমি ভালরূপে তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলে, সাক্ষাৎ বলার ই ফল হইবে।"

অনন্তর পিতা-মাতা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন :—"বৎসে, আজ হইতে জীবনের এক নূতন সোপানে আরোহণ করিলে। যাহাতে গৌরবের সহিত এই নূতন জীবনের কর্ত্তব্য সকল পালন করিতে পার, সে জন্য সর্ব্বদা যত্নবতী থাকিবে। আজ হইতে আর বালিকার ন্যায় ব্যবহার করিবে না, তাহা হইলে লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইবে। তোমার বাল্য-ব্যবহার আমরা যেরূপ ভাল বাসিয়াছি, অপর কেহ সেরূপ করিবে না। এখন হইতে বশিষ্ঠের অরুন্ধতী, বা আগস্ত্যের লোপামুদ্রার আচারই তোমার জীবনে প্রমাণরূপে গণ্য করিতে হইবে। পতিই তোমার একমাত্র কর্ত্তা, অনন্যমনে তাহাকেই আশ্রয় করিবে। পতির আহার না হইলে, আহার করিবে না। পতি বিদেশে থাকিলে, বেশভূষা করিবে না। স্বামীর স্নানের পূর্ব্বে, সর্ব্বদা স্নান করিবে। বয়োজ্যেষ্ঠাদিগের আচার সর্ব্বদা অনুসরণ করিবে। স্বামীকে ক্রুদ্ধ দেখিলে, তুমি ক্রোধ করিবে না। কোন কথা না বলিয়া তখন সমস্ত ক্ষমা করিবে। দেখিবে তখন আপনা হইতেই তাহার ক্রোধের নির্ব্বাণ হইবে। পরপুরুষের সহিত আলাপ করিবে না। স্বামির সাক্ষাতে, এমন কি তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া ও পরপুরুষের সহিত আলাপ করিবে না, স্বামির অগোচরে আলাপ করিবে না—সে আর কি বলিব। সংশয়ই স্বামী-স্ত্রীর প্রণয় নষ্ট করে। স্বামী স্থানান্তর হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিলে, সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হইলেও তাঁহাকে পাদোদক প্রদান করিবে, এবং তাঁহার সময়োচিত পরিচর্য্যা করিবে।

স্বামীর সুখের জন্য জীবনও উপেক্ষা করিবে। স্বামীর অনুপস্থিতিকালে যদি গৃহে কোন সাধুর আগমন হয়, তবে তাঁহার যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটি করিবে না। দেখিবে সাধু-মহাত্মারা যেন তোমার গৃহ হইতে নিরাশমনে চলিয়া না যান। তোমার পিতার ন্যায়, তোমার শ্বশুরের আদেশ নিয়ত পালন করিবে। সহোদর জ্ঞানে দেবরের কথা শুনিবে। আত্মীয়-স্বজন ক্রুদ্ধ হইলে, দম্পতির পরস্পর প্রণয় যতই গাঢ় হউক, তাহাদের মধ্যে বিবাদ অবশ্যম্ভাবী"। এই সকল উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, এবং বন্ধুবর্গ হইতে বিবিধ প্রকারে সম্মান লাভ করিয়া, বর কন্যা গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়া রাজস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

শঙ্করের কুমারচরিত এবং সন্ন্যাস গ্রহণ।

৬। শঙ্করের মাতৃসেবা।

শঙ্কর সপ্তমবর্ষ বয়সেই অধ্যয়ন কার্য্য সমাপন করিয়া, গুরুগৃহ হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গৃহে আসিয়া, একদিকে যেমন তিনি ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা করিতে লাগিলেন, অপর দিকে তেমনি আবার অতি যত্নের সহিত তিনি মাতার সেবা করিতে লাগিলেন। পুত্রের সুমিষ্ট আলাপ, চরিত্রের নির্ম্মলতা, শরীরের কান্তি, এ সকল দেখিয়া মাতার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। মাধবাচার্য্য এই সময়ের একটী অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিতেছেন। একদা শঙ্কর-জননী স্নানার্থ পূর্ণা নদীতে গমন করিয়াছিলেন। সেই নদী কালটি গ্রাম হইতে কিঞ্চিৎ দূরে প্রবাহিত হইতেছিল। ফিরিয়া আসিবার সময়ে, সূর্য্যের প্রখর রশ্মিপাতে সেই নদীতীরের বালুকারাশি এত উত্তপ্ত হইয়াছিল, যে শঙ্করের মাতার চলিতে অসহ্য কষ্ট হইতে লাগিল। নদীতীরের বালুকা উত্তপ্ত হইলে, তাহার উপরে পাদচালনা করিতে যে কি কষ্ট হয়, যাহারা কটকের কাটজুড়ী নদীর তীরে ফাল্গুন, চৈত্র, কি বৈশাখ মাসে, বেলা দশ ঘটিকার পরে, পথ চলিয়াছেন, তাঁহারা সহজে বুঝিতে পারিবেন। মস্তকোপরি সূর্য্যের অগ্নিবৃষ্টি, পাদদেশে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ-সম জ্বলন্ত বালুকাস্পর্শ,

চতুর্দ্দিক হইতে অনলশিখা-সম উত্তপ্ত বায়ুর স্পর্শ, এই বিষম কষ্টে কটকের কাটজুড়ী নদীতীরে অনেকে সূর্য্যাঘাতে (sun-stroke) প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। স্নানান্তে গৃহে আসিবার সময়ে শঙ্কর-জননীরও প্রায় ঐরূপ অবস্থা হইয়া উঠিয়াছিল। উত্তপ্ত বালুকা, প্রখর সূর্য্যরশ্মি, এবং অগ্নিশিখা-সম উত্তপ্ত বায়ুস্পর্শে, মাতার শরীর যেন আপাদমস্তক দগ্ধ হইতে লাগিল; মাতার সেই প্রাণান্তিক যন্ত্রণা দর্শনে শঙ্কর কোনমতেই আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি বহু চেষ্টা করিয়া জলসিক্ত পদ্ম দ্বারা ব্যজন করিতে করিতে মাতাকে কোনরূপে গৃহে লইয়া আসিলেন। স্বীয় জননীর ঈদৃশ বিষম কষ্ট দর্শনে, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে নদী দূরে থাকাতে স্নানার্থীদিগের কত সময়ে কত কষ্ট হয়। স্নানার্থীদিগের কষ্ট দূর করিবার মানসে, বালক শঙ্কর নদীকে লোকালয়ের নিকটবর্ত্তী করিবার জন্য নদীদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। নদীদেবীও, ক্ষুদ্র বালকের হৃদয়ে পরের মঙ্গল সাধনের ঈদৃশ প্রবল ইচ্ছা দর্শনে প্রীত হইয়া, সেই বালকের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। নদীদেবী শঙ্করের স্তুতিবাক্যে প্রসন্না হইয়া বর প্রদান করিলেন :—"যেহেতু তুমি বালক হইয়াও জগতের হিত কামনা করিতেছ, কল্য প্রাতেই তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।" নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। "পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা" 'পূর্ব্বে যেখানে জলের স্রোত বহিতেছিল, অধুনা সেস্থানে শুষ্ক বালি মাত্র'—এরূপ দৃশ্য কে না দেখিয়াছেন। ভূমিকম্পাদি ভৌতিক কারণে, অনেক সময়ে নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হয়। তবে শঙ্কর প্রার্থনা করিল, আর অমনি নদী স্থানান্তরিত হইল, এ কথা হয়ত অনেকের নিকট বিশ্বাসযোগ্য হইবে না। এস্থলে আমরা ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত শূদ্র ব্রহ্মর্ষি কবষের প্রার্থনামতে সরস্বতী নদীর গতি পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকার উল্লেখ আছে, তাহা অনুবাদ করিয়া পাঠকের সম্মুখে

উপস্থিত করিতেছি। সম্ভবতঃ মাধবাচার্য্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত কবষের আখ্যায়িকা দৃষ্টে, শঙ্করের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন মানসে, তাহার প্রার্থনামতে নদীর স্থান পরিবর্ত্তনের এই আখ্যায়িকার কল্পনা করিয়া থাকিবেন :—

৭। সরস্বতী নদী কর্ত্তৃক শূদ্র ব্রহ্মর্ষি কবষের অনুগমন।

"কোন এক সময়ে ভৃগু, অঙ্গিরা, প্রভৃতি ঋষিগণ সরস্বতী নদীতীরে একটী সত্র বা বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য একত্র হইয়াছিলেন। তখন তাহাদের মধ্যে ইলুষের পুত্র কবষ নামক এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ঋষিগণ সেই ঐলুষ কবষকে তাঁহাদের অনুষ্ঠিত সোমযাগ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই :—"দাসীর পুত্র, দ্যূতকার, অব্রাহ্মণ, এই কবষ কিরূপে আমাদের মত শিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে থাকিয়া, যজ্ঞে দীক্ষা লাভ করিবে? বল প্রয়োগ দ্বারা তাঁহারা সেই কবষকে সরস্বতী তীর হইতে বহিস্কৃত করিয়া দূরে কোন জল-রহিত স্থানে তাড়াইয়া দিলেন। তাহাদের ইচ্ছা যে "এই জল-রহিত স্থানে পিপাসায় কবষের মৃত্যু হউক ; সরস্বতী নদীর পবিত্র জল এই পাপিষ্ঠ যেন পান করিতে না পায়।" সেই কবষ ও সরস্বতী হইতে দূরে, সেই জল-বর্জ্জিত দেশে তাড়িত হইয়া, পিপাসায় অধীর হইয়া পড়িলেন। সেই পিপাসা নিবারণ মানসে, কবষ এই সূক্ত, যাহার দেবতা 'অপোনপাৎ' (জলের নাতি)—"হে দীপ্তিশীল সোম, স্তোত্রের সহিত গমন কর" ইত্যাদি উচ্চারণ করিলেন। এই সূক্ত পাঠ করিয়া, তিনি জল-দেবতাদিগের প্রিয় স্থান লাভ করিলেন, এবং জল-দেবতাগণও দয়াযুক্ত হইয়া বিশেষরূপে কবষের নিকট উপস্থিত হইলেন। সরস্বতী নদী সবেগে সকলদিকে কবষেরই অনুগমন করিলেন। তাহার পর ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিলেন :—"দেবগণ ও এই কবষকে জানেন, অতএব

ইহাকে আমাদের নিকটে আহ্বান করি"; এইরূপ বিচার করিয়া, তাঁহারা কবষকে ডাকিলেন"।

৮। কেরলরাজ রাজ-শেখর।

শঙ্করের প্রার্থনামত পূর্ণা নদীর স্থান পরিবর্ত্তনের কথা সত্যই হউক, আর কবি কল্পনাই হউক, আমরা মাধবাচার্য্য যাহা বলিতেছেন তাহারই উল্লেখ করিতেছি। মাধবাচার্য্য বলিতেছেনঃ—পরদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসীরা তত্রস্থ বিষ্ণু-মন্দিরের অনতিদূরে একটী নূতন নদী প্রবাহিত দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। এই অলৌকিক ব্যাপারের কথা কেরলরাজ রাজশেখরের কর্ণগোচর হইলে পর, তিনিও শঙ্করের দর্শন-লাভের অভিলাষী হইয়া, তাঁহার প্রধান অমাত্যকে শঙ্করের নিকট প্রেরণ করিলেন, সঙ্গে উপহার স্বরূপ একটী হস্তীও প্রেরণ করিলেন। রাজামাত্য হস্তীসহ শঙ্করের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেনঃ—"এ দাস কেরল-রাজের আদেশে এবং স্বকীয় পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যফলে আপনার শ্রীচরণ দর্শন, এবং আপনার পাদধূলি গ্রহণ করিতে আসিয়াছে। কৃপা করিয়া কুল-প্রদীপ কেরল-রাজকে কৃতার্থ করুন। আপনি তাঁহার রাজ-সভায় উপস্থিত হইয়া, তাহার শোভা বর্দ্ধন করুন। এই হস্তীটি সিন্ধু দেশীয়, এবং সর্ব্বপ্রকার দোষ-শূন্য। মহারাজা আপনার উপহারার্থ এই হস্তিটি প্রেরণ করিয়াছেন, পাদস্পর্শে ইহাকে পবিত্র করুন। পদধূলি দানে রাজার পবিত্র ভবন অধিকতর পবিত্র করুন।" এইরূপ বলিয়া অমাত্য আপনার দৌত্যকার্য্য সমাপন করিলে পর, শঙ্কর বলিতে লাগিলেনঃ—হে দাতৃবর, ভিক্ষাই যাহাদিগের জীবনোপায়, মৃগচর্ম্মই যাহাদিগের পরিধেয়, সন্ধ্যাবন্দনা, অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন, এবং গুরুশুশ্রূষা, যাহাদিগের নিত্যব্রত, তাহারা হস্তী লইয়া কি

করিবে? হস্ত্যশ্বাদি সুখভোগে আমাদের কোন অধিকার নাই। হে অমাত্য, যথা হইতে আসিয়াছ তথায় প্রতিগমন কর। তোমার প্রভুকে আমার এই উত্তর বিশেষ করিয়া জ্ঞাপন করিও, যে "ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় যেন প্রত্যেকে স্ব স্ব ধর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ঋণমুক্ত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাই রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। তাহারা যাহাতে স্ব স্ব ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট না হয়, সে চেষ্টা না করিয়া, প্রলোভন দ্বারা তাহাদিগকে বিপথে আকর্ষণ করা, কদাপি রাজার কর্ত্তব্য হয় না।" রাজামাত্য শঙ্করের এইরূপ উত্তর লইয়া বিষণ্ণ-মনে প্রভুর সমীপে প্রতিগমন করিলেন। কেরলরাজ রাজশেখর অতি উদারচেতা লোক ছিলেন। তিনি শঙ্করের ঈদৃশ ব্যবহারে অধিকতর মুগ্ধ হইয়া স্বয়ংই তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, কুমার শঙ্করের পরিধান কৃষ্ণাজিন, কটিদেশে মুঞ্জমেখলা, গলদেশে জ্যোৎস্নার ন্যায় শুভ্র উজ্জ্বল উপবীত; তাঁহার চারিদিকে বসিয়া ব্রাহ্মণকুমারেরা শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন। রাজা ভক্তির সহিত বারম্বার শঙ্করকে প্রণাম করিলেন, এবং উপহার স্বরূপ তাঁহাকে দশ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন। শঙ্করও সাদরে রাজার কুশল প্রশ্ন করিলেন। নানাপ্রকার সদালাপের পর, রাজা স্বরচিত তিনটী সুন্দর নাটক শঙ্করকে শুনাইলেন। তৎশ্রবণে শঙ্কর সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া রাজাকে বলিলেন "বর গ্রহণ কর।"। রাজাও করযোড়ে আত্মতুল্য সত্যপর একটী পুত্র প্রার্থনা করিলেন। শঙ্কর বলিতে লাগিলেন, তোমার এই সুবর্ণ মুদ্রায় আমার কোন প্রয়োজন নাই, আমাদের মধ্যে যাহারা গৃহী হইয়াছেন, তাহাদিগকে এই সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান কর। তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে, গৃহে ফিরিয়া যাও। এইরূপ বলিয়া তিনি রাজাকে একান্তে ডাকিয়া একটী বৈদিক পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ব্যবস্থা প্রদান করিলেন। রাজা সেই ব্যবস্থা লাভ করিয়া, আনন্দ মনে স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন।

সপ্তমবর্ষ বয়সেই শঙ্করের অনেক শিষ্য হইয়াছিল। মহর্ষি ঈশাও নাকি সপ্তবর্ষ বয়সেই ফিরিসি পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্র-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বালক শঙ্করও নাকি সেইরূপ শিষ্যদিগকে দর্শন শাস্ত্রে শিক্ষা দান করিতেন, এবং তাহাদের সুখ-বোধের জন্য, তিনি নিজে নির্জ্জনে বসিয়া অনেক শাস্ত্র চিন্তা করিতেন। অনেক শ্রুতিবিৎ পণ্ডিতও এই সময়েই শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন বলিয়া উল্লেখ আছে। মাধবাচার্য্য বলিতেছেন যে সেই তরুণ বয়স্ক বাল-পণ্ডিতের নিকট দর্শন শাস্ত্রে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এক একজন ফণিপতির ন্যায় অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন।

মাতৃসেবাই এই সময়ে শঙ্করের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। জননীর একমাত্র সম্বল তিনি, তাঁহারও একমাত্র সম্বল জননী, তাঁহারা পরস্পরের অদর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ বোধ করিতেন। মাধবাচার্য্য বলেন, সপ্তম বর্ষ বয়সেই বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁহাকে গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রবেশ করাইবার মানসে, তাঁহার উপযুক্ত সদ্বংশীয় পাত্রীর অনুসন্ধান করিতেছিলেন. কিন্তু শঙ্কর কিছুতেই বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। বাল্য বিবাহ বোধ হয় তখনও দেশে প্রচলিত ছিল। তথাপি সপ্তমবর্ষ বয়সে শঙ্করের বিবাহের প্রস্তাবের কথা পাঠ করিলে, অনেকেরই হয়ত বিশ্বাস হইবে না যে সত্য সত্যই এই সময়ে শঙ্কর সপ্তম-বর্ষীয় বালক ছিলেন। হয়ত, পুরাতন হস্তলিখিত পুস্তকে লিখকের ভ্রম বশতঃ সপ্তদশ বর্ষ স্থলে, সপ্তবর্ষ লিখিত হইয়া থাকিতে পারে।

৯। উপমন্যু প্রভৃতি ঋষিগণের সমাগম।

মাধবাচার্য্য বলিতেছেন যে এই সময়ে শঙ্করকে দেখিবার মানসে উপমন্যু, দধীচি, গৌতম, ত্রিতল. এবং অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পাঠক স্মরণ করিবেন, ঈশাও ভূমিষ্ঠ হইলে পর, কথিত আছে যে পূর্ব্বাঞ্চল হইতে দৈবজ্ঞ পণ্ডিতগণ

তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। সমাগত ঋষিদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া, শঙ্কর ও তদীয় জননী করযোড়ে তাঁহাদিগকে কুশাসনোপরি উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। ঋষিগণ শঙ্করের সহিত পরমার্থ-বিষয়ক নানাপ্রকার প্রসঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত করিলে পর, শঙ্কর-জননী ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ— "ভবাদৃশ মহাপুরুষদিগের সমাগমে অদ্য আমরা কৃতার্থ হইলাম। এই ঘোর কলিকালে, ভবাদৃশ মহাজনগণের চরণ দর্শন, আমার পূর্ব্বজন্মের তপস্যার বলেই লাভ করিলাম। আমার এই শিশুকুমার, অতি বাল্যকালেই সাঙ্গোপাঙ্গ সমস্ত বেদ আয়ত্ত করিয়াছে। শিশুর কি আশ্চর্য্য প্রভাব, ভবাদৃশ মহর্ষিগণও আসিয়া ইহাকে অনুগ্রহ করিলেন। যদি আমার শুনিতে কোন বাধা না থাকে, তবে আমার জানিতে বড় কৌতূহল হইতেছে, যে এ শিশু পূর্ব্ব জন্মে কি তপস্যা করিয়াছিল"? তাঁহার কথা শুনিয়া ভগবান্ অগস্ত্য উত্তর করিলেনঃ— "হে পতিব্রতে, পুত্র লাভ মানসে তোমার পতি কঠোর তপস্যা করিয়া ভগবান্ উমাপতির প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,"তুমি শতবর্ষজীবি, বহু পুত্র আকাঙ্ক্ষা কর, কিম্বা অল্পায়ু, সর্ব্বজ্ঞ, একটি মাত্র পুত্র আকাঙ্ক্ষা কর।" তোমার পতি সর্ব্বজ্ঞ একটী মাত্র পুত্র কামনা করিয়াছিলেন। ভগবান্ দেখিলেন, তিনি ভিন্ন দেবতাদিগের মধ্যেও সর্ব্বজ্ঞ কেহ নাই, অতএব তোমার পতির প্রার্থনা সিদ্ধির জন্য, উমা-পতি স্বয়ংই তোমার তনয়রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" এই কথা শুনিবা মাত্র, শঙ্কর-জননীর কৌতূহল আরও বৃদ্ধি হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "হে ঋষিবর, বলুন আমার পুত্রের আয়ু কি পরিমাণ?" "তোমার পুত্রের নিয়মিত আয়ু ষোল বৎসর মাত্র, কিন্তু প্রয়োজন বিশেষে তিনি আরও ১৬ বৎসর এ সংসারে বাস করিবেন।" অগস্ত্যকে এইরূপে ভাবি ঘটনা সকল প্রকাশ করিতে দেখিয়া, অপর ঋষিগণ তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। তাঁহারা সকলে শঙ্করকে

সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া যথা ইচ্ছা চলিয়া গেলেন। এদিকে ঋষিদিগের নিদারুণ বাক্য শ্রবণমাত্র, সন্তান-বৎসলা জননীর বক্ষে যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল। তিনি বাতাহত কদলী তরুর ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন। শঙ্কর শোকাতুরা জননীকে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন :— "হে মাতঃ! এ সংসার ক্ষণভঙ্গুর, শোকের অযোগ্য; এ শরীর বায়ু কম্পিত পতাকা অপেক্ষাও চঞ্চল। নিতান্ত মূঢ় ব্যক্তিই ইহাতে আস্থা স্থাপন করে; বার বার জন্ম ধারণ, বার বার সন্তান পালন, বার বার দার গ্রহণ, ভাবিয়া দেখ, সেই সকল পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র এখন কোথায়? কোথায় তাঁহারা, আর কোথায়ই বা আমরা। সত্য সত্যই সংসারের যোগ পান্থশালার পথিক-সমাগমের ন্যায় ক্ষণিক। এই পাপ-সঙ্কুল সংসার পথে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া কিছুমাত্র সুখ-শান্তি দেখিতেছি না। মাতঃ, আমি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া ভব-বন্ধন মোচনের জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইব।" দুঃখিনী মাতা পুত্রের তাদৃশ শ্রুতি-কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্পাকুল কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন :—

"বৎস, এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর, সংসারবাসে মনোযোগী হও, পুত্র লাভ কর, যজ্ঞানুষ্ঠান কর। পরে সময় হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। সাধুগণ এই পথই অবলম্বন করিয়া থাকেন। দুঃখিনী মায়ের তুমিই একমাত্র পুত্র। বৎস, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে এই হতভাগিনী কি করিয়া জীবন ধারণ করিবে? আমার মৃত্যু হইলে, কেই বা আমার প্রেতকৃত্য সকল অনুষ্ঠান করিবে? তুমি পণ্ডিত হইয়া কিরূপে বৃদ্ধা জননীকে ছাড়িয়া যাইবে,—ভাবিতেও কি তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় না, দয়ার উদ্রেক হয় না"?

মাতা তাঁহার সপ্তম বর্ষীয় শিশু পুত্রকে পুনঃ পুনঃ পুত্র লাভ করিতে অনুজ্ঞা করিতেছেন। শুনিলে হয়ত অনেকেরই সংশয় হইবে যে সত্য সত্যই এরূপ আলাপ সপ্তবর্ষীয় বালকের সঙ্গে সম্ভব, কিনা।

১১। শঙ্করের জীবন-সন্ধি।

গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া শঙ্কর সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। তিনি কি যথার্থই সংসার ত্যাগী হইতেছেন? মহাপুরুষেরা সাধারণ সঙ্কীর্ণ নিয়মে সংসার করিতে পারেন না। যদি তাহাই করিতেন, তবে সংসারই রসাতলে যাইত। যাঁহাদিগের উপরে সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণের ভার,—কি বুদ্ধ, কি ঈশা, কি মহম্মদ, কি শঙ্কর, কি চৈতন্য,—তাঁহারা তাঁহাদের মাতা পিতারই বল, আর স্ত্রী পুত্রেরই বল, কোন ব্যক্তি বা পরিবার-বিশেষের সম্পত্তি হইতে পারেন না। যীশু বলিয়াছিলেন "কে আমার মাতা, কে আমার ভ্রাতা? যাঁহারা আমার পিতার ইচ্ছা পালন করেন, তাঁহারাই আমার মাতা এবং ভ্রাতা।" অন্ধজগতের জ্ঞান-প্রদীপ হস্তে ধারণ করিয়া, মাতার ক্লেশ হইবে বলিয়া, শঙ্কর স্বীয় জীবনের মহাব্রত ভুলিয়া থাকিতে পারেন না। বরং ঈশা তাঁহার মাতার প্রতি কথঞ্চিৎ বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলা যায়, কিন্তু শঙ্কর তাঁহার মাতার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করেন নাই। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।" মাতৃপ্রেমে শঙ্করের হৃদয় কুসুম হইতেও কোমল, জগতের এবং কর্ত্তব্যের আহ্বানে তাঁহার হৃদয় বজ্র হইতেও কঠিন। যাঁহারা ঈদৃশ মহাজনদিগকে 'সংসারত্যাগী' বলিয়া দোষারোপ করেন, তাঁহারা অত্যন্ত স্থূলদর্শী। বরং আমাদের মত যাহারা স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া একটী সঙ্কীর্ণ গণ্ডী প্রস্তুত করিয়া, তাহাতেই জীবন নিঃশেষ করে, যাহারা সভ্যতার নামে দেহ-দেবতার পূজায় প্রাণ মন ঢালিয়া দেয়, এবং সন্তানগণকেও সে মন্ত্রেই দীক্ষিত করে,—যাহাদের স্থানান্তর বা লোকান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের কীর্ত্তি-কলাপেরও স্থানান্তর বা লোকান্তর হয়, যাহারা সংসারের অধিকাংশ লোকের কল্যাণ সম্বন্ধে উদাসীন,—তাহারাই যথার্থ সংসারত্যাগী। শঙ্করের হৃদয় সমুদ্রের ন্যায় উদার, কালের ন্যায় অসীম। তিনি দেহ-

ধারী হইয়াও অশরীরির ন্যায় দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র স্বীয় মঙ্গলব্রত সাধন করিয়াছেন। তিনি কি করিয়া সংসার-ত্যাগী হইবেন? শঙ্করের কাশীবাসকালের একটি প্রচলিত গল্প এ স্থলে উল্লেখ যোগ্য। ঘটনা সত্য হউক আর নাই হউক, তাহা দ্বারা তাঁহার হৃদয়ের প্রশস্ততা সম্বন্ধে লোকের কিরূপ ধারণা,—তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পটি এই:—একদা একজন ভদ্রলোক শঙ্করকে মধ্যাহ্নে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, শঙ্কর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াও উপস্থিত হইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন না। অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া, নিমন্ত্রণ কর্ত্তা উদ্বিগ্ন মনে আচার্য্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে একটি কুকুর গৃহে প্রবেশ করিয়া, সেই অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন করিতেছিল। ইহা দর্শন করিয়া গৃহকর্ত্তা ক্রোধভরে সেই কুকুরকে বংশখণ্ড দ্বারা তিনবার গুরুতর প্রহার করিলেন। কুকুর আহত হইয়া চিৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিল। পরদিন নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা শঙ্করের নিকটে যাইয়া, তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা না করাতে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তখন শঙ্কর আপনার বক্ষঃ-দেশে তিনটি গুরুতর লগুড়াঘাতের দাগ দেখাইয়া বলিতে লাগি-লেন:—"আমি ত তোমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে গুরুতর লগুড়াঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলে। এই দেখ, আমার বুকে এখনও সেই তিনটি আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে।"

শঙ্কর যেন তাঁহার নিজেরই সেই "অহেতুক-দয়া-সিন্ধু" হৃদয়ের বর্ণনা করিয়া তাঁহার কৃত বিবেক-চূড়ামণি গ্রন্থে বলিতেছেন:—"অয়ং স্বভাবঃ স্বত এব যৎ পরশ্রমাপনোদপ্রবণং মহাত্মনাং। সুধাংশু-রেষ স্বয়মর্ককর্কশ প্রভাভিতপ্তামবতি ক্ষিতিং কিল" ॥৪০॥ চন্দ্র যেমন সূর্য্যের প্রখর রশ্মিজাল আপন বক্ষে গ্রহণ করিয়া তাহার প্রখরতা দূর করিয়া স্নিগ্ধ শীতল জ্যোৎস্না দানে সূর্য্যের প্রখর তাপে উত্তপ্ত পৃথি-বীকে রক্ষা করে, সাধু মহাত্মাদিগের হৃদয়ও সেইরূপ সর্ব্বদা পরের দুঃখ

মোচনের জন্য ব্যগ্র। শঙ্করের হৃদয় ও সংসারের দুঃখ-ভারকে আলিঙ্গন করিয়া অদ্বৈত-ধর্ম্মের শীতল ছায়া দানে ত্রিতাপ-জ্বালায় উত্তাপিত জীবলোকের দুঃখ মোচনের জন্য ব্যগ্র হইল। তাঁহার মনোমধ্যে এক মহাসংগ্রাম উপস্থিত। একদিকে তাঁহার অগাধ মাতৃ-অনুরাগ, অপরদিকে তাঁহার জীবনের মহাব্রত। একদিকে সংসার, অপরদিকে সন্ন্যাস। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "কিছুতেই আমার হৃদয় সংসারে প্রবেশ করিতে চায় না। মাতাও কিছুতেই আমাকে ছাড়িতেছেন না; আমার প্রাণের ভিতরে যে কি আগুন জ্বলিতেছে, তিনি কিছুই বুঝিতেছেন না। মাতার অনুমতি না পাইলে, আমি সংসার ত্যাগ করিতে পারি না।"

১১। শঙ্করের সন্ন্যাস গ্রহণে, মাতার অনুমতি-লাভ।

শঙ্করের মনোমধ্যে এইরূপে মহাসংগ্রাম চলিতেছিল, এমন সময়ে তিনি একদা তাঁহার গৃহের সন্নিকটস্থ পূর্ণা নদীতে স্নানার্থ গমন করিয়াছিলেন। নদী সেই সময়ে বর্ষার জলে পরিপূর্ণ। গভীর জলে অবগাহন করিবামাত্র একটী ভীষণ কুম্ভীর তাঁহার পাদদ্বয় গ্রাস করিল। বালকের ক্রন্দন-ধ্বনি মাতার শ্রুতি গোচর হইল। এই বিপন্ন অবস্থায় বালক তাঁহার মাতাকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল "মা, এক অতি বলবান্ কুম্ভীর আমার পাদদ্বয় গ্রাস করিয়াছে। আমি চলিতে অক্ষম, কি উপায় হইবে?" সন্তানের এই আর্ত্তনাদ শুনিয়া মাতা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গৃহ হইতে নদী-তীরে আসিলেন। আসিয়া শঙ্করকে জল-মগ্ন দেখিয়া, তীরে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে সন্তানের মুখপানে চাহিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। "হায় অন্ধের যষ্ঠি স্বরূপ, আমার এই একটী মাত্র সন্তান, তাহাকেও দুরন্ত কুম্ভীর গ্রাস করিয়াছে। হা শিব, হা শিব, পূর্ব্বেই কেন আমার মরণ হইল না।" কিন্তু বিধাতারই এইরূপ বিধান। বিধাতা স্বয়ং যেন কুম্ভীররূপে শঙ্করের

ভাবি জীবনের পথ কণ্টক-মুক্ত করিয়া বেদান্ত ধর্ম্মের রক্ষার ব্যবস্থা করিতে আসিয়াছেন। বালকের অন্তরে তখন এই এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, যে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণে কৃত-সঙ্কল্প হইলে, এই বিপদ হইতে সে মুক্তি লাভ করিবে। অন্তরে এইরূপ আশ্বাস বাণী লাভ করিয়া, বালক মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "মা, তোমার অনুমতি লইয়া যদি আমি সন্ন্যাস গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হই, তবে এই ভীষণ জলচর আমাকে পরিত্যাগ করিবে। যদি অনুমতি দেও, তবে বল, আমি তাহাই করি।" সন্তানের ঈদৃশ বাক্যে মাতা অত্যন্ত বিস্মিতা হইলেন। যাহা হউক, তিনি মনে মনে ভাবিলেন, জীবিত থাকিলে, যে অবস্থায়ই হউক, সন্তানের পুনর্দর্শনের আশা আছে। মরিলে সে আশা তিরোহিত হইবে। মাতা আর কোনও রূপ ইতস্তত না করিয়া অবিলম্বে পুত্রকে সন্ন্যাস গ্রহণে অনুমতি দান করিলেন। সেই সঙ্গেই সেই কুম্ভীর ও বালককে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বালক তীরে উপস্থিত হইয়া শোকা-কুলা জননীকে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিল। "হে মাত, আদেশ কর, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া তোমার কোন্ প্রিয় কার্য্য আমাকে সাধন করিতে হইবে। আমি নিশ্চয় তাহা করিব। তোমার গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও ভাবনা নাই। জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে যাহারা আমার পৈতৃক বিত্তাদি গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাই তোমার গ্রাসাচ্ছা-দনের ব্যবস্থা করিবেন। রোগাদিতেও জ্ঞাতিরাই তোমার শুশ্রূষা করিবেন। তোমার মৃত্যু হইলে, তাঁহারাই যথাবিধি সংস্কার করি-বেন। আমার পৈত্রিক বিত্ত লাভের আশায়ই হউক, অথবা লোক-লজ্জা ভয়েই হউক, তাঁহারা ইহার অন্যথা করিবেন না। মাত, তোমার কোনও ভয় নাই।" মাতা উত্তর করিলেন:—"বৎস, তোমার সন্ন্যাস-গ্রহণ অনুমোদন করিয়া, আমি তোমাকে নক্র-মুখ হইতে রক্ষা করিলাম। আমার মৃত্যু হইলে, আসিয়া বিধিমত

আমার দেহ-সংস্কার করিও।” শঙ্কর বলিতে লাগিল “হে মাত, দিনে হউক, কিম্বা রাত্রিতে হউক, তুমি যখনই আমাকে স্মরণ করিবে, আমি সুস্থই থাকি, অথবা অসুস্থই থাকি, আমার অপর সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, আমি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইব। তোমার মৃত্যু হইলে, আমি তোমার দেহ-সংস্কার করিব। আমাকে বিশ্বাস কর। মা তোমার চরণে আমার এই একটী অনুরোধ,—তুমি কদাপি ভাবিও না যে আমি তোমাকে যষ্ঠি-হারা অথবা অনাথা ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছি। গৃহে থাকিলে আমার দ্বারা তোমার যে ফল-লাভ হইত, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, তাহার শতগুণ ফল তোমার লাভ হইবে।” এইরূপে মাতাকে আশ্বস্ত করিয়া শঙ্কর তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ সকলকে ডাকিয়া আনিলেন। করযোড়ে তাঁহা-দিগকে বলিতে লাগিলেন, “আমি সন্ন্যাস গ্রহণ মানসে অতি দূরদেশে চলিয়া যাইতেছি। আমার এই দুঃখিনী বিধবা জননীর ভার আপনা-দিগের উপরেই ন্যস্ত রহিল।” পুত্রের কথা শুনিয়া জননী রোদন করিতে লাগিলেন। পুত্রও শোকাকুল অন্তরে, মাতৃ আজ্ঞা লাভ করিয়া, মাতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার জ্ঞাতিবর্গের হস্তে অর্পণ করিয়া, সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য দেশান্তরে যাত্রা করিল।

এই সময়ের ও একটী উপকথার উল্লেখ পাওয়া যায়। শঙ্কর দ্বারা আনিত পূর্ণা নদীর তীরে কৃষ্ণের একটী মন্দির ছিল। নদীর তরঙ্গাঘাতে সেই মন্দির ভগ্নপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। তদ্দর্শনে ভীত হইয়া, কৃষ্ণ শঙ্করের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। শঙ্করও সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য, বাহুদ্বয় দ্বারা সেই কৃষ্ণের মন্দির উত্তোলন করিয়া, নিকটবর্ত্তি অপর কোনও নিরাপদ স্থানে তাহা স্থাপন করিলেন। শঙ্কর শিবের অবতার বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণ বৈষ্ণবদিগের দেবতা। শৈবদিগের বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-কলুষিত কল্পনা হইতেও এইরূপ উপকথার সৃষ্টি হইতে পারে।

১২। নর্ম্মদা তীরস্থ গোবিন্দনাথের আশ্রমে শঙ্করের প্রবেশ।

মাতার অনুমতি গ্রহণান্তে, পরব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করিয়া শঙ্কর সংসার-মমতাশূন্য হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। শান্তি, দান্তি, উপরতি, ক্ষান্তি, সমাধি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণ সকল তাহার হৃদয়ের ভূষণ হইল। তাহার হস্তে দণ্ড, পরিধান গৈরিক বসন। যাত্রা করিয়া পথে অসংখ্য বন-পর্ব্বত, অসংখ্য নদ-নদী, এবং অসংখ্য গ্রাম-নগর তাহার নয়ন গোচর হইল। সেই নির্জ্জন পথিমধ্যে তাঁহার হৃদিস্থিত পরমাত্মাই তাঁহার একমাত্র সহচর। পরব্রহ্মই যেন তাঁহার ঐন্দ্রজালিক মায়াশক্তির প্রভাবে, সেই সকল দৃশ্যমান্ বনরাজিরূপে শঙ্করের চতুর্দ্দিকে বিরাজমান। বেদরূপিনী বৃদ্ধা গোমাতাকে পাষণ্ডগণকর্ত্তৃক বিবিধ কুপথে আকৃষ্যমানা দেখিয়া, তাঁহাকে প্রকৃত অদ্বৈত পথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য যেন তিনি হস্তে দণ্ড ধারণ করিয়াছেন। বহু দূর পর্য্যটনান্তে তিনি পরিশেষে নর্ম্মদানদীতীরে উপস্থিত হইলেন। কেরল বা মালাবারস্থ কালটি গ্রাম হইতে মধ্যদেশস্থ নর্ম্মদা নদী দুইশত ক্রোশের কম হইবে না। পদব্রজে শঙ্করকে তথায় যাইতে অন্ততঃ পনর কুড়ি দিন লাগিয়া থাকিবে। সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ প্রাক্‌কালে শঙ্কর গোবিন্দনাথের নামে পরিচিত নর্ম্মদা তীরবর্ত্তি এক মহাবনে উপস্থিত হইলেন। সেই বনমধ্যে গোবিন্দনাথ নামক মুনিবরের আশ্রম। গোবিন্দনাথ বিখ্যাত ঋষি গৌড়পাদের প্রধান শিষ্য। গৌড়পাদ একদিকে যেমন সাংখ্যকারিকার রচয়িতা, অপরদিকে তিনি মাণ্ডূক্যোপনিষদের ও কারিকাকার। সাংখ্য দর্শনোক্ত ‘প্রকৃতি’ বা ‘প্রধানের’ “ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা” বলিয়া সংজ্ঞা করিয়া তিনি সেই প্রধানকে বেদান্ত-দর্শনোক্ত মায়ার সহিত এক করিয়াছেন। এই সকল কারণে তাঁহাকে সাংখ্য এবং বেদান্তের মিলন-ভূমি বলা যাইতে পারে। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে গোবিন্দনাথের ও স্থান ঐরূপই নির্দ্দিষ্ট করা যায়। পূর্ব্বে কখন ও এই গোবিন্দ-

নাথের নাম শঙ্করের শ্রুতি-গোচর হইয়াছিল কি না ঠিক্ করিয়া বলা কঠিন। শঙ্কর সূর্য্যাস্তের সময়ে সেই বিস্তীর্ণ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া, নদী-তীরবর্ত্তী কোন এক বৃক্ষতলে বসিয়া সুশীতল বায়ু সেবন করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিলেন। পরে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইলেন, স্থানে স্থানে বৃক্ষ শাখায় উজ্জ্বল মৃগচর্ম্ম, এবং কৌপীন বসন সকল শোভা পাইতেছে। তিনি বুঝিলেন যে তথায় মুনিদিগের বাসস্থান। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে এই আশ্রমেই তিনি একবার সন্ন্যাস-ধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করিবেন। আশ্রমবাসীদিগের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, এই স্থানে পরমহংস গোবিন্দনাথের আশ্রম। তিনি অতি ভক্তির সহিত গোবিন্দনাথের গুহাসমীপে উপস্থিত হইয়া ভক্তিভরে তিনবার সেই গুহা প্রদক্ষিণ করিলেন। অবশেষে শিষ্যবর্গের সমক্ষে গুহাদ্বারে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রীতমনে এইরূপে পরমহংস গোবিন্দনাথের স্তব করিতে লাগিলেন ঃ—"ফণিপতি শেষ—যিনি বিষ্ণুর শয্যা, যিনি শিবের পায়ের নূপুর, যিনি স্বীয় মস্তকে সসাগরা পৃথিবী ধারণ করিয়াছেন, আপনি সেই ফণিপতিরই অবতার। আমি আপনার চরণাশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। আপনার সহস্র মুখ দর্শনে আপনার শিষ্যগণ ও পাছে ভয় পায়, সেই জন্যই আপনি সহস্র মুখ পরিত্যাগ করিয়া, এক মুখ-বিশিষ্ট শান্ত-স্বভাব পতঞ্জলিরূপে অবতীর্ণ হইয়া শিষ্যবর্গের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পাতাল প্রবেশ পূর্ব্বক ফণিপতি শেষ সমীপে শিক্ষা লাভ করিয়া জগতের হিতের জন্য, আপনি ভূতলে যোগ-শাস্ত্র এবং ব্যাকরণ শাস্ত্র (পাণিনি) প্রকাশ করিয়াছেন।*

---

*। ফণিপতি শেষ বোধ হয় কোন প্রাচীন ঋষি হইবেন, যিনি প্রথমে কুম্ভকাদির প্রণালী আবিষ্কার করিয়া ছিলেন। হয়ত কুম্ভক দ্বারা শরীর-ক্রিয়া রোধ করিয়া তিনি সর্পের ন্যায় অধিকাংশ সময় গুহামধ্যে অবস্থান করিতেন।

অধুনা আপনি পরম্পরাগত সর্ব্বগুণশালী ব্যাসপুত্র শুকদেবের শিষ্য গৌড়পাদ ঋষি হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, গোবিন্দনাথ নামে ভূতলে পরিচিত হইয়াছেন। আপনার মহিমা অপার। ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ মানসে, আমি একান্ত মনে আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। ব্রহ্মজ্ঞান দান করিয়া, এ দাসকে কৃতার্থ করুণ।

১৩। গোবিন্দনাথের নিকটে শঙ্করের সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষা।

সৌভাগ্য ক্রমে শঙ্কর যখন গোবিন্দনাথের স্তব করিতেছিলেন, তখন গোবিন্দনাথের সমাধি ভঙ্গ হইয়াছে। গুহাভ্যন্তর হইতে সেই মুণিবর জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি"? শঙ্কর তখন পবিত্র অদ্বৈত-ভাবপূর্ণ হস্তামলক-নামীয় বিখ্যাত কবিতার অনুরূপ বাক্যে উত্তর করিলেন—"স্বামিন্, আমি পার্থিব, জলীয়, তৈজস, বায়বীয়(১) অথবা আকাশাত্মক(২) কোনও পদার্থ নই। আমি এ সকলের কোনও(৩) গুণ বিশেষ ও নাই। আমি কোনও ইন্দ্রিয়(৪) বিশেষ অথবা ইন্দ্রিয় সকলের সমষ্টি ও নই। এই সকলের অতীত

সর্পের জীবন-তত্ত্ব পর্য্যালোচনা দ্বারা কুম্ভকের প্রণালী প্রথম আবিষ্কার হইয়া থাকিতে পারে। শেষ নামক কোন মহাসর্প মৌখিক উপদেশ দ্বারা পতঞ্জলিকে কুম্ভকাদি বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, এরূপ কথা কবি-কল্পনা ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। যোগ-সূত্রের প্রণেতা পতঞ্জলি স্বয়ংই সর্পাদির জীবন তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া কুম্ভকাদির প্রণালী আবিষ্কার করিয়া থাকিতে পারেন।

কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-বিহীন, কেবল, নির্লিপ্ত-শিবস্বরূপ পরমাত্মাই আমি"*। শঙ্করের এই অদ্বৈত ভাবপূর্ণ উত্তর শ্রবণ করিয়া, মুণিবর গোবিন্দ স্বামী যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন। তিনি বলিলেন "হে শঙ্কর, আমি সমাধি-চক্ষে জানিতেছি, তুমি বস্তুতই শঙ্কর স্বয়ং ভূতলে অবতীর্ণ।" এইরূপ বলিয়া তিনি গুহাদ্বারে আসিলেন। শঙ্কর তাঁহার চরণ যুগল দেখিতে পাইয়া, নিকটে অগ্রসর হইলেন, এবং তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া অপর শিষ্য-বর্গের নিকটে শিষ্টাচারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন তাঁহার সেবা লাভ করিয়া গোবিন্দনাথ সাতিশয় প্রসন্ন হইলেন। "সঃ গুরুমে বাভিগচ্ছেৎ" ইত্যাদি শ্রুতি বচণোক্ত সম্প্রদায়-বিধি পরিপালন জন্য, শঙ্কর গুরুর নিকটে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রয়াসী হইলেন। তাঁহার গুরুভক্তি দর্শনে গোবিন্দনাথ সাতিশয় প্রীত হইয়া, চারি বেদোক্ত চারিটি মহাবাক্য দ্বারা—ঋগ্বেদীয় 'প্রজ্ঞাণং ব্রহ্ম'— যজুর্ব্বেদীয় 'অহং ব্রহ্মাস্মীতি'—সামবেদীয় 'তত্ত্বমসি'—অথর্ব্ববেদীয় 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' —জীব এবং ব্রহ্মের একত্ব উপদেশ করিলেন। গুরূপদেশে ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের অদ্বৈত-ব্রহ্ম বিষয়ক তাৎপর্য্য সহজেই শঙ্করের হৃদয়ঙ্গম হইল। পরাশরের পুত্র এবং শিষ্য ব্যাস,

---

* টীকাকার বলিতেছেন :—(১) এতদ্দ্বারা চার্ব্বাক মত প্রত্যাখ্যান করিতেছেন।

(২) এতদ্দ্বারা শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধমত প্রত্যাখ্যান করিতেছেন।

(৩) পাঞ্চভৌতিক ক্রিয়া-শক্তি-প্রধান প্রাণ, এবং পাঞ্চভৌতিক জ্ঞান-শক্তি-প্রধান মনের ও আত্মত্ব প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। মনের নিরাস দ্বারা ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমত ও প্রত্যাখ্যান করিতেছেন।

(৪) গন্ধরসাদি পাঞ্চভৌতিক গুণের নিরাস দ্বারা পঞ্চ তন্মাত্রের ও আত্মবাদ প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। (এস্থলে মণ্ডনের নিকটে শঙ্কর নিজেই 'তত্ত্বমসির' যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা দ্রষ্টব্য)।

ব্যাসের পুত্র এবং শিষ্য বিখ্যাত শুকমুনি, শুকমুনির শিষ্য গৌড়পাদ, গৌড়পাদের শিষ্য মুনিবর গোবিন্দনাথ, গোবিন্দনাথের শিষ্য শ্রীশঙ্কর, এইরূপে শঙ্কর পরম্পরা-প্রাপ্ত সন্ন্যাস-ধর্ম্মে বিধিমত দীক্ষা লাভ করিলেন। চিত্ত-শুদ্ধি সম্পাদন মানসে শঙ্কর ভক্তি এবং বিনয়ের সহিত কিছুদিন গুরুর সেবা করিলেন। গুরুদেব ও তাঁহার সেবা-লাভে প্রীত হইয়া, উপনিষদ্ বাক্যে তাঁহার নিকটে অদ্বৈত ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ করিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি গোবিন্দ-নাথের নিকটে যতির আচার, এবং নানাবিধ শাস্ত্র বিষয়েও উপদেশ গ্রহণ করিলেন। ক্রমে সাধনা দ্বারা নির্ম্মল হইলে পর, তাঁহার চিত্ত ধ্রুব-লোকের ন্যায় শোভা পাইল। পাটল বসন পরিধান করিয়া শঙ্কর দিবাবসান সময়ের রক্তবর্ণ মেঘজাল আবৃত হিমগিরি-শৃঙ্গের শোভা ধারণ করিলেন। শিব গজাসুরকে বধ করিয়া, তাহার রুধিরাক্ত চর্ম্ম অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। শঙ্কর ও অবিদ্যারূপী মহাগজ নিহত করিয়া রুধিরাক্ত চর্ম্মের পরিবর্ত্তে, অরুণ বর্ণ শাটি পরিধান করিয়াছেন। শিবের ন্যায় তিনি ভূত-প্রেতের সহচর নহেন, অথবা বৃষারোহণে বিহার করেন না, অঙ্গে ভস্ম লেপন করেন না, অথবা সর্প ধারণ করেন না। কিন্তু শিবের ন্যায় শঙ্করও ত্রিপুরারি, কারণ তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞান-দৃষ্টি দ্বারা অবিদ্যা কল্পিত স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ রূপ ত্রিপুর দহন করিয়াছেন। পরমহংসগণ তাঁহার সহচর, শ্রুতি তাহার ক্রীড়াভূমি। "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি"। শঙ্করও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া নির্দ্বন্দ্ব তুরীয় ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া নিজের মহিমাতেই বিরাজ করিতেছেন ("স্বে মহিম্নি")। ব্রাহ্মণাদির সৌভাগ্যের নিদানভূত বর্ণ-ধর্ম্ম তিনি অনুসরণ করেন না। ঐহিক বা পারত্রিক কোন ফলভোগে তাঁহার আসক্তি নাই। অহংকারাদি রিপুগণের নিবাস-ভূমি, এই দেহ-রথে তিনি মমতা শূন্য। বিনা সাহায্যে, অদ্বৈত-জ্ঞান-প্রভাবে তিনি

পুর্য্যষ্টক* জয়ে নিযুক্ত। সংসারের দুঃসহ দুঃখ এবং পাপরাশি তিনি দূর হইতে দর্শন করিয়াই পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পরমহংস পদ লাভের প্রয়াসী। নবদ্বার রোধ করিয়া সমাধি অভ্যাস দ্বারা তিনি ক্রমে পরমহংসত্ব† পদ প্রাপ্ত হইলেন, এবং পরমহংসত্ব লাভ করিয়া সংসার-বন্ধন মোচনের মানসে, তন্ময় ভাবে, সেই অন্তররাজ্যের অন্ধকার দূরীকরণে হংস বা সূর্য্যস্বরূপ পরমাত্মার অর্চ্চনায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। "হংসভাবমধিগত্য সুধীন্দ্রে, তং সমর্চ্চতি চ সংসৃতিমুক্ত্যৈ।"

পাঠক দেখিবেন অদ্বৈত মতের সহিত ব্রহ্মোপাসনার কোনও বিরোধ নাই। ব্রহ্মোপাসনাই শঙ্করের অদ্বৈত সাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল।

---

* প্রাণপঞ্চক, কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চক, জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক, অন্তঃকরণ চতুষ্টয়, অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম, বাসনা।

† পরমহংস শব্দে, কেহ বলেন, হংসকুল যেমন—বর্ষাকালের ঝড় বৃষ্টি ভয়ে এদেশ পরিত্যাগ করিয়া অতিদূরস্থ মানস-সরোবরে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, সেইরূপে যাঁহারা সংসার ভয়ে ভীত হইয়া হৃদয়-সরোবরে প্রবেশ করিয়া পরমাত্মাকে আশ্রয় করেন, এবং হংসের জলকেলির ন্যায় পরমাত্মাতেই ক্রীড়া করেন, তাঁহারাই পরমহংস। কেহ বলেন, একত্র মিশ্রিত নীর এবং ক্ষীর (জল এবং দুধ) মধ্যে হংস যেমন নীর হইতে পৃথক করিয়া ক্ষীর সম্ভোগ করিতে সক্ষম, যাঁহারা এই ব্রহ্মময় সংসারে বিষয়রূপ নীর হইতে ব্রহ্মরূপ ক্ষীর পৃথক্ করিয়া সম্ভোগ করিতে সক্ষম তাঁহারাই পরমহংস। অপর সকলে হেয় কাক। কেহ বলেন হংস সূর্য্যের নামান্তর। যাঁহাদের উপদেশ এবং সহবাস, সূর্য্যালোকের ন্যায় মনের তিমির নষ্ট করে, এবং অন্তর-দৃষ্টি পরিস্কার করিয়া পরমতত্ত্ব প্রকাশ করে, তাঁহারাই পরমহংস। আবার কেহ বলেন যেমন 'রাম রাম' শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলে 'মরা মরা' শুনায়, সেইরূপ 'সোহং' রূপ অদ্বৈত মন্ত্র পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলে 'হংস হংস'ই শুনায়। অদ্বৈত মন্ত্রে যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহারা পরমহংস। 'হংস' পরমাত্মারও একটী নামান্তর।

১৪। শঙ্করের সমাধি।

এই সময়েই বর্ষার সমাগম হইল। মেঘের প্রাদুর্ভাবে যেন আকাশ মধ্যে বিষয় সুখের চঞ্চলত্বের ছবি অঙ্কিত হইল। মেঘরাজি চতুর্দ্দিকে বারিরাশি বহন করিতে লাগিল। একদিন হঠাৎ প্রগাঢ় মেঘমালায় সূর্য্যের মুখ আচ্ছন্ন হইল। নিবিড় অন্ধকারে দিক্‌মণ্ডল সমাবৃত হইল। বিদ্যুৎমালা, সংসারাসক্ত হৃদয়ে ক্ষণিক জ্ঞানোদ্রেকের ন্যায়, তাহাদের ক্ষণপ্রভা বিস্তার করিতে লাগিল। প্রবল বেগে ঝড় বহিতে লাগিল। বোধ হইল যেন দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মবাদিদিগের নিকটে যজ্ঞভাগ লাভের আশায় বঞ্চিত হইয়া, ক্রোধে অধীর হইয়া স্বয়ং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। অগ্নিলোচন, অন্ধকার-মূর্ত্তি দৈত্যের বেশে, মেঘ সকল যতিগণের ধ্যান-যজ্ঞ নষ্ট করিবার মানসে গভীর গর্জ্জন করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে মূষলধারে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। অপরদিকে শঙ্করও যেন ইন্দ্র এবং তাঁহার এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ-সজ্জাকে উপেক্ষা করিয়া, ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া, পরমাত্মাতে চিত্ত সমাহিত করিতে বসিলেন। ইন্দ্র-প্রবর্ত্তিত কোনও রূপ বিক্ষেপই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মসূত্রের মধুর উপদেশে তাঁহার চিরাভ্যস্ত আত্মাভিমান উন্মূলিত হইয়াছে। "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদ ন্তরতরং যদ যমাত্মা।" সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম, সেই পরমাত্মাতে তিনি একাগ্রমনে ডুবিতে লাগিলেন। সেই স্বপ্রকাশ আনন্দ-ঘন পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, তিনি আপনার মধ্যে যেন আপনি বিলীন হইয়া গেলেন। না রহিল রবিচন্দ্রতারা, না রহিল বিদ্যুৎ অথবা অগ্নি, না রহিল দ্যাবাপৃথিবী, না রহিল কাল। না রহিল জীব, না রহিল পরম, না রহিল উপাস্য, না রহিল উপাসক। সেই চিদাকাশে জীব পরমাত্মাতে মিলাইয়া গেল, এক সন্মন, চিন্মন, আনন্দঘন

ভিন্ন আর কিছুই রহিল না। "শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ"—শরস্থানীয় জীব, তাহার লক্ষ্য স্থানীয় ব্রহ্মে লীন হইয়াছে। সেই হৃদয় উন্মাদ-কারী বিমল আনন্দের উপমা ত্রিসংসারে মিলে না। এই অবস্থারই বর্ণনা করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন "তদ্যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং।" সেই বর্ণনার অনুকরণ করিয়া মাধবাচার্য্যও বলিতেছেন, দম্পতিযুগল যেমন দীর্ঘকালের বিচ্ছেদের পর পুনরায় মিলিত হইলে, অভিমান-শূন্য হইয়া পরস্পরের মধ্যে আত্মহারা হইয়া যায়, শঙ্করও সেইরূপ দীর্ঘকালের বিচ্ছেদের পর পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, তাঁহারই মধ্যে আত্মহারা হইয়াছেন। ইহারই নাম পতঞ্জলি কথিত 'অসম্প্রজ্ঞাত' বা 'নির্ব্বীজ' বা 'নির্ব্বিকল্পক' সমাধি। শ্রীশঙ্করের এই 'অসম্প্রজ্ঞাত' সমাধির সহিত শ্রীচৈতন্যের 'মধুর প্রেমের' কি পার্থক্য রহিল? জ্ঞান মার্গের সহিত ভক্তি মার্গের, অথবা দ্বৈতবাদের সহিত অদ্বৈতবাদের বিরোধ কোথায় রহিল? শঙ্কর বিশুদ্ধ ব্রহ্মানন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন। মায়া এবং মায়া-কার্য্য—এই জগৎ—কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কি হেয়, কি উপাদেয়, এই বিচার তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বীয় মহিমাতেই বিরাজমান—সেই পরম গুহ্য, সত্য, নিত্য, মঙ্গল-স্বরূপ পরব্রহ্মে তিনি আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

১৫। শঙ্করদ্বারা জলপ্লাবনে পীড়িত লোকের দুঃখ নিবারণ।

এই সময়ে বহিরাকাশে তখন প্রবল ঝড়। প্রাণীগণের গতিবিধি রোধ হইয়াছে। পিপাসাতুর চাতকদল বহু কাল পরে জল পাইয়া আনন্দিত হইয়াছে। অবিরাম ভাবে পাঁচ দিন ধরিয়া বৃষ্টিপাতে নদীর জল স্ফীত হইয়াছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে এত দীর্ঘকালব্যাপী বৃষ্টিপাতে স্থানে স্থানে লোকের কিরূপ দুর্গতি হয়, ভুক্তভোগী ব্যক্তি সহজেই অনুমান করিতে পারে। শুষ্ক-প্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী

সকল পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত প্রভূত বারি ধারা লাভ করিয়া, স্ফীত হইয়া তীর অতিক্রম করিয়া নিকটস্থ লোকের ঘর বাড়ী সমুদয় প্লাবিত করিয়া ফেলে। চট্টগ্রামে একবার রাত্রিকালে আকস্মিক জল-প্লাবনে আমরা এইরূপে বিপন্ন হইয়াছিলাম। হঠাৎ রাত্রিতে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া দেখিতে পাইলাম, শয়ন গৃহের ভিটির উপর দিয়া জলের তরঙ্গ চলিতেছে। তীরবর্ত্তি পর্ব্বত সকলের বারিরাশি লাভ করিয়া নর্ম্মদার জল স্ফীত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল প্লাবিত এবং বৃক্ষরাজি উন্মূলিত করিয়া চলিয়াছে। সেই তরঙ্গের তুমুল শব্দ সমুদ্র-গর্জ্জনের অনুকরণ করিতেছে। এমন সময়ে প্লাবন-পীড়িত গ্রামবাসীদিগের আর্ত্তনাদ সহসা গগন-মেদিনী ভেদ করিয়া সমুত্থিত হইল। সেই হৃদয়-বিদারক ধ্বনিতে শঙ্করের কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইল। ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগে নিমগ্ন থাকিয়া ও তিনি জীবের দুঃখে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। সেই শব্দে শঙ্করের সমাধি ভঙ্গ হইল। চক্ষু মেলিয়া তিনি গুরুর প্রতি দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন গুরু তখনও সমাধিতে নিশ্চল ভাবে অবস্থিত। তিনি গুরুর সমাধি ভঙ্গ না করিয়া, অবিলম্বে প্লাবন-পীড়িত লোকের দুঃখ নিবারণের উপায় করিলেন। তিনি ঠিক্ কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ দেখা যায় না। কথিত আছে যে শঙ্কর গুরুমন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক অগস্ত্যের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া, স্বীয় হস্ত কুম্ভাকৃতি করিয়া, প্রবাহমুখে স্থাপন করিলেন, এবং অগস্ত্যের সমুদ্র-শোষণের ন্যায়, নর্ম্মদার প্লাবন-বারি সমস্ত তাঁহার সেই গণ্ডূষ মধ্যে লুক্কায়িত হইল। অর্থবাদ বা বিধি-শেষ রূপে উপকথার ব্যবহার আমাদের শাস্ত্রানুমোদিত। মহাপুরুষ-বিশেষের কিম্বা বিদ্যাবিশেষের স্তুতি বা প্রশংসার উদ্দেশে কল্পিত লৌকিক বা অলৌকিক উপকথার নাম 'অর্থবাদ'। কোন বিধিবিশেষের স্তুত্যর্থক এইরূপ উপকথাকে মীমাংসকেরা 'বিধি-শেষ' বলিয়া থাকেন। লোকের চিত্ত আকর্ষণ

করা মাত্র এই সকল উপকথার উদ্দেশ্য। এইরূপ উপকথাতে বিশ্বাস স্থাপন করাই ভ্রম। শাস্ত্রের মর্ম্ম যাহারা না জানেন, তাঁহারাই এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। পার্ব্বত্য জল-প্রবাহ, নির্গমের পথ পাইলেই অতি সত্বর চলিয়া যায়। কোনও ক্ষুদ্র রুদ্ধ পয়ঃপ্রণালীর মুখ একটু খুলিয়া দিলেই, সেই প্লাবন বারি স্বীয় প্রবাহ-বেগে সেই নির্গম-পথ আরও প্রশস্ত করিয়া নিমেষ মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। সে যাহা হউক, সমাধি শেষ হইলে পর, পরমহংস গোবিন্দনাথ লোক-মুখে স্বীয় শিষ্যবরের অলৌকিক প্রভাবের কথা শ্রবন করিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

১৬। শঙ্করের প্রতি গোবিন্দনাথের উপদেশ।

কিছু দিন পরে বর্ষা শেষ হইল। মেঘ চলিয়া গেল। আকাশ সুনির্ম্মল নীলবর্ণ ধারণ করিল। আকাশের শোভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া গোবিন্দস্বামী স্বীয় শিষ্যবরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "হে সৌম্য, শরতের আগমনে আকাশ কেমন নির্ম্মল। পরমাত্মার প্রকাশে মানবের হৃদয়াকাশও ঐরূপ। জলদমালা ওষধি সকলকে বারিদানে পরিতৃপ্ত করিয়া, যেমন যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইতেছে, যোগীগণও সেইরূপ শিষ্যবর্গকে তত্ত্বোপদেশ দানে পরিতৃপ্ত করিয়া, যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইতেছেন। মেঘমুক্ত হইয়া চন্দ্রের কি অপূর্ব্ব শুভ্র উজ্জ্বল কান্তি প্রকাশ পাইতেছে। মায়ার আবরণ নির্ম্মুক্ত হইলে, তত্ত্বজ্ঞানীর হৃদয়েও ঐরূপ শুভ্র জ্যোতি প্রকাশিত হয়। মেঘের অপগমে, নক্ষত্র মণ্ডল কি বিমল জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। মাৎসর্য্যাদি মনোবিকার দূর হইলে, মানব হৃদয়েও মৈত্রি প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল সেইরূপ জ্যোতি বিকীর্ণ করে। ঐ দেখ হংসকুল দলে দলে নর্ম্মদার স্বচ্ছ জলে, প্রস্ফুটিত পদ্মমধ্যে আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে। যেন পরমহংসগণ ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ

করিতেছেন। শরৎকাল যেন জ্যোৎস্নার ভস্ম সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া, চন্দ্ররূপ কমণ্ডলু হস্তে ধরিয়া, বন্ধুকপুস্পরূপ পাটল বসন পরিধান করিয়া, যতির বেশে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। নর্ম্মদার স্থির, নির্ম্মল জলের শোভা, যেন সাধুসঙ্গ লাভে, তোমার হৃদয়ের শোভার অনুকরণ করিতেছে। সূর্য্যরশ্মি-সংস্পর্শে প্রস্ফুটিত এই সকল পদ্মরাজি সমাধি বিকশিত যোগীগণের প্রফুল্ল মুখ-কান্তির অনুকরণ করিতেছে। সাধুগণ এই বর্ষাকাল শ্রবন মনন এবং নিদিধ্যাসনে অতিবাহিত করিয়া পদধূলি দানে জগৎ পবিত্র করিতে চলিয়াছেন। বৎস, তুমিও এই সময়ে সত্বর কাশীধামে গমন কর। তথায় যাইয়া বেদের প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া জীবের দুঃখ মোচনের উপায় কর। হে বৎস, ভগবান কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের সহিত এবিষয়ে পূর্ব্বে আমার যে আলাপ হইয়াছিল, তোমাকে বলিতেছি। পুরাকলে মহামুনি অত্রি হিমালয় পর্ব্বতে এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন। সেই যজ্ঞে ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ উপস্থিত ছিলেন। যজ্ঞ-সভায় ব্যাসদেব বেদান্তের উদার তাৎপর্য্য সকল ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। আমি তখন সেই পূজ্যপাদ পণ্ডিতাগ্রণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"ভগবন্, আপনি বেদ সকল বিভাগ করিয়াছেন। মহাভারত এবং পুরাণাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, যোগ-শাস্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন। আপনার কৃত ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া লোকেরা স্বীয় মতানুসারে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। ব্রহ্মসূত্রের এরূপ একটী ভাষ্য প্রয়োজন, যেন এরূপ ব্যাখ্যা বিভ্রাট না ঘটিতে পারে।" আমার কথা শুনিয়া সমাগত পণ্ডিতদিগের সমক্ষে ভগবান্ বলিয়াছিলেন, "বৎস, শিবের সভায় পূর্ব্বেই তোমার প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। শ্রবন কর। আমার তুল্য সর্ব্বজ্ঞ তোমার একজন শিষ্য হইবেন। তিনি স্বীয় হস্ত কুম্ভাকৃতি করিয়া তন্মধ্যে

বর্ষার সমস্ত জল সংগ্রহ করিবেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার কুতর্ক নিরস্ত করিয়া ব্রহ্মসূত্রের একটী সুখবোধ্য ভাষ্য রচনা করিবেন। তাঁহারই প্রভাবে তোমারও যশ জগতে কীর্ত্তিত হইবে'। সেই বনমধ্যে আমাকে এইরূপ বলিয়া, তিনি কৈলাসে চলিয়া গেলেন। তাঁহার কথিত লক্ষণ সকল তোমাতে বিদ্যমান। তুমি সামান্য লোক নও। তুমি তত্ত্বজ্ঞানীদিগের শ্রেষ্ঠ, পরমাত্মাস্বরূপ। সদ্‌গ্রন্থ রচনাদ্বারা জগতের উদ্ধারের জন্য সত্বর যত্নবান্ হও। সত্বর কাশীধামে গমন কর। তথায় যাইবামাত্র তুমি ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিবে"। দয়ালু গুরু গোবিন্দনাথ তদীয় ভক্ত শিষ্য শঙ্করকে এইরূপ অনুশাসন করিয়া দৃষ্টি দ্বারা পবিত্র করিয়া কাশীধামে প্রেরণ করিলেন। বর্ষাকাল নর্ম্মদার তীর-স্থিত আশ্রমে যোগ-সাধনায় এবং গুরু-সেবায় অতিবাহিত করিয়া, গুরুপাদ-পদ্মে প্রণাম পূর্ব্বক, গুরু-পাদ-পদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া, শঙ্কর সেই নর্ম্মদাতীরস্থ আশ্রম হইতে নির্গত হইয়া কাশীধামে প্রস্থান করিলেন।

১৭। শঙ্করের অদ্বৈত বিদ্যার প্রভাব।

পাঠক! শঙ্কর অদ্বৈত ব্রহ্মবিদ্যার উপদেষ্টা হইয়া জগতের সমক্ষে আসন গ্রহণ করিতে চলিলেন। শীত ঋতুর প্রারম্ভে তিনি গোবিন্দনাথের নিকটে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করেন, এবং বর্ষা শেষ পর্য্যন্ত আনুমানিক ৮।১০ মাস কাল তিনি গুরূপদেশ লাভ করেন। গোবিন্দনাথের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার সময়েই তিনি তাঁহার অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। মনে হয় যেন তাঁহার অন্তরাত্মা হইতেই—উৎস হইতে জলধারার ন্যায়—অদ্বৈত তত্ত্ব উৎসারিত হইয়াছিল। শঙ্করের সময়ে ধর্ম্মের কিরূপ অধোগতি হইয়াছিল, আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। পণ্ডিত শিরোমণি

অক্ষয়কুমার দত্ত, তাঁহার রচিত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে, দেশের ধর্ম্মের যেরূপ অধোগতির ছবি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, বৌদ্ধধর্ম্মের পতনকাল হইতেই তাহা ধারাবাহিক মতে চলিয়া আসিয়াছে। শঙ্করের সময়ে, একদিকে সংশয়বাদ, অপরদিকে অন্ধ-বিশ্বাস এবং কুসংস্কার, একদিকে বৌদ্ধ হৈতুকদিগের শূন্যবাদ এবং ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ, অপরদিকে চার্ব্বাকের দেহাত্মবাদ, একদিকে নৈয়ায়িকদিগের তটস্থ-ঈশ্বরবাদ, অপরদিকে অন্ধ সুরাপায়ী কাপালিক প্রভৃতি তান্ত্রিকদিগের নরবলি, একদিকে সাংখ্য দার্শনিকদিগের নিরীশ্বর প্রধানবাদ, অপরদিকে শৈব এবং শাক্তদিগের বামাচার ও সুরাপান, সেই সময়ে দেশের ধর্ম্ম-পথকে ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন করিয়াছিল। এই শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য যেন ভগবান্ স্বয়ং শঙ্করকে অদ্বৈত-ব্রহ্মবিদ্যার সুশাণিত ব্রহ্মাস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া, জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন।

শঙ্করের সেই অদ্বৈতমন্ত্রের অক্ষতপ্রভাবের নিদর্শন স্বরূপ আমাদের নিজের জীবনের একটী ঘটনা এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি। ইংরাজি ১৮৮৮ সনে, গ্রন্থকারের বিলাতে অবস্থান কালে, একদা গ্লষ্টার (Gloucester) নামক সহরে, একেশ্বরবাদীগণ দ্বারা আহূত হইয়া তিনি তথায় গমন করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে কোনও বন্ধুর গৃহে অনেক বিদ্বজ্জনের সমাগম হইয়াছিল। সমাগত বন্ধুদিগের পরস্পরের আলাপে তাহাদের এক এক জনের অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া গেল। দেখিয়া তিনি বিস্মিত এবং কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইলেন, কারণ তাঁহারা সকলেই যদিও ঈশ্বর-বিশ্বাসী, এবং ধর্ম্ম-পরায়ণ, তাঁহাদের অনেকেই জীবাত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের পাণ্ডিত্য-লহরীযুক্ত বাক্-চাতুর্য্য শ্রবণে মনে কিঞ্চিৎ নিরাশার সঞ্চার হইল। আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের সংশয়চ্ছেদন হইতে পারে, এমন কোনও

নূতন কথার অবতারণা করা শক্তির অতীত। সৌভাগ্য ক্রমে সেই সময়ে শঙ্করের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের চার্ব্বাক্ মত খণ্ডনের অংশ (ব্রহ্মসূত্র, অধ্যায় ৩,—পাদ ৩,—সূত্র ৫৩।৫৪।)* ইংরাজী-অনুবাদ করিয়া গ্রন্থকার সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অনুমতি লইয়া তাহা পাঠ করিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইলেন। তাঁহারা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। শঙ্করের অকাট্য যুক্তিজাল পর্য্যালোচনা করিয়া সকলে এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন "এ অতি নূতন কথা। আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে এরূপ কথা আর কোথায়ও শুনি নাই।" পরদিন তাঁহাদের মধ্যের একজন পণ্ডিত অতি শ্রদ্ধাভরে অম্লান বদনে তাহাকে বলিলেন "আমাদের অহঙ্কার ছিল যে পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আমাদের দেশই সকলের উপরে। গত রাত্রির আলাপে সে অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে।"

* ৫৩ সূত্রে চার্ব্বাকের মত ব্যাখ্যা করিতেছেন—"এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ" শরীর আর আত্মা এক, কারণ আত্মা শরীরেই আছে। ৫৪ সূত্রে এই আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। "ব্যতিরেক স্তদ্ভাবাভাবিত্বান্ন তূপলব্ধিবৎ।" আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন, কারণ শরীর থাকিলেও আত্মা থাকে না। শরীরের উপলব্ধি করিবার শক্তি নাই। এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন :—"দেহ থাকিলে আত্মা থাকে, অতএব দেহ আত্মা এক, এই যদি বলা যায়, তবে মৃত্যু হইলে, যেহেতু দেহ থাকে, কিন্তু আত্মা থাকে না, অতএব দেহ হইতে আত্মা ভিন্নও বলা যায়। রূপাদি দেহ-ধর্ম্ম অপরের উপলব্ধির বিষয় (object to some subject other than itself), কিন্তু চৈতন্য, স্মৃতি, ইত্যাদি আত্মার ধর্ম্ম অপরের উপলব্ধির বিষয় নয় (not objects of perception to some subject other than themselves)। প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব চৈতন্য নাই, এরূপ বলা যায় না—কারণ চৈতন্য প্রত্যক্ষের অবিষয়। চৈতন্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে না। আবার অগ্নি কখনও নিজেকে দহন করে না, সুশিক্ষিত নটও স্বীয় স্কন্ধে আরোহণ করে না। সেইরূপ চৈতন্যকে যদি ভৌতিক গুণ ধরা যায়, তবে অপর সকল ভৌতিক গুণের ন্যায়, ভূত এবং

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠা।

১৮। শঙ্করের কাশীগমন।

নর্ম্মদা-তীরস্থ গোবিন্দনাথের আশ্রম হইতে যাত্রা করিয়া শঙ্কর কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। সে কালের কাশী বর্ত্তমান কাশীর অনুরূপ ছিল না। বর্ত্তমান ত্রিতল চতুস্তল অট্টালিকা রাজির পরিবর্ত্তে, তিনি দেখিলেন চারিদিকে কদম্ববন,—চক্ষু পীড়নকারী পোড়া মাটীর পরিবর্ত্তে, চতুর্দ্দিকে নয়নানন্দকর শ্যামল বৃক্ষরাজি, গঙ্গা-তীরে প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপান শ্রেণীর পরিবর্ত্তে, সারি সারি যজ্ঞ-স্তম্ভ। তিনি দেখি-লেন গঙ্গার জলের উপরে চারিদিকে ভ্রমর সকল মধুর সঙ্গীত করি-তেছে। বায়ু হিল্লোলে উর্ম্মি-মালা শুভ্রফেণরাশি উদ্গিরণ-করিতেছে,—দেখিয়া ভাবিলেন যেন গঙ্গাদেবী আনন্দভরে স্বয়ংই গান করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন। রজতমুখী তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া যেন গঙ্গা সস্নেহে হাস্যমুখে কাশীকে আলিঙ্গন করিতেছেন। শঙ্কর

ভৌতিক ব্যাপার সেই চৈতন্যের বিষয় হইতে পারে না (cannot become objects of consciousness to it as subject)। রূপ (as subject) কখনও নিজের বা পরের রূপকে আপনার জ্ঞানের বিষয় করে না। কিন্তু চৈতন্য (as subject) বাহ্য এবং আধ্যাত্মিক সকলকেই আপনার জ্ঞানের বিষয় করে (objects to itself as subject)। অতএব চৈতন্য ভৌতিক গুণ হইতে পারে না। স্বপ্নকালে দেহের উপলব্ধি লোপ হয়, কিন্তু চৈতন্য বা উপলব্ধি লোপ হয় না। সেই উপলব্ধি বা চৈতন্যই আত্মা" ইত্যাদি। ২৩ খণ্ড 'শঙ্করের দার্শনিক সিদ্ধান্ত' দেখ।

গঙ্গার শীতল স্নিগ্ধ-জলে স্নান করিয়া মলিনতাশূন্য হইয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইলেন। বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের ও পূজনীয় বিশ্বেশ্বরের চরণ-যুগল ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া, শঙ্কর কিছু কাল সেই পবিত্র-ক্ষেত্রে যোগ সাধনায় অতিবাহিত করিলেন।

১৯। সনন্দনের শিষ্যত্ব।

শঙ্করের কাশী বাস কালে, একদা একজন ব্রাহ্মণ কুমার তাঁহাকে দেখিতে আসিল। তাঁহার বয়স অল্প, মুখ তেজস্বী, বিবাহ হয় নাই। তিনি বেদ-অধ্যয়ন সমাপন করিয়া, বৈরাগ্য-যুক্ত হইয়া, সংসার সাগর পার হইবার মানসে গুরু-কৃপার অপেক্ষী হইয়া শঙ্করের নিকট সমাগত হইয়াছেন। তিনি শঙ্করকে দেখিবামাত্র তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। শঙ্করও স্নেহভরে তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস, তুমি কে, কোথা হইতে আসিলে, যদিও তুমি বালক, কিন্তু তোমার বুদ্ধি বালকের অনুরূপ দেখিতেছি না।" বালক উত্তর করিল "আমি চোল দেশবাসী ব্রাহ্মণ-কুমার। কাবেরী নদী তীরে আমার নিবাস। সাধু-দর্শন মানসে আমি নানা-দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আপনার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি সংসার ভয়ে ভীত, দয়া করিয়া আমার উদ্ধারের উপায় নির্দ্দেশ করুণ। হে পরম গুরো, আপনার দয়া অহেতুকী, এ অভাগার দোষ গুণ বিচার করিবেন না। গুণবান্ দেখিয়া দয়া করিলে, কে আপনাকে অহেতুকদয়াসিন্ধু বলিবে? মরুভূমিতে প্রচুর জল বর্ষণ করিলেই মেঘের যেরূপ আদর হয়, সমুদ্র মধ্যে জলবর্ষণ করিলে তাহা হয় না। আমি অভাগা অতি অকিঞ্চন, অতি নীচ, আমার প্রতি দয়া করিলে আপনার দীন-দয়াল নাম যেরূপ সার্থক হইবে, ভাগ্যবান্‌কে দয়া করিলে সেরূপ হইবে না। যাহার অন্তর আপনার শুদ্ধাদ্বৈত-জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণে বৈরাগ্য-যুক্ত হইয়াছে, তাহার আর সূর্য্য-

লোক, চন্দ্রলোক, ইন্দ্রলোক, কুবের লোক, অগ্নিলোক, অথবা বায়ুলোক, এমন কি ব্রহ্মলোক লাভেরও অনুমাত্র বাসনা থাকে না। সংসারের বিষয়-বিভব অতি অকিঞ্চিৎকর, ইন্দ্রলোকও অতি তুচ্ছ, ব্রহ্মলোকও ক্ষণভঙ্গুর। আপনার উপদেশ লাভ করিবার জন্য, আপনার চরণ সেবায় শরীর মন উৎসর্গ করিবার জন্য, আমার চিত্ত-চকোর লালায়িত। আপনার সেবায় সংসার বন্ধন মোচন হয়, সকল দুঃখের শান্তি হয়। আপনিই বৈদ্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-বৈদ্য"। প্রাচীন দ্রাবিড় দেশেরই কাবেরী নদীর উত্তরপারস্থিত ভূখণ্ডের নাম চোল দেশ। মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ আধুনিক ত্রিচিনাপল্লীই চোল দেশের প্রধান নগর। পাঠক লক্ষ্য করিবেন শঙ্কর প্রবীণের ন্যায় সনন্দনকে "বালক" জ্ঞানে তাহার সহিত আলাপ করিতেছেন। এইরূপ আলাপ পাঠ করিলে, বোধ হয় না যে শঙ্করও এই সময়ে দ্বাদশ-বর্ষীয় বালক মাত্র ছিলেন। অভ্যাগত ব্রাহ্মণ-কুমার এইরূপ বলিলে পর, আচার্য্যদেব তাহাকে যথাবিধি শিষ্যত্বে দীক্ষিত করিয়া, সন্ন্যাস ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিলেন। এই ব্রাহ্মণ-যুবকেরই নাম সনন্দন। ইহাকেই আমরা পদ্মপাদ নামে, বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সন্ন্যাস আশ্রমে সনন্দনই শঙ্করের প্রথম শিষ্য। গুরু কৃপায় সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সনন্দনের ভীতি বিদূরিত হইল। ক্রমে চিৎসুখ, এবং আনন্দগিরি প্রভৃতি অপরাপর শিষ্যগণও কাশীতেই তাঁহার নিকটে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপদেশ লাভার্থ অসংখ্য ছাত্র পংক্তি দ্বারা পরিবৃত হইয়া শঙ্করের মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

২০। চণ্ডাল কর্ত্তৃক শঙ্করের পরীক্ষা।

কাশীবাসকালে শঙ্কর একদা মধ্যাহ্ন সময়ে, আহ্নিক করিবার জন্য সশিষ্য জাহ্নবী-তীরে যাইতেছিলেন। সূর্য্য তখন প্রচণ্ড কিরণ-

জাল বিস্তার করিতেছিল। মরালগণ উত্তাপের ভয়ে, পদ্মমধ্যে লুকায়িত, মৎস্য সকল জলগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, পক্ষীগণ বৃক্ষ কোটরে শয়ান, এবং ময়ূরগণ গিরিকন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে শঙ্কর একজন চণ্ডালকে দেখিতে পাইলেন। তাহার পশ্চাতে চারিটি ভীষণ কুকুর। চণ্ডাল অস্পৃশ্য। তাহাকে দেখিবাত্র শঙ্কর না ভাবিয়া সাধারণ জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন "গচ্ছ দূরম্"—দূর হও। সেই চণ্ডাল কিন্তু অপর সাধারণ চণ্ডালের মতন লৌকিক আচারের দাস হইয়া, "লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ"—বিধি শিরোধার্য্য করিয়া, মূক ভাবে অপমান সহ্য করিবার পাত্র ছিলেন না। 'দূর হও' এই কথা শুনিবামাত্র চণ্ডাল উত্তর করিলেন:—"হে মুনিবর, বেদান্ত পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিতেছে, যে ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অনবদ্য, অসঙ্গ, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। তুমি বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী হইয়া সেই ব্রহ্মেরই মধ্যে ভেদ কল্পনা করিতেছ, ইহা অতিশয় বিস্ময়-কর। দণ্ডকমণ্ডলুধারী মূর্খ, সন্ন্যাসীরা পাটল বসন পরিধান করিয়া, নানা প্রকার পুষ্পিত-বাক্যে গৃহস্থদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। হে বিদ্বন্, তুমি যে "দূরে যাও" বলিলে—আমার দেহকে, কি আমার দেহীকে দূরে যাইতে বলিতেছ? তুমি আমার দেহকে, অথবা আমার দেহীকে পরিহার করিতে প্রয়াসী হইয়াছ? হে যতিবর, দেহ অথবা অন্নময়-কোষ, তোমার যেরূপ আমারও সেইরূপ—অন্নময় হইতে কি অন্নময়ের ভেদ সম্ভব? পঞ্চভূতাত্মক দেহসকল পঞ্চভূত-দ্বারাই পরস্পর সংযুক্ত। দেহ হইতে দেহান্তরের ভেদ-কল্পনা করিবার কোন ভূমি নাই। অথবা ভেদ-রহিত সাক্ষী-স্বরূপ আত্মা হইতে কি ভেদ-রহিত সাক্ষী স্বরূপ আত্মার বিভাগ সম্ভব! কোন্ যুক্তি অবলম্বন করিয়া এক অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপী আত্মার মধ্যে তুমি ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদ কল্পনা করিতেছ? সূর্য্যের প্রতিবিম্ব গঙ্গার জলেই পড়ুক, আর সুরা

মধ্যেই পড়ুক, উভয়তই তাহা সূর্য্যেরই প্রতিবিম্ব! ইহাতে কোন ভেদ নাই। হে মুনিবর, "আমি ব্রাহ্মণ শুচি, হে শ্বপচ্ দূরে যাও"—তোমার এ কি মিথ্যা অভিমান! সেই সৎস্বরূপ এক পূর্ণ-পুরাণ পুরুষ, যিনি অশরীরি হইয়া সকল শরীরে বর্ত্তমান, তুমি কেন তাঁহাকে উপেক্ষা করিতেছ? সেই অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্ত, আদিভূত, নির্ম্মল ব্রহ্ম-স্বরূপকে বিস্মৃত হইয়া, মোহবশে কেন তুমি এই করীকর্ণবৎ চঞ্চল কলেবরে আমিত্বের অভিমান করিতেছ? হায়, কি দুঃখের কথা! যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভে জীবের মুক্তি সাধিত হয়, সেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াও তোমার তুচ্ছ লোকাচার অনুসরণ দ্বারা লোকের প্রশংসা লাভের বাসনা দূর হইল না। পাছে লোকে তোমার নিন্দা করে, এই ভয়েই তুমি আমাকে দূরে যাইতে বলিতেছ। আহা, সেই মহামায়াবির এ কি ঐন্দ্র-জালিক প্রভাব, যে মহাপুরুষেরাও ইহাতে বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন"। এইরূপ বলিয়া সেই চণ্ডাল নিরস্ত [illegible]। চণ্ডালের এই সকল জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্করের চক্ষু স্থির হইল। বিস্ময়ে বাক্য রোধ হইল, এ ব্যক্তি চণ্ডাল, কি চণ্ডাল নয়, তাঁহার মনে এইরূপ গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইল। যাঁহার সুশাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ তর্কজালকে লক্ষ্য করিয়া,আধুনিক ব্রাহ্ম কবি ও শঙ্করকে "নাস্তিকের-ত্রাস" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, সেই শঙ্কর নিশ্চয় তাঁহার তর্কজাল বিস্তার করিয়া, এই চণ্ডালকে তর্কে পরাস্থ করিতে পারিতেন, সাধারণ জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায়, এই অনধিকার-চর্চ্চায় রত বাবদূক চণ্ডালকে একেবারে "কস্ত্বং খস্ত্বং ঘস্ত্বং" করিয়া দিতে পারিতেন। ঋগ্‌বেদীয় পুরুষ-সূক্তের উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করিতে পারিতেন যে ব্রাহ্মণ-জাতি সেই বিশ্ব-পুরুষের বা প্রজাপতির মুখ-স্বরূপ, "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখ মাসীৎ" এবং তাঁহার পাদ হইতে শূদ্রের জন্ম—"পদ্ভ্যাং শূদ্র অজায়ত"—অন্ত্যজ চণ্ডাল ত দূরের কথা। অথবা স্মৃতি হইতে তিনি প্রমাণ করিতে পারিতেন যে "পৃথিবীতে যত তীর্থ স্থান আছে, সকলই

ব্রাহ্মণ জাতির দক্ষিণ পদে বিদ্যমান।" কিন্তু শঙ্কর সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। অধুনাতন নিম্নশ্রেণীর ব্যবহার-জীবিদিগের মতন তিনি "মুখেন মারিতং জগৎ"—করিবার লোক ছিলেন না। মহানুভব শঙ্কর বিনা বাক্যব্যয়ে নিতান্ত সরল বালকের মতন, স্বকৃত অপরাধের জন্য, অনুতপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সকলই সত্য। আপনিই যথার্থ আত্মতত্ত্বজ্ঞ। আপনার গভীর জ্ঞানগর্ভ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া, আমি আর আপনাকে চণ্ডাল মনে করিতেছি না। অভেদ জ্ঞান লাভ হইয়াছে, এমন লোক অতি বিরল। বেদান্ত-বাক্য অনেকেই অবগত আছেন। অনেকেই ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া বেদান্ত-বাক্য মনন করিয়া থাকেন,অনেকেই পরমাত্মাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া থাকেন, কিন্তু ভেদ-বুদ্ধি রহিতহইয়াছে এমন লোক অতি বিরল। যে জ্ঞানী মহাপুরুষের নিকটে এই নিখিল জগৎ এক অদ্বৈত আত্মারূপে দিবানিশি প্রকাশ-মান, তিনি ব্রাহ্মণই হউন, আর চণ্ডালই হউন, তিনি নিশ্চয়ই আমার নমস্য। যে চিন্ময় পরমাত্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের মধ্যে প্রকাশিত, তিনিই আবার তুচ্ছ পতঙ্গাদির মধ্যেও প্রকাশমান। তিনিই অহংরূপে সর্ব্ব দেহে বর্ত্তমান। তাঁহার তুলনায় এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চ অসৎ, অনিত্য। এই জ্ঞান যাঁহার লাভ হইয়াছে, —তিনি পুক্কস বা চণ্ডাল হইলেও আমার গুরু। যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, সকলই জ্ঞানের বিষয় অথবা জ্ঞেয় রূপেই বর্ত্তমান। যিনি এই জ্ঞেয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র জ্ঞাতৃরূপ সেতু হইয়া সমস্ত ধারণ করিয়াছেন, সেই সর্ব্ব উপাধির অতীত অব্যক্ত চিদাত্মাকে যে মহাপুরুষ সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া থাকেন, তিনি যেই হউন, তিনিই আমার গুরু"। পাঠক, এ স্থলে শিক্ষা কর উদারতা কাহাকে বলে? বালকোচিত সরলতা এবং এবং বিনয় কাহাকে বলে? শঙ্কর জাত্যভিমানকে চিরাভ্যস্ত, দুর্ব্বলতা বলিয়াই গণ্য করিতেছেন। পাপ মনে করিয়া তাহা পরিহার করিতে

তিনি প্রস্তুত আছেন। কিন্তু আজকাল অনেকে জাত্যভিমান পরিত্যাগ করা যত সহজ মনে করিয়া থাকেন, তিনি তত সহজ মনে করিতেন না। উপবীত-ত্যাগের নামে কয়েক গাছা সূত্র ছিঁড়িলেই যদি জাত্যভিমান ত্যাগ হইত, তবে নিশ্চয়ই ইহা অতি সহজসাধ্য। কিন্তু জাত্যভিমান রাক্ষসী-বিশেষ। সুধু ক্ষণিক উৎসাহে বা বল প্রয়োগে, অথবা জিহ্বার জোরে, ইহার বিনাশ সাধিত হয় না। অথবা বিনষ্ট হইলেও সে পুনরায় নূতন জীবন গ্রহণ করে। বাহিরের উপবীত ছিঁড়িলেও মনের উপবীত ছিড়িতেছে না, মনের অভিমান মনেই থাকিতেছে। হয়ত গলার সূতা পায়ের বুট হইতেছে, কপালের চন্দনফোঁটা গায়ের কোট হইতেছে, মাথার টিকি মাথার হেট্ (Hat) হইয়া মাথায়ই থাকিতেছে। অভিমানের জীর্ণা রাক্ষসী নব জীবন লাভ করিতেছে। হয়ত সেই উপবীত-ত্যাগী ব্রাহ্মণ সাহেবের বুটের লাথি রাস্তার গরীব-দুঃখীর কৃপা। পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে। শঙ্কর সরল এবং বিনয়ী, তাঁহার দোষ প্রদর্শন করিল বলিয়া, রাগ করা দূরে থাকুক, বরং অকাতরে সর্ব্বান্তঃকরণে সেই হেয় চণ্ডালকেও তিনি গুরু মান্য করিতেছেন।

২১। মহাদেবের আবির্ভাব ও শঙ্করের স্তব।

মাধবাচার্য্য বলেন যে শঙ্কর এইরূপ বলিতেছিলেন, এমন সময় সেই চণ্ডালকে আর দেখিতে পাইলেন না। চণ্ডালও নাই, তাহার ভীষণ কুকুরচতুষ্টয়ও নাই। তিনি দেখিলেন যে স্বয়ং ধূর্জ্জটি মহাদেব বেদচতুষ্টয় সঙ্গে লইয়া তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত। শশীকলা-শোভিত অষ্টমূর্ত্তি মহাদেবকে সহসা সম্মুখে দেখিয়া শঙ্করের মনে যুগপৎ ভয়, বিস্ময়, এবং ভক্তির উদ্রেক হইল। ক্ষণকাল মধ্যে চিত্ত স্থির করিয়া, আনন্দ অন্তরে, ভক্তি এবং বিনয়ের সহিত তিনি তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। "হে শম্ভো,

দেহ সম্বন্ধে আমি তোমারই দাস, জীব সম্বন্ধে আমি তোমারই অংশ ; হে সর্ব্বাত্মন্, সকল শাস্ত্র আমাকে এই শিক্ষা দিতেছে যে তুমিই আমি। যাঁহার আলোকে লোকের অন্তর-বাহির আলোকিত, যাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া যতিগণ নির্জ্জনে বসিয়া একান্ত-মনে নিয়ত যোগ সাধনা করিতেছেন, তুমিই সেই পরমাত্ম-স্বরূপ, সমস্ত বেদের শিরোমণিভূত, তোমাকে নমস্কার। ত্রিজগতে এমন গুপ্ত আধার নাই, যাহার মধ্যে তোমার মতন রত্ন লুকাইয়া রাখা যায়। এমন শাণ বা কষ্টি পাথর নাই যদ্দ্বারা তোমার মতন রত্ন পরীক্ষা করা যায়। এমন খনি নাই, যেখানে তোমার মতন মণি উৎপন্ন হইতে পারে। ধন্য শাস্ত্র, কিন্তু শাস্ত্রই বা কি করিবে, যদি গুরু-কৃপা লাভ না হয়। গুরু-কৃপাও নিস্ফলা যদি তদ্দ্বারা জ্ঞানোদয় না হয়। জ্ঞানেই বা কি ফল, যদি তদ্দ্বারা পরমতত্ত্ব প্রকাশিত না হয়। অতএব সেই সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, স্ব-স্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার।” এইপ্রকার উদার বাক্যে ভগবানের স্তব করিতে করিতে, এবং পুনঃ পুনঃ ভগবান্‌কে নমস্কার করিতে করিতে, শঙ্করের নয়ন যুগল হইতে বারিধারা নির্গত হইতে লাগিল। পাঠক, শঙ্করের স্তবের একটু বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবেন ঃ—তিনি মহাদেবকে প্রতীক বা চিহ্নমাত্র জ্ঞানে পরমাত্মারই স্তব করিতেছেন। মহাদেবের ব্যক্তিগত রূপের অথবা ব্যক্তিগত জীবনের কোন বিষয়ের উল্লেখও করিতেছেন না। ভগবান্ উমা-পতিও অতি সমাদরে শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, ঃ—

“হে তপোধন, তোমার তপো-নিষ্ঠা দ্বারা শোধিত হইয়া, তুমি আমাদেরই তুল্য পদবী লাভ করিয়াছ। তুমি সাধুদিগেরও পূজনীয়। তুমি বাদরায়ণের তুল্য আমার অনুগ্রহের ভাজন হইয়াছ। বাদরায়ণ আমারই অনুশাসনে শ্রুতি সকল বিভাগ করিয়া এবং ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়া কণাদ এবং সাংখ্য প্রভৃতি ভ্রমাস্তত সকল আমূল খণ্ডন করিয়াছেন। কোন কোন অল্পবুদ্ধি লোক

দুই তিনটী শ্রুতি বচন মাত্র অবলম্বন করিয়া, সেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছে, কিন্তু সে সকল ভাষ্য জ্ঞানীদিগের অনুমোদিত হয় নাই। তুমিই বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছ। তুমি পূর্ব্বকৃত ভ্রমসঙ্কুল ব্যাখ্যা সকল খণ্ডন করিয়া শ্রুতিমূলক সুযুক্তিপূর্ণ সূত্রভাষ্য রচনা কর। তোমার রচিত ভাষ্য ব্রহ্মার সভায় এবং ইন্দ্রাদিদেবগণ মধ্যে সমাদর লাভ করিবে। তুমি ভেদা-ভেদবাদী পণ্ডিতবর ভাস্কর, শাক্ত পণ্ডিত অভিনবগুপ্ত, ভেদবাদী নীলকণ্ঠ, শৈব পণ্ডিত প্রভাকর, এবং কুমারিল মতানুযায়ী পণ্ডিত মণ্ডনমিশ্র প্রভৃতিকে বিচারে জয় করিয়া জগতে অদ্বৈত তত্ত্ব প্রচার কর। সেই অদ্বৈত তত্ত্বের রক্ষার জন্য নানা দেশে তোমার শিষ্যদিগকে স্থাপন করিয়া তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ করিলে পর, তুমি আমারই মধ্যে প্রবেশ করিবে।" এইরূপে শঙ্করের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করিয়া, মহাদেব বেদগণ সহ অন্তর্হিত হইলেন। শঙ্করও তদ্দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইয়া শিষ্যগণ সহ আহ্নিক করিবার জন্য গঙ্গাতীরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। তথায় আহ্নিক-ক্রিয়া সমাপন করিয়া তিনি গুরুরূপী পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ধ্যানযোগে প্রত্যাদিষ্ট হইয়াই যেন তিনি জীবলোকের হিতসাধন কল্পে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পাঠক ধূর্জ্জটির একটি কথা এস্থলে লক্ষ্য করিবেন, "তোমার রচিত ভাষ্য ব্রহ্মার সভায় এবং ইন্দ্রাদিদেবগণ মধ্যে সমাদর লাভ করিবে"। শঙ্করের মতে আমাদের দেবগণও শাস্ত্রালোচনায় অধিকারী, কারণ তিনি ব্রহ্ম-সূত্র ভাষ্যে (অ ১-পা ৩-সূ ২৬) বলিতেছেনঃ—"মনুষ্যাণাং উপ-রিষ্টাত্তে দেবাদয় স্তানপ্যধিকরোতি শাস্ত্রং"—মানুষের উপরে যে সকল দেবগণ আছেন, শাস্ত্র-পাঠে তাঁহাদিগেরও অধিকার আছে। এতদ্দারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে শঙ্করের মতে দেবগণও আমা-দেরই মতন বদ্ধ সৃষ্ট জীব-বিশেষ মাত্র।

২২। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য এবং অন্যান্য গ্রন্থ রচনা।

বিশ্বনাথের কৃপায় কর্ত্তৃত্ব-শক্তি লাভ করিয়া, শঙ্কর প্রীতমনে কাশী পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। কথিত আছে, উত্তর দিক্ দেব এবং মানবগণের মনের শান্তি-দায়ক। শঙ্করও সেই উত্তর দিক্ অভিমুখেই যাত্রা করিলেন। উত্তরদিক্স্থিত তীর্থ সকল পর্য্যটন করিতে করিতে অবশেষে তাঁহার বদরীতীর্থ দর্শনের অভিলাষ হইল। কিন্তু বদরিকাশ্রমের পথ অত্যন্ত দুর্গম। কোথাও সরল, কোথাও বক্র, কোথাও সমতল, কোথাও ঊর্দ্ধমুখ, কোথাও কণ্টকময়, কোথাও বা কণ্টক-শূন্য,—কোথাও তরুলতা-বিহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তর, কোথাও বা রমণীয় তরুরাজি দ্বারা ছায়াযুক্ত। অজ্ঞানীদিগের চিত্তের ন্যায়, বদরী-তীর্থের পথেরও কোন স্থিরতা ছিল না। অদ্বৈত জ্ঞানের প্রভাবে আপনাকে অক্রিয়, অব্যয়, সাক্ষিস্বরূপ জানিয়াও তিনি অন্যান্য পথিক-দিগের সহিত মিলিত হইয়া, পথ চলিতে লাগিলেন,—তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি ভক্ষণার্থ সুমিষ্ট ফল, এবং পানার্থ সুমিষ্ট জল সংগ্রহ করিতেন। তাহাদের সঙ্গে একত্রে চলিতেন, একত্রে বসিতেন, তাহাদের সঙ্গে একত্রে শয়ন করিতেন, এবং তাহাদের সঙ্গে একত্রেই নিদ্রা হইতে উঠিতেন। এইরূপে বহুদূর পথ অতিক্রম করিয়া, পরিশেষে তিনি পুণ্যভূমি বদরীতীর্থে উপনীত হইলেন। বদরীকাশ্রম ব্যাসের পুণ্যাশ্রম। এই আশ্রমের শোভা অনুপম। আশ্রমের সমীপস্থ বনে সুস্বাদু বদরী বৃক্ষের বাহুল্য হেতু এই আশ্রমের নাম বদরীকাশ্রম। শিবের জটার ন্যায় হিমালয় হইতে নিঃসৃত অসংখ্য নির্ঝর সকল এস্থানে মন্দ মন্দ গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। গিরিকন্দর সকল যেন সুরাঙ্গনাদিগের ক্রীড়াভূমি। মাধবাচার্য্য বলিতেছেন যে বদরীকাশ্রমে গমন কালে শঙ্করের বয়ঃ-ক্রম মাত্র দ্বাদশ বৎসর। বোধ হয়, এ কথা অনেকেরই বিশ্বাস-যোগ্য হইবে না।

শঙ্কর কিছুদিন সেই বদরীতীর্থে বাস করিয়া তথায় সমাধিনিষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত বেদান্ত-বিষয়ক বহু আলোচনার পর ব্রহ্মসূত্রের অতি গভীর এবং হৃদয়গ্রাহী একটী ভাষ্য রচনা করিলেন। এই সূত্রভাষ্য শঙ্করের অসামান্য বিচার শক্তি, গভীর আত্মদৃষ্টি, এবং অনুপম শাস্ত্রীয় গবেষণার কালান্ত-স্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ। বদরীতীর্থের সেই নির্জ্জন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভিতরে বসিয়াই, শঙ্কর তাঁহার অন্যান্য প্রধান প্রধান গ্রন্থ সকলও রচনা করিয়াছিলেন। উপনিষদ্ সকলের ভাষ্যও এই সময়েই রচিত হইয়াছিল। ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, ছান্দোগ্য, ও বৃহদারণ্যক এই কয়টি উপনিষদের শাঙ্করভাষ্যই প্রধান। সূর্য্যালোকের সাহায্য ভিন্ন যেমন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার অন্য উপায়ান্তর নাই, সেইরূপ শাঙ্কর ভাষ্যের সাহায্য ভিন্ন উপনিষদেরও মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিবার উপায়ান্তর নাই। অনেক স্থলে উপনিষদের অতি সংক্ষিপ্ত উক্তি সকল উন্মত্তের প্রলাপের ন্যায় অর্থশূন্য বোধ হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে উল্লেখ করা যায় যে ছান্দোগ্য উপনিষদে যখন আমরা পড়িলাম "কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম"—আবার ঐ উপনিষদেই তাহার ব্যাখ্যা ও পাঠ করিলাম "যদেব কং তদেব খং, যদেব খং তদেব কং"—দুর্বোধ্য প্রহেলিকার ন্যায়, অথবা উন্মত্তের প্রলাপের ন্যায় অর্থশূন্য মনে হইল। শাঙ্কর ভাষ্যের বিশদ ব্যাখ্যা পাঠে যখন বুঝিতে পারিলাম যে ইহা সেই "অতীন্দ্রিয় আনন্দ স্বরূপ" ব্রহ্মেরই বর্ণনা, তখনই প্রাণ শীতল হইল, তখনই উপনিষদের প্রকৃত গৌরব হৃদয়ঙ্গম হইল। শঙ্কর এই সময়েই মহাভারতের সারভূত ভগবৎগীতার ভাষ্যও রচনা করেন। সনৎ-সুজাতীয় এবং নৃসিংহোত্তরতাপনীয়োপনিষদ্ভাষ্যই শঙ্করের শেষ ভাষ্য। তাহাও এই সময়েই লিখিত। 'উপদেশসাহস্রী' প্রভৃতি তাঁহার স্বরচিত স্বতন্ত্র গ্রন্থ সকলও এই সময়েরই লিখিত। অনেক গ্রন্থ যাহা আজকাল শঙ্করের রচনা বলিয়া পরিচিত, তাহা যে শঙ্ক-

রেরই রচনা তাহা বলা যায় না। বিবেক-চূড়ামণি, মোহমুদ্গর, কৌপীন-পঞ্চক, আত্মানাত্মবিবেক, আত্মবোধ, এবং অপরোক্ষানুভূতি, এই কয়টি গ্রন্থ তাঁহার স্বরচিত বলিয়াই বোধ হয়। 'হস্তামলক' শঙ্করেরই রচনা, কিম্বা 'হস্তামলক' নামা তদীয় শিষ্যের রচনা ঠিক্ বলা কঠিন। শঙ্করের স্বরচিত স্বতন্ত্র গ্রন্থ সকলই যে পাওয়া যায়, তাহাও বলা কঠিন। শঙ্করের স্বরচিত গ্রন্থের মধ্যে মাধবাচার্য্য ভাষ্যভিন্ন একমাত্র 'উপদেশ-সাহস্রীরই' নাম করিতেছেন। তাহাও আমাদের হস্তগত হয় নাই। এই সময়ে শঙ্কর কতদিন বদরী-তীর্থে অবস্থান করেন, অথবা তাঁহার সমস্ত গ্রন্থই বদরী তীর্থে রচিত কি না, বলা যায় না। বদরী-তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া তিনি কাশী প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২৩। সনন্দনের পদ্মপাদ নামকরণ।

শঙ্কর-শিষ্য সনন্দন সম্বন্ধে এই সময়ের একটি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে। গঙ্গা তীরেই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। তাহা দ্বারা অনুমান করা যায় যে শঙ্কর তখন কাশী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ঘটনাটি এই :—শঙ্কর স্বরচিত সূত্রভাষ্য স্বীয় শিষ্যদিগকে অধ্যাপন করাইতেন। শিষ্যদিগের মধ্যে সনন্দনের ভাষ্যপাঠে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া, তিনি সনন্দনকে বিশেষ ভাবে আরও তিনবার এই ভাষ্য পাঠ করাইলেন। সনন্দনের প্রতি গুরুর অনুরাগের এইরূপ আধিক্য দর্শন করিয়া, অপরাপর শিষ্যদিগের মনে ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইল। শঙ্কর শিষ্যবর্গের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি জানিতেন যে গুরু-ভক্তি সম্বন্ধে সনন্দনের সহিত অন্য শিষ্যদিগের কাহারও তুলনাই হয় না। শিষ্যদিগের নিকটে সনন্দনের গুরুভক্তির মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করিবার মানসে, একদিন সনন্দন যখন গঙ্গার অপর পারে ছিলেন, তখন শঙ্কর তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। গুরু ডাকিতেছেন জানিয়া সনন্দন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যে গুরুভক্তিদ্বারা

অপার ভবসাগর পার হওয়া যায়। গঙ্গা ত অতি ক্ষুদ্র নদী, গঙ্গা পার হইতে পারিবেন ইহাতে আর সংশয় কি? তিনি আর দিগ্‌বিদিগ্‌ না ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ গঙ্গার জলে অবতরণ করিলেন। গঙ্গাদেবীও সনন্দনের এইরূপ গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহার প্রতি-পাদ-বিক্ষেপে পদ্ম সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সনন্দন সেই পদ্ম-পংক্তির উপরে পাদ নিবেশ করিয়া গঙ্গা পার হইলেন। তিনি গুরুসমীপে উপস্থিত হইলে পর গুরু তাঁহাকে আনন্দিত মনে আলিঙ্গন করিলেন। সেই সময় হইতে সনন্দনের অন্যতর নাম পদ্মপাদ হইল। পাঠক স্মরণ করিতে পারেন যে ঈশাও জলের উপরে পাদচালনা করিয়া তদীয় শিষ্যদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। তবে এ কথাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে আমাদের শাস্ত্রে, অর্থবাদ বা স্তুত্যর্থক নানা প্রকার আখ্যায়িকার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের বিখ্যাত ইন্দ্র-বিরোচন এবং প্রজাপতি নামক আখ্যায়িকা সম্বন্ধে শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন যে সেই আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য বিদ্যা-গ্রহণ এবং বিদ্যা-সম্প্রদান বিষয়ক বিধি প্রদর্শন, এবং ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসা। "আখ্যায়িকা তু বিদ্যা-গ্রহণ-সম্প্রদান-বিধি-প্রদর্শনার্থা বিদ্যাস্তুত্যর্থা চ।" শঙ্কর আরও বলিতেছেন "প্রজাপতি-ছদ্মরূপায়াঃ শ্রুতের্বচনম্।"—অথাৎ শ্রুতিই প্রজাপতিরূপ ছদ্মবেশে বলিতেছেন। হয়ত পদ্মপাদ নাম অবলম্বন করিয়া, গুরু-ভক্তির বিধি প্রদর্শনার্থ এবং গুরু-ভক্তির স্তুত্যর্থক এইরূপ আখ্যায়িকা কল্পিত হইয়াছে। পাঠক পরে দেখিতে পাইবেন সূত্র-ভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা লইয়া শঙ্করের সহিত তদীয় শিষ্যদিগের মতভেদ হয়। সেই উপলক্ষে পদ্মপাদ সম্বন্ধীয় এই আখ্যায়িকার যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অনেকটা অন্যরূপ। তাহাতেও মনে হয় যেন ঘটনার অধিকাংশই কল্পনা প্রসূত।

২৪। ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যার ইতিহাসে শঙ্করের স্থান।

শঙ্কর এই সময়ে কাশীতে অবস্থান করিয়া গ্রন্থ রচনা দ্বারা, এবং শিষ্যদিগকে উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার গ্রন্থ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার যশও চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। তাঁহার শিষ্যসংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যার ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে শঙ্কর শীর্ষ স্থান অধিকার করিলেন। আমরা সংক্ষেপে সেই ইতিহাসে শঙ্করের স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছি। বেদই ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যার একমাত্র ভিত্তি-ভূমি। সেই বেদের প্রধানতঃ দুই কাণ্ড ঃ—কর্ম্ম-কাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড। বৈদিক কর্ম্ম বলিতে মীমাংসকেরা অগ্নিহোত্র এবং যাগযজ্ঞাদিকেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। বৈদিক কর্ম্ম বা ক্রিয়াকলাপ স্থূল, এবং স্থূল-বুদ্ধি জনসাধারণের উপযোগী। বৈদিক-জ্ঞানবিভাগ বা উপনিষদাদি সূক্ষ্ম-বিষয়ক, এবং সূক্ষ্মদর্শীদিগের উপযোগী। সূক্ষ্মদর্শী ভিন্ন অপর লোকের তাহাতে প্রবেশ করা সুকঠিন। কালক্রমে যাগযজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের আতিশয্য হেতু, বৈদিক জ্ঞানকাণ্ড—উপনিষদ্‌গম্য ব্রহ্মবিদ্যা—বৈদিক ব্রাহ্মণ-ভাগের মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। সমাজের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে 'বার হাত সশার তের হাত বিচি'র ন্যায় যাগযজ্ঞের বাহ্যাড়ম্বরই দেশে প্রকৃত ধর্ম্মের আসন গ্রহণ করিয়াছিল। জ্ঞানী বা জ্ঞান-পিপাসুগণ সেই অন্তঃসার-শূন্য, ক্রিয়া-বিশেষ-বহুল, বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। এজন্যই ভগবৎগীতাতে বেদের নিন্দাসূচক নানা প্রকার উক্তি দৃষ্ট হয়, যথা ঃ—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্য বিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্য দস্তীতি বাদিনঃ॥ ৪২॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্ম-কর্ম্মফল-প্রদাং।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য-গতিং প্রতি" ॥ ৪৩ ॥
"ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন॥" ৪৫ ॥
"যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ" ॥ ৪৬ ॥

অজ্ঞানী লোকেরা বেদের কথায় অনুরক্ত হইয়া, নানা প্রকার ক্রিয়াবিশেষের প্রশংসাপূর্ণ জন্ম এবং কর্ম্মফলপ্রদ পুষ্পিত-বাক্যের উল্লেখ করে, তাহারা বলে কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, তাহারা বাসনার দাস, স্বর্গ লাভের পিপাসু, সর্ব্বদাই কেবল ভোগ ও ঐশ্বর্য্য লাভের প্রয়াসী ॥ ৪৩ ॥ বেদ ত্রিগুণ বিষয়ক (বাসনা-বিষয়ক), হে অর্জ্জুন ত্রিগুণের (বা বাসনার) অতীত হও ॥ ৪৫॥ সর্ব্বদিক্ জলে প্লাবিত হইলে, ক্ষুদ্র উদপান যেমন বৃথা, জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদ সকলও সেইরূপ ॥ ৪৬ ॥ (২য়, অধ্যায় ভগবদ্গীতা)। কর্ম্ম-কাণ্ডের অতিবিকাশ-নিবন্ধন জাত্যভিমান, বাহ্যাড়ম্বর-পূর্ণ ক্রিয়া-কলাপ, নানাপ্রকার ধর্ম্মধ্বজা ধারণ,—তপস্যার নামে শরীর-পীড়ন, এবং কুসংস্কার,—কালক্রমে এ সকলে দেশ পূর্ণ হইয়াছিল। প্রকৃত ধর্ম্ম তখন লুপ্তপ্রায়। এমন সময়ে ভগবান্ বুদ্ধের অভ্যুদয়। ধ্যান এবং সমাধি দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার, সর্ব্বাত্মভাব, এবং সর্ব্বজীবে দয়াই বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম-প্রচারের ভিত্তি। "নেতি নেত্যাত্মা"—আত্মা ইহা নয়, উহা নয়, যাহা কিছু ধারণা করা যায় তাহার কিছুই নয়,—যদিও উপনিষদেরই এই শিক্ষা,—কিন্তু বুদ্ধের পক্ষে ইহা ধ্যান-লব্ধ সাক্ষাৎ জ্ঞান। যাঁহারা ধ্যান এবং সমাধি সাধনায় নিরত, তাহাদের পক্ষে এই "নেতি নেতি"-বাদ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ, কিন্তু যাহারা সেই সাধনা-বিহীন তাহাদের পক্ষে, ইহা এক প্রকার শূন্যবাদ অথবা নাস্তিকতা। বুদ্ধদেব শঙ্করের ন্যায় গ্রন্থরাশি রচনা করিয়া যান নাই। তাঁহার ধর্ম্ম জীবনগত। জীবনে লাভ করা ভিন্ন তাহা জানিবার অন্য উপায়

ছিল না। জীবনে ধর্ম্ম লাভ করা বিশেষ আয়াস-সাধ্য। যাঁহারা বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট সাধনার পথ ছাড়িয়া, কেবল মাত্র বুদ্ধির প্রখরতা দ্বারা সেই বাক্য-মনের অগোচর পদার্থ ধারণা করিতে প্রয়াসী, তাঁহারা শূন্য অথবা ক্ষণিক-বিজ্ঞান ভিন্ন কিছুই দেখিবে না। এজন্যই বুদ্ধের বহুকাল পরবর্ত্তি 'হেতুবাদী' শিষ্যগণ 'নেতি' সাধনা করিয়া পরিণামে শূন্যবাদী এবং ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী হইয়া পড়িলেন। যে আত্মসাক্ষাৎ-কারেই বুদ্ধের বুদ্ধত্ব, বৌদ্ধগণ আত্মার পরিবর্ত্তে তাহার স্থানে শূন্যমাত্র প্রতিষ্ঠিত করিল। নিরবচ্ছিন্ন হেতুবাদীদিগের সর্ব্বত্রই যেরূপ দশা হয়, বৌদ্ধদিগেরও তাহাই হইল। তাহাদের মধ্যে মতভেদের অন্ত রহিল না,—তন্মধ্যে মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক, ও বৈভাষিকই প্রধান। বুদ্ধ একজন—তবে বৌদ্ধদিগের মধ্যে এত মতভেদের কারণ কি? মাধবাচার্য্য তাঁহার কৃত 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ' গ্রন্থে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন; একজন যদি বলে "সন্ধ্যা হইয়াছে" তখন যে ব্যক্তি চোর সে মনে করিবে চুরি করিবার সময় হইয়াছে। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, সে মনে করিবে ইন্দ্রিয়সেবার সময় হইয়াছে। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানী সে ভাবিবে, ধ্যান ধারণার সময় হইয়াছে। বাক্যাড়ম্বর-বিহীন জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত উপদেশের শেষ পরিণাম এইরূপই হইয়াছে। বৌদ্ধেরা শূন্যবাদী অথবা ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী বলিয়াই আধুনিক জগতে পরিচিত হইয়াছে। এই সময়ে চার্ব্বাকের ও পুনরভ্যুদয়। যদিও চার্ব্বাক্-দর্শন বলিয়া কোন গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না, তথাপি মাধবা-চার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চার্ব্বাক্ মতের যে সার-সংগ্রহ পাওয়া যায়, তাহাতেই দেখা যায় যে চার্ব্বাকের সংক্ষিপ্ত একএকটি সিদ্ধান্ত যেন ধান-মরিচের ঝালের মত মর্ম্মস্পর্শী। "নাপ্রত্যক্ষং প্রমাণং"— যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়, তাহা প্রমাণ-যোগ্য হইতে পারে না। আত্মা বা চৈতন্য ভৌতিক সংযোগ-জনিত গুণ-বিশেষ মাত্র—

পচা ভাতের মাদক শক্তির ন্যায়। এই ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া তিনি সুনীতির মস্তক ছেদন করিলেন, "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" ঋণ হয়, তাতে কি? ঘৃত পান করিতে বিরত হইবে না'। এইরূপে যখন দেশ দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হইল তখনই আবার আস্তে আস্তে স্রোত বিপরীতদিকে বহিতে লাগিল। বৌদ্ধ পণ্ডিতগণই চার্ব্বাকের "নাপ্রত্যক্ষং প্রমাণং" মত খণ্ডন করিয়া অনুমানের প্রামাণ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। ক্রমে নৈয়ায়িকগণ সমাজ-ক্ষেত্রে অভ্যুদয় লাভ করিল। তাঁহারা 'অনুমানের' ভিত্তি আরও দৃঢ় করিয়া তদবলম্বনে আত্মার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিলেন:—"প্রবৃত্ত্যাত্মানুমেয়োঽযং রথগত্যেব সারথিঃ"—"রথ চলিতে দেখিলে যেমন সারথির বর্ত্তমানতা প্রতিপন্ন হয়, সেইরূপেই আত্মার ক্রিয়াকলাপ দর্শনে তাহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।" অতঃপর জৈমিনি প্রভৃতি মীমাংসকগণ আত্মাকে শরীর হইতে পৃথক বলিয়া প্রতিপন্ন করিল, কিন্তু তাঁহারা কর্ম্মমার্গকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে, ঈশ্বরকে দূরে ফেলিয়া দিয়া, জীবকে স্বর্গাদি বাসনার এবং কর্ম্মফলের দাস বা ক্রীড়া-পুত্তলিকা করিয়া ফেলিল।* শূন্যবাদী বৌদ্ধ এবং প্রত্যক্ষবাদী চার্ব্বাক্ যে আত্মাকে বধ করিয়াছিল, নৈয়ায়িক এবং মীমাংসকের হাতে সে আত্মা নব জীবন লাভ করিল বটে, কিন্তু তাহাদের মতে ঈশ্বর থাকিলেও "তটস্থ", জীবের কল্যাণ অকল্যাণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাহাদের জীব নিগড়বদ্ধ সংসার কারাগারের বন্দী। এই সময়ে সাংখ্যের অভ্যুদয়। তাঁহারা একদিকে জ্ঞানমার্গের প্রকাশ দ্বারা জীবের মুক্তির বার্ত্তা প্রচার করিল। সাধনা-পথ অবলম্বন দ্বারা তাঁহারা আত্মার নির্লিপ্ত-স্বরূপ প্রতিপন্ন করিল*। বিশুদ্ধ স্ফটিকের সম্মুখে

---

* জগদ্বীজং তু জগৎ-কর্ম্মৈব। 'কর্ম্মণা জায়তে লোকঃ কর্ম্মণৈব হি লীয়তে।' ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে। শঙ্কর বিজয়। জৈমিনির মতে কর্ম্ম বলিতে যাগ-যজ্ঞই বুঝায়।

* অসঙ্গোঽয়ং পুরুষ ইতি (১৫-অ-১) সাংখ্য প্রবচন॥

জপা পুষ্প থাকিলে, যেমন বর্ণহীন স্ফটিক ও জপা পুষ্পের বর্ণলাভ করে, আত্মা সেইরূপ স্বয়ং বিশুদ্ধ স্বরূপ হইয়া ও প্রধান বা জড় বস্তুর সন্নিকর্ষতা বশতঃ মলিনরূপে প্রতীয়মান হয়। অপরদিকে আবার চার্ব্বাকের ন্যায় সাঙ্খ্য ও ধর্ম্মের গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিলেন মাত্র। "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" (৯২। অ – ১। সাঙ্খ্য প্রবচন) ঈশ্বর অসিদ্ধ, যেহেতু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগম্য। "মুক্ত-বন্ধয়োরণ্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ" (৯৩) ঈশ্বর যদি থাকেন হয় তিনি অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশাদি দ্বারা বদ্ধ, না হয় পঞ্চক্লেশাদি-মুক্ত—এই দুয়ের অন্যতর কিছুই নাই—অতএব ঈশ্বর অসিদ্ধ। 'উভয়থাপ্যসৎকরত্বং' (৯৪) :– যদি ঈশ্বর মুক্ত হয়েন, তবে তিনি সৃষ্টি করিতে অক্ষম, কারণ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত্তক অভিমান আসক্তি প্রভৃতির অভাব। যদি ঈশ্বর বদ্ধ হয়েন, তবে মূঢ়ত্ব হেতু তিনি সৃষ্টি করিতে অক্ষম। (শঙ্করের উত্তর দেখ ব্রহ্মসূত্র অ-২। পা-১।সূ ৩২, ৩৩।) এইরূপে সাঙ্খ্য, ধর্ম্মের মূল উচ্ছেদ করিতে প্রয়াসী। কিন্তু তিনি সেই ছিন্নমূল ধর্ম্মতরুর মস্তকে জল সেচন করিলেন; "ঈশ্বর যদি অসিদ্ধই হইল, তবে ঈশ্বর-প্রতিপাদক শ্রুতি সকলের কি গতি" ? "মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা।" (৯৫) অ – ১। সাঙ্খ্য প্রবচন)মুক্তাত্মার প্রশংসা দ্বারা লোককে মুক্তির দিকে আকর্ষণ করাই শ্রুতি-স্মৃতির উদ্দেশ্য, অথবা অনিত্য বা আপেক্ষিক নিত্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হরাদির উপাসনার প্রচার ও শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতির উদ্দেশ্য হইতে পারে। যাহা হউক সাঙ্খ্যদিগের মধ্য হইতেই সেশ্বর একশাখা নির্গত হইল। পতঞ্জলি প্রভৃতিই সেশ্বর সাঙ্খ্যবাদীদিগের প্রধান। পাতঞ্জল মতাবলম্বিরা অষ্টাঙ্গ যোগ, এবং ঈশ্বরের উপাস্যত্ব— "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা"—প্রতিপাদন দ্বারা মুক্তির পথ সহজ করিয়া দিল। কিন্তু জীব ইহাতেও সম্পূর্ণ নির্ভয় হইতে পারিল না। ঈশ্বরের সম্বন্ধে অন্ধকার দূর হইল না। সংসার বন্ধনের হেতুভূত অনাদি অচেতন সাংখ্যোক্ত প্রধান, জীবের বিভীষিকার কারণ হইয়া রহিল"।

এই সময়ে গৌড়পাদের অভ্যুদয়। সাঙ্খ্যকারিকাকার গৌড়পাদ পতঞ্জলিরই অবতার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তিনি দেখাইলেন যে সাঙ্খ্য প্রধান আর কিছুই নয়, সত্ত্ব-রজ-স্তম—এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা মাত্র, "সত্ত্ব-রজ স্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রধানং।" তিনি ৪২ সূত্রে তাঁহার কারিকায় বলিতেছেন: "ত্রিগুণের সাম্য এবং বৈষম্য হইতেই সৃষ্টি এবং প্রলয়, এই দুইরূপ কার্য্য হয়। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ই প্রধান, ন্যূনাতিরিক্তভাবে সেই গুণত্রয়ের মিলনের নাম বৈষম্য, এবং তদ্বিপরীত সাম্য। সাম্য এবং বৈষম্য এই কারণদ্বয় হেতু, একই প্রধান হইতে সৃষ্টি এবং প্রলয়রূপ বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়া থাকে।"* সাধারণ সাংখ্য মত এই যে প্রধান বা প্রকৃতি অচেতন*-সূক্ষ্ম জ্ঞেয় দ্রব্য-বিশেষ, এবং সত্ত্বাদি তাহারই গুণ (attribute) মাত্র। এমন কি গীতাতেও উক্ত হইয়াছে "প্রকৃতিজান্ গুণান্" (২১। অ—১৩।), গুণ সকল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। কিন্তু গৌড়পাদ বলিতেছেন "সত্ত্বাদি গুণত্রয়ই প্রধান"—"সত্ত্বাদি-গুণত্রয়ং প্রধানং।"—অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণের অতীত প্রধান বলিয়া কোন জড় দ্রব্য নাই। অথবা তাঁহার মতে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ই দ্রব্য, (substance), এবং সাঙ্খ্য প্রকৃতি বা প্রধান সেই গুণত্রয়েরই অবস্থা-বিশেষ মাত্র (সাম্যাবস্থা)। ন্যায়ের মতে যাহাকে দ্রব্যের গুণ (attribute) বলা যায়, সাংখ্য মতে গুণ আর তাহা রহিল না। সাংখ্য তত্ত্বকৌমুদী সূত্র করিতেছেন; "প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাদ্যৈগুর্ণানামান্যোন্যং বৈধর্ম্ম্যং।" ১২৭। তাহার উপরে টীকাকার বলিতেছেন; প্রীতি, অপ্রীতি,

---

* "সাম্য-বৈষম্যাভ্যাং কার্য্যদ্বয়ং ॥"৪২॥ "সত্ত্বাদি-গুণত্রয়ং প্রধানং, তেষাং চ বৈষম্যং ন্যূনাতিরিক্ত-ভাবেন সংহননং। তদভাবঃ সাম্যং। তাভ্যাং হেতুভ্যাং একস্মাদেব সৃষ্টি-প্রলয়রূপং বিরুদ্ধকার্য্যদ্বয়ং ভবতি।

* ত্রিগুণ মবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি ব্যক্তং তথা প্রধানং।" সাঙ্খ্য প্রবচন, অ-১। সূ-১২৬॥

এবং বিষাদ দ্বারা সত্ত্বাদি দ্রব্যত্রয়ের পরস্পরের বৈধর্ম্ম্য। আবার বলিতেছেন "সত্ত্বাদীনাং দ্রব্যত্বং সিদ্ধং"—সত্ত্বাদির দ্রব্যত্ব সিদ্ধ হইল। এইরূপে সাংখ্যের জড় প্রকৃতি বা প্রধান, অতীন্দ্রিয় মানস-প্রত্যক্ষ বা অন্তঃকরণগম্য সুখ, দুঃখ, এবং মোহাত্মক-গুণ-শব্দ-বাচ্য সত্তাবিশেষে পরিণত হইল। বেদান্তের মায়ারই নিকটবর্ত্তী হইল। সাংখ্য-বেদান্তের মিলনের পথ পরিস্কৃত হইল। "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ, মায়িনং তু মহেশ্বরং॥" শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্॥ শ্বেতাশ্বতর ভিন্ন অন্য উপনিষদে মায়া শব্দ অল্পই ব্যবহৃত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে মায়া শব্দে স্রষ্টার অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টিশক্তিই বুঝাইতেছে। "রূপং - রূপং প্রতিরূপো বভুব তদস্য রূপং পরিচক্ষণায় ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপঈয়তে"—১৯। অধ্যায় ২। ব্রাহ্মণ ৫। শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন: "পরমেশ্বর নাম রূপাদি প্রকাশ করিবার জন্য সর্ব্বরূপে প্রকাশিত হইলেন। কেন? তাঁহার নিজেরই স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্য। নাম-রূপাদি যদি ব্যাকৃত না হয়, তবে তাঁহার নিরুপাধিক (noumenal) স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকে। কার্য্যকরণাদি যোগে নাম রূপাদি ব্যাকৃত হইলে, তাহার নিজের স্বরূপই প্রকাশিত হইবে।"* (১) জ্ঞেয়রূপে 'সর্ব্ব' বা এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ না থাকিলে, পরমেশ্বরের ও সর্ব্বজ্ঞত্ব অপ্রকাশিত থাকে। তিনি সর্ব্বজ্ঞ-পদ-বাচ্য হইতে পারেন না। সেইরূপ ঈশিতব্য বা শাসনযোগ্য বিশ্বপ্রপঞ্চ না থাকিলে,

† (১) কোন বস্তু জানিতে হইলেই সেই বস্তু কি, এবং সেই বস্তু কি নয়, উভয়ই জানিতে হয়। "Every act of knowledge is an act of distinction." দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যায় যে সাদা দেওয়ালের উপরে সাদা চুনের ফোঁটা কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু কাল বোর্ডে (Black-board) চুনের ফোঁটা সকলেই দেখিতে পায়। সাদার মধ্যে সাদা কেহ জানিতে পারে না, কিন্তু কালর মধ্যে সাদা সকলেই জানিতে পারে।

পরমেশ্বরের ও ঈশিতৃত্ব বা ঈশ্বরত্ব অপ্রকাশিত থাকে। তিনি ঈশ্বর-পদ-বাচ্য হইতে পারেন না। এই হেতু উপনিষদ্ বলিতেছে যে এই বিচিত্র জগৎসৃষ্টি ঈশ্বরের নিজেরই রূপ প্রকাশের জন্য। শক্তিরূপে (potentially) মায়া ঈশ্বরের স্বরূপভূত হইলেও, মায়ার কার্য্য এই বিশ্বপ্রপঞ্চ তাহার স্বরূপভূত বলা যায় না, কারণ প্রপঞ্চ অনিত্য এবং নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, ঈশ্বর নিত্য এবং অব্যয়। তবে প্রপঞ্চকে ঈশ্বরের উপাধি (accident) বলা যায়। "ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর মায়া দ্বারা—(প্রজ্ঞান দ্বারা বা নামরূপভূত তৎকৃত মিথ্যা অভিমান দ্বারা)—যদিও পারমার্থিকরূপে নয়—বহুরূপ ধারণ করিয়াছেন। বহুরূপ ধারণ অবিদ্যা-প্রজ্ঞান জনিত। পরমার্থতঃ তিনি একমাত্র প্রজ্ঞান-ঘনরূপেই আছেন।"*(২)

গৌড়পাদ তাঁহার সাংখ্য-কারিকাতে সাংখ্যপ্রধানকে বেদান্তের মায়ার সহিত মিলিত করিয়া শঙ্করের প্রতিপাদ্য উপনিষদগম্য অদ্বৈত ধর্ম্মেরই পথ পরিষ্কার করিলেন। গৌড়পাদ মাণ্ডূক্য উপনিষদেরও কারিকা রচনা করিয়াছেন। শঙ্কর গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দনাথেরই শিষ্য, এবং মাণ্ডূক্য উপনিষদের গৌড়পাদীয় করিকার ও ভাষ্যকার। গৌড়পাদ সাংখ্য এবং বেদান্তের মিলনের বীজ বপন করিয়াছিলেন। শঙ্করের হস্তে সেই বীজ বিকাশ লাভ করিল।

---

‡ (২) স এবহি পরমেশ্বরো নামরূপে ব্যাকুর্বাণো রূপং রূপং প্রতিরূপোবভূব। কিমর্থং। তদস্যাত্মনো রূপং পরিচক্ষণায় প্রতিখ্যাপনায়। যদি হি নাম নামরূপে ন ব্যাক্রিয়েতে তদা অস্য আত্মনো নিরুপাধিকং রূপং প্রজ্ঞানঘনাখ্যং ন প্রতিখ্যায়েত। যদা পুনঃ কার্য্যকরণাত্মনা নামরূপে ব্যাকৃতে ভবতঃ তদাস্য রূপং প্রতিখ্যায়েত। ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরো মায়াভিঃ প্রজ্ঞাভিঃ নামরূপভূত-তৎকৃত-মিথ্যাভিমানৈঃ বা ন তু পরমার্থতঃ। পুরুরূপো বহুরূপ ঈয়তে গম্যতে একরূপ এব প্রজ্ঞানঘনঃ সন্নবিদ্যাপ্রজ্ঞাভিঃ॥ ১৯। বৃহদারণ্যক ভাষ্য-অ-২। ব্রা-৫।

তিনি বিবেকচূড়ামণিতে মায়ার এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন: "মায়ার অপর নাম অব্যক্ত (Compare Potentiality), ইহা ত্রিগুণাত্মিকা, অনাদি অবিদ্যা-রূপিনী (Compare Relativity)। মায়া পরমেশ্বরেরই এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি-বিশেষ। মায়া দ্বারাই এই জগতের উৎপত্তি। জ্ঞানী ব্যক্তিকে মায়ার কার্য্য দৃষ্টে, মায়ার অস্তিত্ব অনুমান করিতে হয়।*(১) এইরূপে শঙ্কর তাহার অদ্বৈত মতে সেশ্বর-সাংখ্য এবং বেদান্ত যেন এক করিয়া ফেলিলেন। তিনি ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্য প্রকৃতিকে ঈশ্বরের মায়াশক্তির নামান্তর বলিয়াই উল্লেখ করিতেছেন, "অবিদ্যা-কল্পিত নাম-রূপাত্মক সংসার প্রপঞ্চের বীজভূত, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের মায়াশক্তিই প্রকৃতি, ইহা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের আত্মভূতের ন্যায়ই, কিন্তু ঈশ্বরই বলা যায় না, ঈশ্বর হইতে ভিন্নও বলা যায় না।"*(২) গীতা-ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন: "প্রকৃতিরীশ্বরস্য বিকার-কারণং শক্তিঃ গুণাত্মিকা মায়া॥" (১৯-অ-১৩॥) প্রকৃতি ঈশ্বরেরই গুণাত্মিকা মায়া-শক্তি, তাহাই বিকারের কারণ। আনন্দগিরি নামীয় শঙ্কর-বিজয়ে শঙ্কর বলিতেছেন; "সর্ব্বলোক-কর্ত্তা ব্রহ্ম, তাঁহার ইচ্ছারূপা প্রকৃতি দ্বারা মহদাদি ক্রমে জগৎ সৃষ্টিকরেন।"*(৩) এইরূপে মায়া বা প্রকৃতি ঈশ্বরেচ্ছাতেই পরিণত হইতেছে।

---

§ (১) অব্যক্তনাম্নী পরমেশ-শক্তি রনাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা। কার্য্যানুমেয়া সুধিয়ৈব মায়া যয়া জগৎ সর্ব্বমিদং প্রসূয়তে॥১১০॥

* (২) "সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য আত্মভূতে ইবাবিদ্যা-কল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যাং অনির্ব্বচনীয়ে সংসার-প্রপঞ্চবীজভূতে সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিঃ" সূত্র ১৪। পা-১।অ-২। ব্রহ্মসূত্র।

*(৩) "ব্রহ্মাখিলকর্ত্তা তদিচ্ছারূপয়া প্রকৃত্যা মহদাদিকারণং জগৎ অসৃজত।" প্রকরণ ২৯॥

পঞ্চম অধ্যায়।

শঙ্করের সিদ্ধান্ত ও বিচার।

২৫। শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত :—

(ক) শঙ্করের অদ্বৈত মত।

শঙ্করের বিচারগুলির প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে, তাহার অদ্বৈত দর্শন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এজন্যই আমরা সংক্ষেপে শঙ্করের অদ্বৈত মতের সারমর্ম্ম পাঠকের নিকটে উপস্থিত করিতেছি।

শঙ্করের মতে যাহা কিছু আছে, বা ছিল, বা হইবে, জ্ঞেয় (objects of consciousness) বা জ্ঞানের বিষয় রূপেই আছে, বা ছিল, বা হইবে। জ্ঞানের অবিষয় কোন অচেতন জ্ঞেয়বস্তু, কথাই বিরুদ্ধ। জড় এবং চেতনের পার্থক্য এই যে চেতন-বস্তু সকলকেই আপনার জ্ঞান-ক্রিয়ার বিষয় করে, জড় তাহা করিতে অক্ষম। চেতন স্বতঃই নিজেকে নিজে জানে, "সম্বিদেষা স্বয়ংপ্রভা", এবং নিজের কথা নিজে স্মরণ করে। জড়ের সে শক্তি নাই। শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই যে জ্ঞানেতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, জ্ঞানেতেই স্থিতি, জ্ঞানেতেই লয়। জ্ঞান জ্ঞাতারই উপাধি বা গুণকর্ম্মবিশেষ, এবং জ্ঞাতাতেই অভিন্ন ভাবে অবস্থিত। জ্ঞানের মধ্যে জ্ঞেয়, এবং জ্ঞাতার মধ্যে জ্ঞান, অতএব জ্ঞেয় এবং জ্ঞান, জ্ঞাতা হইতে অভিন্ন—"গুণগুণিনোরভেদাৎ।" বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বলিতেছেন :—"ইমানি ভূতানীদং সর্ব্বং য়দয়মাত্মা"—তাহার উপরে শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন :—"এই সমস্তই আত্মা, এ কথা কিরূপে বলা যায় ? যেহেতু সকলের মধ্যেই চিদাত্মা সঙ্গে সঙ্গেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, অতএব

সকলই চিৎস্বরূপ। যাহা পরিত্যাগ করিলে যাহার গ্রহণ অসম্ভব, তাহা তদাত্মকই।"* যথা, কনক-কুণ্ডলের কনক পরিত্যাগ করিলে, কুণ্ডলের গ্রহণ অসম্ভব, অতএব কুণ্ডল কনকাত্মক। আবার বলিতেছেন: "উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়কালে, প্রজ্ঞান ব্যতিরেকে অপর সমস্তেরই অসত্তা, অতএব সমস্তই প্রজ্ঞানরূপী ব্রহ্ম-স্বরূপ বা আত্ম-স্বরূপ।" ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিতেছেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি"—শঙ্কর তাহার উপরে তদীয় ভাষ্যে বলিতেছেন:—"নাম এবং রূপাদি দ্বারা ব্যাকৃত এই দৃশ্য জগৎ, যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা গ্রহণ করা যায়, তাহা ব্রহ্মই। এ সকলের ব্রহ্মত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কারণ তেজ, বারি, এবং অন্ন প্রভৃতি ক্রমে, এ সকল সেই ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয়। বিনাশকালে সেই জননক্রম অনুসারেই বিপরীতদিকে এ সকল সেই ব্রহ্মেতেই লয় প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মেতেই মিলিয়া যায়। আবার স্থিতিকালে সেই ব্রহ্মেতেই প্রাণ ধারণ করে। তিন কালেই এ সকলের ব্রহ্মাত্মতা একরূপ—ব্রহ্ম ব্যতিরেকে তাহাদের গ্রহণ অসম্ভব। অতএব এই জগৎ ব্রহ্মই।"† শঙ্করের মতে একই আত্মা সর্ব্বভূতে প্রকাশমান্। পাঠক তাঁহার হস্তামলক নামীয় দ্বাদশশ্লোকী কবিতাটি অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন। একই চুম্বক লৌহ-খণ্ডের উত্তর এবং দক্ষিণ দুইটি বিরুদ্ধ-ধর্ম্মশালী কেন্দ্রের ন্যায়, একই জ্ঞাতা বা আত্মার জ্ঞাতৃত্ব এবং জ্ঞেয়ত্ব দুইটি কেন্দ্র বা

---

* চিন্মাত্রানুগমাৎ সর্ব্বত্র চিৎস্বরূপতৈব। যৎস্বরূপব্যতিরেকেনা গ্রহণং যস্য, তস্য তদাত্মত্বমেব লোকে দৃষ্টং।" "উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়কালেষু প্রজ্ঞান-ব্যতিরেকেণাভাবাৎ প্রজ্ঞানং ব্রহ্মৈবাত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি॥"

† "ইদং জগন্নামরূপব্যাকৃতং প্রত্যক্ষাদিবিষয়ং ব্রহ্ম।" "ব্রহ্মাত্মতয়া ত্রিষু-কালেষু বিশিষ্টং তদ্ব্যতিরেকেনা গ্রহণাৎ। অতস্তদেবেদং জগৎ।"

দিক্ মাত্র। জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয়ের যোগই জ্ঞান। জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান বেদান্তে এই তিনটির মিলিত নাম 'ত্রিপুটী'। পঞ্চদশী বলিতেছেন "জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে ত্রিপুটীজন্য দ্বৈতভাবের অভাব হেতু, এক ভূমা পুরুষই ছিলেন। প্রলয়কালেও জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞান এই ত্রিপুটীভাব থাকিবে না।" ‡

শঙ্করের মতে আত্মা এক, এবং নাম রূপাদি সর্ব্ববিধ উপাধির অতীত, কেবল জ্ঞাতৃস্বরূপ। পাঠক, উপাধি শব্দটি বেদান্তে সচরাচরই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার অর্থ কি? "যাবৎকালমবস্থায়ী ভেদহেতু রুপাধিতা" (পঞ্চদশী)। "সাময়িক পরিবর্ত্তনশীল ভেদ-হেতুর নাম উপাধিতা।" যে ভেদ বা বিশেষত্ব বস্তুর স্বরূপভূত (Proprium) নয়, তাহাকেই উপাধি (Accident) বলা যায়,—যথা, লৌকিক ব্যবহার দৃষ্টে বলা যায় নেপালের মহারাজার মহারাজত্ব তাহার স্বরূপভূত (Proprium), কিন্তু পাথরিয়াঘাটার মহারাজার মহারাজত্ব তাহার উপাধি (Accident) মাত্র। সেইরূপে তোমার দেহ, যাহার জ্ঞান স্বপ্নকালে থাকে না, এবং তোমার মনবুদ্ধি, যাহার জ্ঞান সুষুপ্তিকালে থাকে না,—এ সকল তোমার উপাধি (Accident), কিন্তু তোমার চৈতন্য বা সাক্ষিস্বরূপত্ব যাহা জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই তিনকালেই সমান ভাবে বর্ত্তমান (কারণ সুষুপ্তির ও স্মৃতি থাকে), তাহাই তোমার আত্মার স্বরূপভূত (Proprium)। যাহা কিছু পরিচ্ছিন্নভাবে ধারণা করা যায়, তাহাই অনাত্মা বা আত্মার উপাধিমাত্র। এজন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে "স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে"---। শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন, সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা (উপাধি সকল পৃথক করিয়া) সক-

‡ ভূতোৎপত্তেঃ পুরা ভূমা ত্রিপুটীদ্বৈতবর্জ্জনাৎ। জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপা ত্রিপুটী প্রলয়ে হি নো॥ "১৪—পরিচ্ছেদ ১১। পঞ্চদশী॥ টীকা, "ত্রয়াণাং জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়-রূপাণাং পুটানাং আকারাণাং সমাহারস্ত্রিপুটী।"

লের ব্যক্তিগত আত্মা এক প্রত্যগাত্মস্বরূপে উপসংহৃত হইলে, দ্রষ্টার দ্রষ্টৃত্ব, ইহা নয়, উহা নয়, যাহা কিছু ধারণা করা যায় তাহা নয়, এইরূপে তুরীয় ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতেই পর্য্যবসিত হয়।"* বস্তুতঃ তুমি যদি তোমার আত্মাকে নামরূপগুণাদি সর্ব্ববিধ পরিচ্ছিন্ন এবং পরিবর্ত্তনশীল উপাধি হইতে "মুঞ্জাদিবেষিকাং"—মুঞ্জঘাস হইতে তাহার ইষিকার (Flower-stalk) ন্যায় পৃথক্ করিয়া দর্শন কর, তখন দেখিবে 'তোমার আত্মা', 'আমার 'আত্মা' ইত্যাদি ভেদ তিরোহিত হইয়া যায়। এজন্যই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে ঃ—"যে তুরীয় আত্মা ব্রহ্মাদি দেবগণ মধ্যে প্রকাশমান, তাহাই আবার পতঙ্গাদির মধ্যে ও প্রকাশমান।" শঙ্কর বৃহদারণ্যকভাষ্যে আত্মার নানাত্ববাদীদিগের আপত্তি বর্ণন করিতেছেন ঃ—"অনেকে বলেন যে ব্রহ্ম বা আত্মার একত্ব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বিরুদ্ধ। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদি সকলই পৃথকরূপেই প্রত্যক্ষ হইতেছে। অতএব ব্রহ্মৈকত্ববাদিরা প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ কথা বলিতেছে। আবার শ্রোত্রাদি দ্বারা শব্দাদির উপলব্ধি-কর্ত্তা, এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের কর্ত্তা ও প্রতিশরীরে ভিন্ন ভিন্ন সংসারী জীব বলিয়াই অনুমিত হয়, অতএব যাহারা এ সকলের মধ্যে এক ব্রহ্ম বা আত্মাই প্রকাশমান এরূপ বলিয়া থাকেন, তাহারা অনুমান-বিরুদ্ধ কথা বলেন"। শঙ্কর এই সকল আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন ঃ—"প্রত্যক্ষ অনুভূত শ্রোত্রাদিগম্য শব্দাদি দ্বারা ব্রহ্মের একত্ব কিরূপে অপ্রমাণিত হয়? শব্দাদির ভেদ দ্বারা কি আকাশের (বায়ুর বলিলেও ক্ষতি নাই—প্রাচীনদিগের মতে শব্দ আকাশের গুণ) একত্ব অপ্রমাণিত হয়? না, তাহা হয় না। তবে শব্দস্পর্শাদির ভেদ দ্বারা ব্রহ্মের ও একত্ব অপ্রমাণিত হয় না।

* "তং সর্ব্বাত্মানং প্রত্যগাত্মন্যুপসংহৃত্য দ্রষ্টুর্হি দ্রষ্টৃভাবং নেতিনেত্যাত্মানং তুরীয়ং প্রতিপদ্যতে।"

আর যে বলা হয় প্রতি শরীরে শব্দাদির উপলব্ধি-কর্ত্তা এবং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-কর্ত্তা সংসারী জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন এরূপ অনুমান হয়, অতএব ব্রহ্মৈকত্বে অনুমান বিরোধ,—তাহার উত্তরে জিজ্ঞাস্য এই, কে এই ভিন্নত্ব অনুমান করে? যদি বল আমরা সকলেই করি। তবে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা বলিতে কাহাকে লক্ষ্য কর? শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, আত্মা, ইহাদের প্রত্যেকে কি পৃথক্ পৃথক্ অনুমান করে? তাহা বলিবে না। বোধ হয় বলিবে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি সাধনযুক্ত আত্মা সকল অনুমান করিয়া থাকে, কারণ একটী ক্রিয়া অনেক কারক দ্বারা সাধিত হয়। অনুমান ও ত একটি ক্রিয়া। তবে তোমাদেরও ত অনেকত্ব প্রসঙ্গ হইল, কারণ 'আমরা' বলিতে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, এবং আত্মা অনেকগুলি বুঝায়। অহো! অপুচ্ছশৃঙ্গ তার্কিক বলীবর্দ্দদিগের কি অনুমান-কৌশল। যে আপনাকেই জানে না, সেই মূঢ় কিরূপে আত্মা সম্বন্ধীয় ভেদ বা অভেদ বুঝিতে পারিবে? সে কিই অনুমান করিবে, আর কি লিঙ্গ বা সাধন দ্বারাই অনুমান করিবে? আত্মার মধ্যে এমন কোন ভেদ প্রতিপাদক লিঙ্গ নাই, যে লিঙ্গ দ্বারা এক আত্মা হইতে অন্য আত্মার পৃথকত্ব সাধিত হইবে। নামরূপ প্রভৃতি যে সকল লিঙ্গ বা ব্যাবর্ত্তক গুণ অবলম্বন করিয়া সচরাচর আত্মভেদ সাধিত হয়, সেই সকল নামরূপাদি নিত্য আত্মার পরিবর্ত্তনশীল উপাধি মাত্র, আকাশের সম্বন্ধে ঘটকমণ্ডলু-ভুচ্ছিদ্র প্রভৃতি যেমন। আকাশের নিজের মধ্যে যেমন কোন ভেদলিঙ্গ নাই, আত্মার মধ্যেও সেইরূপ কোন ভেদলিঙ্গ নাই। যাহারা নিজের আত্মাকে অন্য আত্মা হইতে ভেদ করিয়া থাকে, তাহাদের শত তার্কিক মিলিয়া ও আত্মার ভেদ-লিঙ্গ দেখাইতে পারিবে না। আত্মা, ইন্দ্রিয়াদির অবিষয়, অতএব স্বতঃই তাহাতে ভেদ-লিঙ্গ দর্শন অসম্ভব। যাহা কিছু লোকে একজনে অন্য জনের আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া কল্পনা করে, তাহা নামরূপ প্রভৃতি উপাধি ভিন্ন আর কিছুই নয়।

আত্মা নিত্য, অতএব সেই সকল নামরূপাদি অনিত্য উপাধি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। নামরূপাদি উপাধিসকলের উৎপত্তি এবং প্রলয় আছে—ব্রহ্ম বা আত্মা তাহা হইতে অন্যরূপ। অতএব লিঙ্গাভাব হেতু আত্মভেদ যখন অনুমানের বিষয়ই নয়, তখন অনুমান বিরোধ কিরূপে হইতে পারে ?*

* "তথা প্রত্যক্ষাদিবিরোধমপি চোদয়ন্তি ব্রহ্মৈকত্বে। শব্দাদয়ঃ কিল শ্রোত্রাদিবিষয়া ভিন্নাঃ প্রত্যক্ষত উপলভ্যন্তে। ব্রহ্মৈকত্বং ব্রুবতাং প্রত্যক্ষবিরোধঃ [illegible]। তথা শ্রোত্রাদিভিঃ শব্দাদ্যুপলব্ধারঃ, কর্ত্তারশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ প্রতি[illegible]ভিন্না অনুমীয়ন্তে সংসারিণঃ। তত্র ব্রহ্মৈকত্বং ব্রুবতাং অনুমানবিরোধশ্চ।" আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন:—"কথং শ্রোত্রাদিদ্বারৈঃ শব্দাদিভিঃ প্রত্যক্ষত উপলভ্যমানৈর্ব্রহ্মণ একত্বং বিরুদ্ধ্যতে। কিং শব্দাদীনাং ভেদেন আকাশৈকত্বং বিরুদ্ধ্যতে। অথ ন বিরুদ্ধ্যতে। ন তর্হি প্রত্যক্ষবিরোধঃ। প্রতিশরীরং শব্দাদ্যুপলব্ধারো ধর্ম্মাধর্ম্ময়োশ্চ কর্ত্তারো ভিন্নাঃ কৈরনুমীয়ন্তে। সর্ব্বৈরস্মাভিঃ। কেযূয়মনুমানকুশলাঃ? শরীরেন্দ্রিয়মনআত্মসুচ প্রত্যেকং অনুমান-কৌশল-প্রত্যাখ্যানে, শরীরেন্দ্রিয়-মনঃ-সাধনা আত্মানোবয়মনুমানকুশলাঃ, অনেক-কারক-সাধ্যত্বাৎ ক্রিয়াণাং। ভবতামনেকত্ব-প্রসঙ্গঃ। অনুমানং চ ক্রিয়া। সা শরীরেন্দ্রিয়-মন-আত্ম-সাধনৈঃ কারকৈরাত্মকর্ত্তৃকানির্বর্ত্ত্যেত ইত্যেতং প্রতিজ্ঞাতং। তত্র বয়মনুমান-কুশলা ইত্যেবং বদদ্ভিঃ শরীরেন্দ্রিয়-মন-আত্মানঃ প্রত্যেকং বয়মনেক ইত্যভ্যুপগতং স্যাৎ। অহো নুমানকৌশলং দর্শিতং অপুচ্ছ-শৃঙ্গৈস্তার্কিকবলীবর্দ্দৈঃ। যো হ্যাত্মানমেব ন জানাতি স কথং মূঢ়স্তদগতং ভেদমভেদং বা জানীয়াৎ, তত্র কি মনুমিনোতি কেন বা লিঙ্গেণ। ন হ্যাত্মনঃ স্বতো ভেদপ্রতিপাদকং কিঞ্চিল্লিঙ্গমস্তি। যেন লিঙ্গেনাত্মভেদং সাধয়েৎ। যানি লিঙ্গান্যাত্মভেদ সাধনায় নাম-রূপবন্তি উপন্যস্যন্তি তানি নাম-রূপগতান্যুপাধয় এবাত্মনোঘটকূপচ্ছিদ্রাণীবাকাশস্য। যদাৎ পর আত্মধর্ম্মত্বেনাভ্যুপগচ্ছতি তস্য তস্য নামরূপাত্মকত্বাভ্যুপগমাৎ নামরূপাভ্যাঞ্চ আত্মনোঽন্যত্বাভ্যুপগমাৎ। উৎপত্তি-প্রলয়াত্মকে হি নাম রূপে তদ্বিলক্ষণঞ্চ ব্রহ্ম। অতোঽনুমানস্যৈব-অবিষয়ত্বাৎ কুতোঽনুমান-বিরোধঃ॥ চতুর্থস্য প্রথমং ব্রাহ্মণং। বৃহদারণ্যকভাষ্য।

এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে অদ্বৈতমত নানারূপ—শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, এবং দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদ বাদ। শঙ্কর নিজে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। তিনি তাঁহার সূত্রভাষ্যে তিন প্রকার অদ্বৈতবাদের উল্লেখ করিয়া নিজের মত প্রকাশ করিতেছেন, "আচার্য্য কাশকৃৎস্নের মতে পরমেশ্বরই অবিকৃতভাবে জীবরূপে অবস্থিত। ব্রহ্ম হইতে জীব কোনরূপ ভিন্ন নয়। আশ্মরথ্যের মতে ও পরমেশ্বরের সহিত জীবের অভিন্নত্ব সম্বন্ধই শ্রুতির অভিপ্রায়, কিন্তু শ্রুতিতে জীবকে ঈশ্বরের আশ্রিত বলা হইয়াছে, এবং এই প্রতিজ্ঞা-সিদ্ধির জন্য জীবেশ্বরের মধ্যে এক প্রকার কার্য্যকারণভাব ও শ্রুতির অভিপ্রেত। ঔডুলোমির মতে জীব এবং ঈশ্বরের অবস্থান্তর-সাপেক্ষ ভেদ এবং অভেদ স্পষ্টই দেখা যায়। এ সকল মতের মধ্যে কাশকৃৎস্নীয় মতই শ্রুত্যনুসারী জানা যায়, কারণ 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য যাহা প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছু, এইমত তাহারই অনুসারী।* শঙ্করের এই কথা দ্বারা ও দেখা যাইতেছে যে তিনি কাশকৃৎস্নের শুদ্ধাদ্বৈত মতেরই পক্ষপাতী।

(খ) আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ।

আত্মা বা ব্রহ্মের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? শঙ্কর নিজেই বলিতেছেন "অনুমানস্যৈবাবিষয়ত্বাৎ"—আত্মা অনুমানের বিষয় নয়।

---

* "কাশকৃৎস্নস্যাচার্য্যস্যাবিকৃতঃ পর এবেশ্বরো জীবো নান্য ইতি মতং। আশ্মরথ্যস্য তু যদ্যপি জীবস্য পরস্মাদনন্যত্বমভিপ্রেতং তথাপি প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেরিতি স্বাপেক্ষত্বাভিধানাৎ কার্য্যকারণভাবঃ কিয়ানপ্যভিপ্রেত ইতি গম্যতে। ঔডুলোমিপক্ষে পুনঃ স্পষ্টমেবাবস্থান্তরাপেক্ষৌ ভেদাভেদৌ গম্যেতে। তত্র কাশকৃৎস্নীয়ং মতং শ্রুত্যনুসারীতি গম্যতে প্রতিপিপাদয়িষিতার্থানুসারাৎ তত্ত্বমসীত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।" ব্রহ্মসূত্র—অ ১—পা ৪—সূ ২২॥

প্রাচ্য দার্শনিক বলিয়াছিলেন "আত্মা সংশয় করে, অতএব আছে" *Cogito ergo sum*)। প্রকৃত পক্ষে যদিও "আত্মা সংশয় করে, অতএব আত্মা আছে" ইত্যাদি বাক্য অনুমানের মতনই দেখায়, বস্তুতঃ তাহাতে ন্যায় যাহাকে অনুমান বলে, অর্থাৎ ধূম-লিঙ্গ দর্শনে অগ্নির অনুমানের ন্যায়, কোন লিঙ্গ-পরামর্শজন্য জ্ঞান নাই। "আত্মা সংশয় করে" এই কথার মধ্যেই 'আত্মা আছে,' এই কথাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এইরূপে পাশ্চাত্য দার্শনিকের উক্ত বাক্যে ও দেখা যায় আত্মার সত্তা সাক্ষাৎ অনুভূত, বা মাণ্ডূক্যোপনিষদুক্ত "একাত্ম প্রত্যয়সারং"—একমাত্র আত্ম প্রত্যয়েরই বিষয়। শঙ্করের মতে আত্মা অনুমান-গম্য নয়। শঙ্কর তাঁহার সূত্র-ভাষ্যে বলিতেছেন :— "ব্রহ্ম সকলের আত্মা, অতএব ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্যক্ সিদ্ধ। সকলেরই আপন অস্তিত্ব জ্ঞান আছে। "আমি নাই" এরূপ কেহ অনুভব করে না। 'আত্মা নাই' এ কথা সত্য হইলে, সকলেই অনুভব করিত 'আমি নাই।"* সুধু তাহা কেন,—"আমি নাই' এরূপ অনুভব করি," অতএব 'আমি আছি'; একথা বলাও অসঙ্গত নয়, কারণ আমি না থাকিলে 'আমি নাই' এরূপ অনুভব করিবে কে? জনকের সভায় উষস্ত চাক্রায়ণ যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন :— "লোকে যেরূপ চিহ্নিত করিয়া দেখায় এই গো, এই অশ্ব, এইরূপ করিয়াই দেখাইতে হয়। সর্ব্বান্তর্য্যামী আত্মা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ব্রহ্মকে এরূপ করিয়া দেখাও"। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "আমি ত বলিয়াছি তোমার যে আত্মা তাহাই সকলের আত্মা"। উষস্তি আবার বলিল "কোন্‌টি সকলের আত্মা? কোন্‌টি সকলের আত্মা আমাকে বিশেষ করিয়া দেখাও"। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন :—"দৃষ্টি-কার্য্যের দ্রষ্টাকে দৃষ্টিকার্য্য দ্বারা দর্শন

---

* সর্ব্বস্যাত্মত্বাচ্চ ব্রহ্মাস্তিত্ব-প্রসিদ্ধিঃ। সর্ব্বোহি আত্মাস্তিত্বং প্রত্যেতি, ন নাহমস্মীতি। যদি হি নাত্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বোলোকো নাহমস্মীতি প্রতীয়াৎ॥ সূত্র ভাষ্য অ১—পা১—সূ১॥

করা যায় না, শ্রবণ-কার্য্যের শ্রোতাকে শ্রবণ-কার্য্য দ্বারা শ্রবণ করা যায় না, মননকার্য্যের মন্তাকে মননকার্য্য দ্বারা মনন করা যায় না, বিজ্ঞান-কার্য্যের বিজ্ঞাতাকে বিজ্ঞানকার্য্য দ্বারা জানা যায় না। দ্রষ্টা-শ্রোতা প্রভৃতি দর্শন-শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্যের ভিত্তি স্বরূপ, নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী, অতএব দর্শন-শ্রবণাদির অতীত বা অবিষয়”। শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন; “উষস্তি যখন বলিলেন ঘটাদি কার্য্যের ন্যায় আত্মাকে আমাদের জ্ঞানের বিষয় করিয়া দেখাও। তাহা করা অসম্ভব জানিয়া যাজ্ঞবল্ক্য তাহা করিলেন না। অসম্ভব কেন? আত্মা-বস্তুর স্বভাবই ঐরূপ। কিরূপ? দৃষ্টি প্রভৃতি ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব। দৃষ্টি-ক্রিয়ার দ্রষ্টাই আত্মা। দৃষ্টিই দুই প্রকার; লৌকিকী এবং পারমার্থিকী। তন্মধ্যে লৌকিকী দৃষ্টি চক্ষুঃ-সংযুক্ত অন্তঃকরণ-বৃত্তি-বিশেষ (mental state)। সে দৃষ্টি করা যায়, তাহার আরম্ভ এবং শেষ আছে। আত্মার যে পরমার্থিকী দৃষ্টি তাহা অগ্নির উষ্ণত্ব, এবং প্রকাশকত্বের ন্যায়। তাহা দ্রষ্টার স্বরূপভূত, তাহার আরম্ভ ও নাই, শেষও নাই। ক্রিয়মান উপাধিভূত লৌকিকী দৃষ্টির সহিত সেই পারমার্থিকী দৃষ্টি সম্বন্ধ আছে। চক্ষু দ্বারা রূপ বিষয়ে যে লৌকিকী দৃষ্টি-ক্রিয়া করা হয়, তাহা সেই নিত্য পারমার্থিকী আত্মার দৃষ্টির সহিত সম্বন্ধ, তাহারই ছায়া-স্বরূপ। তাহা দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াই যেন জন্মে এবং বিনষ্ট হয়। দ্রষ্টার স্বকীয় পারমার্থিকী নিত্য-দৃষ্টি দ্বারা লৌকিকী দৃষ্টি ব্যাপ্ত। দ্রষ্টার কর্ম্মভূত সেই লৌকিকী দৃষ্টি দ্বারা দ্রষ্টাকে দেখা যায় না। দ্রষ্টার কর্ম্মভূত লৌকিকী দৃষ্টি রূপ-সম্বন্ধী, রূপেরই প্রকাশক। সেই লৌকিকী দৃষ্টির ব্যাপক, মনোবৃত্তি সকলের ব্যাপক, সর্ব্বগত আত্মাকে লৌকিকী দৃষ্টি ব্যাপন করিতে পারে না, এজন্যই বলা হইয়াছে যে সেই সর্ব্বগত, দৃষ্টি কার্য্যের দ্রষ্টাস্বরূপ আত্মাকে দর্শন করা যায় না। আত্ম বস্তুর স্বভাবই এইরূপ। এই কারণেই গবাদির ন্যায় আত্মা দেখান যায় না।”

আবার যাজ্ঞবল্ক্য জনককে উপদেশ করিতেছেনঃ—"পুরুষ বা আত্মা স্বয়ং-জ্যোতিঃ"*—অথবা স্বপ্রকাশ। তিনি বলিতেছেন, "আত্মা সুষুপ্তি কালে† যে দেখে না—তখন দেখিয়াও দেখে না (Subconscious)। দ্রষ্টার দৃষ্টির বিপরিলোপ হয় না, কারণ তাহা অবিনাশী। কিন্তু তাহার দ্বিতীয় কেহ নাই যাহাকে তাহা হইতে ভিন্নরূপে দেখিবে।" ঘ্রাণ, আস্বাদন, শ্রবণ, মনন, স্পর্শন, এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এই কথা। "সুষুপ্তি কালে আত্মা যে জানে না, তখন সে জানিয়াও জানে না (নতুবা সুষুপ্তির স্মৃতি কিরূপে সম্ভব হইবে?) বিজ্ঞাতার বিজ্ঞাতৃত্বের বিপরিলোপ হয় না, কারণ তাহা অবিনাশী। তাহার দ্বিতীয় কেহ নাই যাহাকে তাহা হইতে ভিন্নরূপে জানিবে।"‡ ইহার উপরে শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন, "স্বয়ং-জ্যোতিষ্ট্ব অর্থ এই যে চৈতন্য আত্মারই স্বভাব। অগ্নির উষ্ণত্বের ন্যায়, চৈতন্যই যদি আত্মার স্বভাব হয়, তবে সে এক হইয়াও কিরূপে আত্ম-স্বভাব পরিত্যাগ করে বা অচেতন হয়,—চৈতন্যাত্ম-স্বভাবতা এবং অজ্ঞানতা দুই বিরুদ্ধ? বাস্তব বিরোধ নাই। সুষুপ্তিকালেও যে দেখে না তাহা নয়। কিন্তু সুষুপ্তিকালে যে দেখে না, তাহা ত আমরা সকলেই জানি, কারণ চক্ষু মনাদি দর্শনের যে

---

* "অয়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি॥"১৪॥ব্রাহ্মণ ৩॥ অধ্যায় ৬। বৃহদারণ্যক

† "বিশেষ-বিজ্ঞানোপশম-লক্ষণং সুষুপ্তং"। সূত্রভাষ্য অ-৩ পা-২ সূ-৮॥

‡ যদ্বৈতন্ন পশ্যতি পশ্যন্বৈতন্ন পশ্যতি। নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ॥ নতু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎপশ্যেৎ ॥২৩॥ যদ্বৈতন্নবিজানাতি বিজানন্বৈ তন্ন বিজানাতি, নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ, নতু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ॥
৩০॥ ব্রাহ্মণ ৩॥ অধ্যায় ৬। বৃহদারণ্যক

‡ Compare "Substance of the soul unknowable" in Herbert Spencer's "Psychology."

সকল করণ (যন্ত্র) তাহারা কোন কার্য্য করে না। দর্শন-শ্রবণাদি-ইন্দ্রিয় কার্য্য করিলেই আমরা বলি 'দেখে' বা 'শোনে'। অতএব সুষুপ্তিতে দেখেশোনে না। তাহা নয়, দেখিয়া থাকে। কিরূপে? অগ্নির উষ্ণত্ব যতক্ষণ অগ্নি থাকে ততক্ষণ থাকে, আত্মার দৃষ্টিও সেইরূপ। আত্মা অবিনাশী, অতএব আত্মার দৃষ্টিও অবিনাশী। এ কথাও বিরুদ্ধ কারণ দৃষ্টি দ্রষ্টারই ক্রিয়া। দ্রষ্টা দৃষ্টি করে, অতএব দৃষ্টি কৃতক। সেই (কৃতক) দৃষ্টির বিনাশ হয় না, কিরূপে বলা যায়? সূর্য্যের প্রকাশকত্বের ন্যায়। আদিত্যাদি নিত্য-প্রকাশ স্বভাব হইয়া, যেমন তাহাদের নিজের স্বাভাবিক নিত্য-প্রকাশ দ্বারাই সকল বস্তু প্রকাশিত করে, সেইরূপ এই আত্মারও অবিপরিলুপ্ত-স্বভাব নিত্য-দৃষ্টি আছে বলিয়াই তাহাকে দ্রষ্টা বলা যায়। আদিত্যাদির প্রকাশয়িতৃত্ব যেমন তাহাদের অক্রিয়মান নিত্য স্বাভাবিক প্রকাশ হইতেই উৎপন্ন, সেইরূপই দ্রষ্টার দৃষ্টি ও তাঁহার অবিপরিলুপ্ত-দৃষ্টি হইতে উৎপন্ন। ইহাতে বিরুদ্ধ কিছুই নাই। স্বপ্নকালে চক্ষুরাদি উপরত হইলেও আত্মার দৃষ্টির অবিপরিলোপ দেখা যায়। অবিপরিলুপ্ত-দৃষ্টি বা স্বয়ং-জ্যোতিঃ-স্বভাব হেতু সুষুপ্তিকালেও আত্মা দেখে। তবে দেখে না, বলা হয় কেন? দৃষ্টি ক্রিয়ার বিষয়ীভূত, দ্রষ্টা হইতে পৃথক্‌রূপে বিভক্ত অন্য দৃষ্টির বিষয় কিছুই নাই, যাহাকে দেখিবে। পরিচ্ছিন্ন-দ্রষ্টার বিশেষ-দর্শনের জন্য পৃথক্‌রূপে করণ সকল স্থাপিত আছে। করণ সকলের অভাবে বিশেষ-দর্শন হয় না। বিশেষ-দর্শন করণেরই কার্য্য, কেবল আত্মার কার্য্য নয়। তবে আত্মার কার্য্যের ন্যায়ই দেখায়।"

অনুমানাদি দ্বারা আত্মার সত্তা প্রতিপন্ন করা সম্বন্ধে মহর্ষি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর শঙ্করের একটি উক্তির উল্লেখ করিতেছেন :—
"মানং প্রবোধয়ন্তং মানং যে মানেন বুভুৎসন্তে। এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহাসুধিয়ঃ।" "প্রমাণ ক্রিয়াতে বল সঞ্চার করে

যে সাক্ষাৎ-জ্ঞান, সেই সাক্ষাৎ-জ্ঞানকে যাহারা প্রমাণ দ্বারা আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করেন,—সেই সকল মহাপণ্ডিতেরা ইচ্ছা করেন কি ? না, ইন্ধন কাষ্ঠে দাহিকা শক্তি সঞ্চার করে যে অগ্নি, সেই অগ্নিকে ইন্ধন কাষ্ঠ দ্বারা দগ্ধ করিতে।”

(গ)। ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে শ্রুতি-স্মৃতি, প্রত্যক্ষ, এবং অনুমানাদির প্রামাণ্য বিচার।

অপরদিকে আত্মা বা ব্রহ্ম যদি স্বপ্রকাশই হয়, এবং আত্ম-প্রত্যয় দ্বারাই যদি আত্মা বা ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, তবে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য শাস্ত্রাদির আলোচনায় প্রয়োজন কি ? শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যের প্রথম সূত্রেই বলিতেছেন :—“ব্রহ্ম যদি আত্মারূপে লোক-প্রসিদ্ধই হয়, তবে তাহাত সকলেরই জানা আছে। অতএব ব্রহ্ম লোকের জিজ্ঞাসার অযোগ্য। তাহা নয়, তাহার বিশেষত্ব সম্বন্ধে লোকের মধ্যে অসংখ্য বিরুদ্ধ মত রহিয়াছে। যথা, অশাস্ত্রজ্ঞ লোক এবং লোকায়তিকেরা (চার্ব্বাক্) বলে যে ‘চৈতন্যযুক্ত দেহমাত্রই আত্মা।’ বেদবিরোধিরা কেহ বলে ‘চেতনাযুক্ত ইন্দ্রিয়-সমষ্টিই আত্মা’। কেহ বলে, ‘মনই আত্মা’। কেহ বলে, ‘ক্ষণিক-বিজ্ঞান-মাত্রই আত্মা।’ কেহ বলে, ‘শূন্যই আত্মা’। কেহ (নৈয়ায়িকাদি) বলে, ‘আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন, সংসারী, কর্ত্তা, এবং ভোক্তা’। কেহ (সাংখ্য) বলে, ‘আত্মা কেবল ভোক্তাই, কর্ত্তা নয়’। কেহ (যোগমত) বলে, ‘আত্মা হইতে ভিন্ন সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ব-শক্তিমান্ ঈশ্বর আছেন।’ কেহ (বেদান্তী) বলে, ‘ভোক্তার আত্মাই ঈশ্বর।’ এইরূপে নানা প্রকার ভ্রম-সঙ্কুল যুক্তি এবং শাস্ত্রবাক্য আশ্রয় করিয়া লোকে আত্মা সম্বন্ধে অসংখ্য বিরুদ্ধ মত পোষণ করিতেছে। বিনা বিচারে এসকল বিরুদ্ধ মতের যে

কোন একটা আশ্রয় করিলে পরমার্থ-হানি এবং অনর্থ-প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী।"

শঙ্করের মতে শাস্ত্র প্রামাণ দ্বারা বিশেষতঃ বেদান্ত-বাক্যের আলোচনা দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়ঃ—"শাস্ত্রাদেব প্রমাণাৎ জগতো জন্মাদি-কারণং ব্রহ্মাধিগম্যতে।" তিনি এতৎ সম্বন্ধে শ্রুতি-প্রমাণ উল্লেখ করিতেছেন:—"নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং"—"অবেদবিৎ ব্রহ্ম মননে অসমর্থ"—(সূত্রভাষ্য-অ-২-পা-১-সূ-৩)। তাঁহার মতে বেদ অপৌরুষেয়—অতএব স্ববিষয়ে তাহার প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ। তিনি বলিতেছেন:—"নিজের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে বেদের প্রামাণ্য প্রমাণান্তর নিরপেক্ষ, যেমন রূপ-প্রকাশ বিষয়ে সূর্য্যালোক আলোকান্তর-নিরপেক্ষ। স্মৃতি-প্রভৃতি পুরুষ-বচন শ্রুতি-প্রভৃতি মূলান্তরের অপেক্ষা করে। স্বীয় প্রতিপাদ্য বিষয়ে তাহাদের প্রামাণ্য বক্তার স্মৃতি সাপেক্ষ। এজন্যই স্মৃতি-প্রমাণের দুর্ব্বলতা। বেদবিরুদ্ধ বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণের কোন স্থান নাই, একথা বলাতে কোন দোষ হয় না।" (ব্রহ্মসূত্র-অ-২। পা-১।সূ১)। তিনি পুনরায় বলিতেছেন: —প্রতিপাদ্য বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ, অতএব প্রত্যক্ষ। প্রতিপাদ্য বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণান্তর সাপেক্ষ, অতএব অনুমান মাত্র।' তবে "জন-সাধারণের জ্ঞান পরের অধীন। তাহারা স্বাধীনভাবে শ্রুতির অর্থ অবধারণে অক্ষম। এজন্য তাহারা বিখ্যাত প্রণেতাদিকৃত স্মৃতিকে আশ্রয় করে, এবং তদ্বলেই শ্রুতির অর্থ নির্ণয় করে। আমরা নিজে যদি শ্রুতির কোন ব্যাখ্যা করি, তাহা বিশ্বাস করিবে না,—কারণ স্মৃতি-প্রণেতাদিগের প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। এজন্য স্মৃতি অনুসারেই বেদের ব্যাখ্যা করিতে হয়।" কিন্তু স্মৃতিসকলের মধ্যে পরস্পর বিরোধ রহিয়াছেঃ—যথা, কপিল ঈশ্বর-কারণ-বাদে আপত্তি করিতেছেন, এবং ভগবদ্গীতা প্রভৃতি অনেক স্মৃতি ঈশ্বরকেই জগতের কারণ

এবং উপাদান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অন্য দিকে দেখা যায়, ঈশ্বর-কারণ-বাদই শ্রুতির তাৎপর্য্য। স্মৃতি সকলের মধ্যে যখন এবিষয়ে পরস্পর বিরোধ, তখন আমরা স্মৃতি-বিশেষের মত পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্মৃতি-বিশেষের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য। এরূপ বিরোধ স্থলে শ্রুতির অনুসারী স্মৃতি সকলই প্রমাণ, এবং অন্য গুলি অগ্রাহ্য। এজন্য প্রমাণ-লক্ষণে জৈমিনি বলিতেছেনঃ—"বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানমিতি।" (সূত্র ভাষ্য-অ-২।পা-১।সূত্র-১।) ইহার অর্থ এইঃ—"শ্রুতির সহিত বিরোধ দৃষ্ট হইলে স্মৃতির প্রামাণ্য আদর-যোগ্য নয়। কিন্তু শ্রুতির সহিত বিরোধ না থাকিলে, মূল শ্রুতির তাৎপর্য্যের অনুমাপক রূপে স্মৃতি ও প্রমাণরূপে গণ্য।"

অনুমানাদি অন্যান্য, প্রমাণ সম্বন্ধে শঙ্কর তাহার সূত্র-ভাষ্যে বলিতেছেনঃ—"ব্রহ্ম-সূত্রের উদ্দেশ্য বেদান্ত-বাক্যরূপ কুসুম সকল একত্র গ্রথিত করা। এজন্যই বেদান্ত-সূত্রে বেদান্তবাক্য সকলের উল্লেখ করিয়া তাহার তাৎপর্য্য বিচার করা হইয়াছে। অর্থ-বিচারণা পূর্ব্বক নিশ্চিতরূপে বেদান্ত-বাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয় দ্বারা ব্রহ্মাবগতি সাধিত হয়। অনুমানাদি প্রমাণান্তর দ্বারা ব্রহ্মাবগতি সাধিত হয় না। তবে জগতের জন্মাদির কারণবাদী বেদান্ত-বাক্য সকল রহিয়াছে। সেই সকল শ্রুতিবাক্যকে ভিত্তি করিয়া তাহার অর্থ সম্বন্ধে সংশয়-নিবৃত্তি, এবং নিশ্চয়তা সাধন দ্বারা বেদান্ত-বাক্যের অর্থজ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য অনুমান ও বেদান্ত-বাক্যের অবিরোধী প্রমাণ, অতএব অনুমান নিষিদ্ধ নয়। শ্রুতি স্বয়ংই তর্ক করিতে উপদেশ দিতেছে; যথা, "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ।" "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ইত্যাদি। পুরুষ-বুদ্ধি যে আত্মজ্ঞানের সহায়, তাহা শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। ধর্ম্ম বা বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদির জ্ঞান লাভ বিষয়ে যেমন শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ বিষয়ে সেই রূপ নয়। ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে শ্রুতি এবং অনুভবাদি যেখানে যাহা সম্ভব, উভয়ই

প্রমাণ। যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞান ভূতবস্তু বিষয়ক, এবং অনুভবই তাহার একমাত্র লক্ষ্য"। তিনি আবার বলিতেছেনঃ—"কোন বস্তু সম্বন্ধে, "ইহা এইরূপ" এবং "এইরূপ নয়" অথবা 'ইহা আছে' এবং 'ইহা নাই' যুগপৎ এইরূপ বিকল্পনা বা বিরুদ্ধ কল্পনা সম্ভব নয় (Lawof cóntradiction)। কোন বস্তু-বিষয়ক ঈদৃশ বিকল্পনা লোক-বুদ্ধি সাপেক্ষ, কিন্তু সেই বস্তুবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান লোকবুদ্ধি সাপেক্ষ নয়। তবে কি? তাহা বস্তু-তন্ত্র, অর্থাৎ বস্তুর উপরেই নির্ভর করে। একটা খোঁটা (স্থানু) দৃষ্টে, যদি একজন মনে করে "ইহা হয় একটি খোঁটা, না হয় একজন মানুষ, না হয় অন্য কিছু" তবে এরূপ সংশয়-যুক্ত জ্ঞান লোক-বুদ্ধি সাপেক্ষ। তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলা যায় না। খোঁটা দেখিয়া তাহাকে মানুষ অথবা অন্য কিছু জ্ঞান করা মিথ্যা জ্ঞান। "ইহা একটি খোঁটাই" এই জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, এবং তাহা বস্তু-তন্ত্র। এইরূপে ভূতবস্তু-বিষয়ক জ্ঞানের প্রামাণ্য বস্তুর অধীন। অপরাপর সকল বস্তু সম্বন্ধেই এরূপ। ব্রহ্মজ্ঞান ও ভূতবস্তু-বিষয়ক-জ্ঞান, অতএব ব্রহ্মজ্ঞান ও বস্তু-তন্ত্র।" তখন এরূপ কেহ আপত্তি করিতে পারেনঃ—"ব্রহ্মজ্ঞান যদি বস্তু-তন্ত্র ভূতবস্তু-বিষয়ক জ্ঞান হয়, তবে তাহা প্রত্যক্ষানুমানাদি প্রমাণান্তরেরই বিষয়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য বেদান্ত-বাক্যের তাৎপর্য্য বিচার নিষ্প্রয়োজন।" "তাহা নয়। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞানের বিষয় নয়, অতএব ইন্দ্রিয় দ্বারা সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। স্বভাবতঃই ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে, ব্রহ্ম সম্বন্ধে নয়। ব্রহ্ম যদি ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় হইত, তবে একটি কার্য্য দেখিলেই উপলব্ধি হইত "এই কার্য্য ব্রহ্মের সহিত সম্বদ্ধ"। কিন্তু ইন্দ্রিয় সকল স্থূল কার্য্য-মাত্র গ্রহণেই সক্ষম। সেই কার্য্যের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ কি অন্য কাহার ও সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহা নির্ণয় করা যায় না। এজন্যই "জন্মাদ্যস্য যত" এই সূত্র কোন অনুমানকে লক্ষ্য করে না,

কিন্তু "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্যকেই লক্ষ্য করে।"

যদি ও শঙ্কর অনুমান অথবা তর্ককে ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করেন না, তথাপি তিনি অনুমান বা তর্ককে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বিশেষ সহায় বলিয়া স্বীকার করেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের ন্যায় তিনি ও বিশ্ব-রচনার কৌশল দৃষ্টে, স্রষ্টার জ্ঞানময় চৈতন্য-স্বরূপের অনুমান করিতেছেন (Teleology)। "রচনানুপপত্তেশ্চানুমানং" (ব্রহ্মসূত্র-অ-২।পা-১।সূ-১)। এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেনঃ—"সাংখ্যেরা তর্ক করিয়া থাকেন, সংসারে ঘট এবং শরাবাদির মৃদাত্মতার আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে তাহাদের রূপাদি-ভেদের নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী সাধারণ বস্তু মৃত্তিকা। সেইরূপে সংসারে বাহ্য এবং আধ্যাত্মিক যত প্রকার বস্তু-ভেদ আছে—তাহাদের সকলের সাধারণ ধর্ম্ম—সুখ, দুঃখ, এবং মোহাত্মকতার আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাদের ও নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী সাধারণ বস্তু সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক ত্রিগুণ 'প্রধান।' মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্তেই অনুমিত হয় যে তাহা স্বয়ং অচেতন হইয়া, চেতন জীবের পুরুষার্থ সাধনে প্রবৃত্ত।" সাংখ্যদিগের এই কথার উত্তরে শঙ্কর বলিতেছেন, "দৃষ্টান্ত বলে স্থির করিতে হইলে দেখা যায়—কুলাল বা কুম্ভকারাদি চেতন পুরুষ দ্বারা অধিষ্ঠিত না হইলে, অচেতন মৃত্তিকাদি পুরুষার্থ-সাধন-যোগ্য কোন পৃথক্ বস্তু-বিশেষ (বিকার) রচনা করে না। সংসারে দেখা যায়—গৃহ, প্রাসাদ, শয্যা, আসন, এবং বিহার-ভূমি প্রভৃতি সকলই প্রজ্ঞাবান্ শিল্পি দ্বারা সময়োচিত সুখ-প্রাপ্তি, এবং দুঃখ-পরিহারের উপযোগিতানুসারে রচিত হয়। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও দেখা যায় নানাকর্ম্মফল ভোগের উপযোগী। এই পৃথিব্যাদি বাহ্য এবং আধ্যাত্মিক পদার্থ সকল, এবং নানাজাতীয় শরীরাদি, সকলই যথাস্থানে সন্নিবেশিত বিবিধ অবয়বযুক্ত,—নানাবিধ কর্ম্মফল

ভোগের উপযোগী। এই দৃশ্য জগৎ-রচনা যাহা অতি বিখ্যাত-প্রজ্ঞাবান্ শিল্পীর ও কল্পনার অগোচর, অচেতন 'প্রধান' দ্বারা কিরূপে তাহা সম্ভব হইবে ? অচেতন লোষ্ট্র-পাষাণাদিতে কখনও এরূপ রচনা কৌশল দৃষ্ট হয় না। কুম্ভকারাদি প্রজ্ঞাবান্ শিল্পীদ্বারা অধিষ্ঠিত হইলেই মাত্র সাঙ্খ্য কথিত মৃত্তিকাদিতে বিশিষ্ট-আকার-যুক্ত রচনা দৃষ্ট হয়। অতএব সাঙ্খ্যোক্ত দৃষ্টান্ত অনুসারেই অচেতন 'প্রধানের' উপরে চেতন অধিষ্ঠাতা বা ঈশ্বরের প্রয়োজন হয়। এইরূপ বিচার শ্রুতির বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, বরং শ্রুতির অনুকুল। কারণ এইরূপ বিচার দ্বারা (Argument from design and adaptation) জগতের কারণ চৈতন্যময় পুরুষ বা ঈশ্বর বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। এজন্যই সূত্র করা হইয়াছে :—"জগৎ রচনা অসম্ভব, অতএব জগৎকারণ অচেতন 'প্রধান,' এরূপ অনুমান করা যায় না"।

তবে শঙ্করের মতে অনুমানাদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায় মাত্র। শুধু তর্কমাত্র অবলম্বন করিয়া প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। "নৈষা তর্কেন মতির আপনেয়া," "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"। তিনি বলিতেছেন :—"লৌকিক মণি-মন্ত্র-ঔষধাদির মধ্যে ও দেশ কালের বৈচিত্র অনুসারে পরস্পর-বিরুদ্ধ অনেক প্রকার কার্য্য-সাধক শক্তি দৃষ্ট হয়। বিনা উপদেশে কেবল তর্কমাত্র অবলম্বন করিয়া জানিতে পারা যায় না, যে এসকলের মধ্যে এই বস্তুর শক্তি এই পরিমাণ, অমুক বস্তুর সাহচর্য্যে, অমুক বিষয়ে, বা অমুক প্রয়োজন সাধনের জন্য তাহার শক্তি প্রকাশ হয়। অতি সামান্য বিষয় সম্বন্ধেই যখন এরূপ, তখন অচিন্ত্য-প্রভাবশালী ব্রহ্মের স্বরূপাদি শ্রুতির উপদেশের সাহায্য ভিন্ন জানা যায় না, তাহা আর বিচিত্র কি ? এই সকল কারণে শঙ্কর বলিতেছেন—"শ্রুতি বাক্যই ব্রহ্মজ্ঞানের মূল, শ্রুতিবাক্যই ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রমাণ। ইন্দ্রিয়াদি ব্রহ্ম

সম্বন্ধে প্রমাণ নয়। অতএব শ্রুতি যেরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে বলে, সেই রূপেই লাভ করিতে হইবে। অ-২। পা-১। সূ-২৭॥

আমরা দেখিতেছি যে শঙ্করের মতে শ্রুতি "অপৌরুষেয়," "স্ববিষয়ে স্বতঃসিদ্ধ" প্রমাণ, বা "প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ," এবং "প্রত্যক্ষ" স্থানীয়। শ্রুতির সংজ্ঞা কি? শতাধিক উপনিষদ্ আছে—সকলই কি শ্রুতি? অথচ শঙ্কর সে সকলের মধ্যে বারখানা মাত্র প্রমাণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। এরূপ কেন? শ্রুতির "স্ববিষয়ের" বিস্তারই বা কতদূর? শ্রুতি অপৌরুষেয়, স্বতঃসিদ্ধ ইত্যাদি বিশেষণ-যোগ্য কেন? স্ববিষয় সম্বন্ধে যদি শ্রুতি স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যক্ষবৎ হইল, তবে বিষয়ান্তর সম্বন্ধে সেরূপ নয় কেন? শ্রুতিকে প্রত্যক্ষবৎ বলিয়া আবার তাহাকে শব্দ প্রমাণের মধ্যে গণ্য করার অর্থ কি? শ্রুতি যদি প্রত্যক্ষ বা স্বতঃসিদ্ধই হইবে, তবে বৌদ্ধগণ বেদ-বিরোধী হয় কেন? চার্ব্বাক্ বেদকর্ত্তাদিগকে ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচর বলিবার কারণ কি? শঙ্কর এই সকল প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছেন না। বোধ হয় যেন তিনি অনিচ্ছুক। তিনি বলিতেছেন "জনসাধারণের জ্ঞান পরের অধীন"। বিনাবিচারে শ্রুতির স্বতঃসিদ্ধত্বাদি স্বীকার করাতে, তাঁহার নিজের প্রতিও কি কতক পরিমাণে সে দোষ আরোপ হইতে পারে না? শ্রুতি নিজেকে 'অপৌরুষেয়' বা 'স্বতঃসিদ্ধ' বলিতেছেন, এমন শ্রুতি-প্রমাণের ও শঙ্কর উল্লেখ করিতেছেন না। ঋগ্বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যের ভূমিকায় বেদের স্বতঃসিদ্ধত্বের আলোচনা করিতে গিয়া বেদের 'স্বতঃপ্রামাণ্যের' বিরুদ্ধে একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেনঃ—"অতি সুশিক্ষিত নট ও নিজের স্কন্ধে নিজে আরোহণ করিতে পারে না।" শ্রুতির প্রামাণ্য-বিচার করিতে গেলেই তর্ক বা অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। শ্রুতির পবিত্রক্ষেত্রে উদ্দাম তর্ককে একবার প্রবেশ করিতে দিলে কি আর রক্ষা আছে? তর্কের স্রোতে পড়িয়া মানব সমাজ কোন্

অপরিজ্ঞাত অন্ধকার গহ্বরে পতিত হইবে, কে বলিবে? হয়ত বেদের প্রামাণ্যের বিচার করিতে গেলে, বেদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হইবে, হয়ত চার্ব্বাকের সঙ্গে মিলিয়া সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিবে—"ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারঃ ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচরাঃ"। বিচারে হয়ত বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করা অসাধ্য হইতে পারে। তাহার ফলে হয়ত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম সমূলে উন্মূলিত হইয়া গিয়া, হৈতুক বৌদ্ধ-মত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে, বা চার্ব্বাকের প্রাদুর্ভাবে বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ লুপ্ত হইয়া যাইবে। "ন বুদ্ধি-ভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্ম-সঙ্গিনাং" 'অজ্ঞানী কর্ম্মাসক্তদিগের মনে সংশয় উৎপাদন করিবে না,' গীতার এই নিষেধ-বচন কোনরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত না হইয়া সর্ব্বত্র প্রযোজ্য হইলে, তাহা সত্যের বিভীষিকা-ব্যঞ্জক, অথবা-মানব প্রকৃতির এবং সত্যের প্রতি আস্থা-বিশ্বাসের অভাব-ব্যঞ্জক কি না, পাঠক চিন্তা করিবেন। অপরদিকে শ্রুতির স্বতঃসিদ্ধত্ববিষয়ে তর্ক উত্থাপন করিতে না দিলে পরিণামে "সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো" দাঁড়ায়। আরিষ্টটল্ বলিয়াছিলেন——"তর্ক করা যদি ভাল হয়, তবে তর্ক করিতেই হইবে, আর তর্ক করা যদি ভাল না হয়, তবেও তর্ক দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। অতএব উভয়থা তর্ক করিতেই হইবে।" ইহা অতি দুঃখের বিষয় যে শঙ্করের মতন সিদ্ধ হস্ত তার্কিক ও শ্রুতির প্রামাণ্য-বিষয়ক তর্কের বিভীষিকা পরি-ত্যাগ করিয়া নির্ম্মুক্ত ভাবে বিচার দ্বারা বৌদ্ধ এবং চার্ব্বাক্ মত খণ্ডন করিয়া শ্রুতির স্বতঃসিদ্ধত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। একথা সত্য যে 'তর্ক' বলিতে আমরা সচরাচর জিগীষামূলক কুতর্কই বুঝিয়া থাকি, ন্যায় যাহাকে 'বিতণ্ডা' এবং 'জল্প' নামে অভিহিত করিয়াছে। বস্তুতঃ সত্যানুরাগ প্রণোদিত জিগীষাশূণ্য তর্ক বা বিচার, ন্যায় যাহাকে 'বাদ' নামে অভিহিত করিয়াছে, তাহাই আমাদের জীবনের পথ প্রদর্শক প্রদীপ স্বরূপ। বিভীষিকা দর্শনে সেই বাদ-

কথার গতি রোধ করা আর মানব সমাজের জীবন প্রবাহ রোধ করিয়া মৃত্যুর দ্বার উন্মুক্ত করা এক কথা। শঙ্কর নিজেই দুঃখ করিতেছেন যে "জনসাধারণের জ্ঞান পরের অধীন। তাহারা স্বাধীনভাবে শ্রুতির অর্থ অবধারণে অক্ষম। এজন্য তাহারা বিখ্যাত প্রণেতাদিকৃত স্মৃতিকে আশ্রয় করে, এবং তদ্বলেই শ্রুতির অর্থ নির্ণয় করে। আমরা নিজে যদি শ্রুতির কোন ব্যাখ্যা করি তাহা বিশ্বাস করিবে না।" স্বাধীন চিন্তার অভাবই লোক-সমাজের রোগ। কোন রূপ বিভীষিকার ভয়ে লোকের স্বাধীন চিন্তার দ্বার রুদ্ধ করিলে, লোকের জ্ঞান যে আরও অধিকতর পরাধীন হইয়া পড়িবে! স্বাধীনভাবে তর্ককরা, এবং সকলকে তর্ক করিতে দেওয়াই সেই পরাধীনতা মোচনের একমাত্র উপায়। সত্যই মানবের একমাত্র লক্ষ্য। "লোকে বিশ্বাস করিবে না" এই ভয়ে সত্য যাহা বুঝিয়াছ তাহা গোপন করা, অথবা "স্মৃতি প্রণেতাদিগের প্রতি লোকের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা," অতএব সত্য হউক আর না হউক "স্মৃতি অনুসারে বেদের ব্যাখ্যা করিতে হয়"— এরূপ কথা বলা শঙ্করের পক্ষে শোভা পায় না। তাহাতে সত্যেরপ্রতি সমুচিত আস্থা প্রদর্শন করা হয় না। সে যাহা হউক তর্কের উদ্দেশ্য সত্য নির্দ্ধারণ, তর্কদ্বারা সত্যপথ স্থির করিয়া সেই পথে চলিতে হয়। তর্কে ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু সেই ভ্রম ও তর্ক দ্বারাই সংশোধন হয়, কোনরূপ কল্পিত বিভীষিকা বা লোক-বুদ্ধির প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন দ্বারা নয়। সত্য-পথের জ্ঞান-লাভ হইলেই তর্কের প্রয়োজন সিদ্ধ হইল। সে পথে চলা না চলা মানবের প্রযত্ন এবং পুরুষকার সাপেক্ষ। তর্ক পুরুষকারের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। গম্য পথ জানিয়া ও অনেকে সে পথে চলে না, বা বিপথে চলে, বা বিতণ্ডা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করে। কিন্তু সে দোষের জন্য বাদ বা তর্ক দায়ী হইতে পারে না। আমেরিকা যাত্রী তর্ক দ্বারাই তাহার গম্যপথ নির্ণয় করিবে, কিন্তু তর্ক তাহাকে আমেরিকা

লইয়া যাইবে না। আমেরিকা গমন পুরুষকার এবং প্রযত্ন সাপেক্ষ। নির্ম্মুক্তভাবে সত্যের জন্যই সত্য-নির্দ্ধারণ মানসে তর্ক করিলে যদি বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বা স্বতঃসিদ্ধত্ব চলিয়া যায় যাউক। ভয় কি? বরং তাহাতে সত্যের পথই কণ্টকমুক্ত হইবে। সত্যই মানবাত্মার অন্নজল। শ্রুতি স্বয়ংই সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া, সত্য-জিজ্ঞাসুকে উৎসাহিত করিতেছে:—"সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ। যেনা ক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা, যত্র তৎসত্যস্য পরমং নিধানং" ॥ মুণ্ডক ॥ 'সত্যেরই জয় মিথ্যার নয়—সত্যের ভিত্তিতেই দেবলোকের পথ প্রতিষ্ঠিত, যে পথ আশ্রয় করিয়া পূর্ণকাম ঋষিগণ সত্যের পরমাশ্রয় সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।" তর্কদ্বারা শ্রুতির প্রামাণ্য সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত না করিয়া, ব্রহ্ম-জ্ঞান শ্রুতি-মূলক, শঙ্করের এই সিদ্ধান্ত দোষশূণ্য হইতে পারে না। জরা-সন্ধের দেহ-সন্ধির ন্যায় ইহাতেই শঙ্করের দার্শনিক সিদ্ধান্তের দুর্ব্বলতা।

(ঘ) শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার বিচার।

যদিও শঙ্করাচর্য্য বিচারে অনেকস্থলে উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তথাপি একথা আমরা বলিতে বাধ্য, যে কোন কোন বিষয়ের আলো-চনায় তিনি উদারতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। যে সকল স্থলে নির্ম্মুক্তভাবে বিচার করিলে আবহমান কালের বদ্ধমূল সংস্কারের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত করিতে হয়, সেই সকল স্থলে প্রায়ই তিনি প্রচলিত সংস্কারের পৃষ্ঠ-পোষণ করিয়াছেন।

শঙ্করের মতে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ শ্রুতি-মূলক। সমাজের প্রচলিত সংস্কার এই যে স্ত্রী-শূদ্রাদি বেদ-পাঠে অনধিকারী। এখন প্রশ্ন এই, ব্রহ্মজ্ঞান-লাভে স্ত্রী-শূদ্রাদির অধিকার আছে কি নাই? ব্রহ্মজ্ঞানে স্ত্রীজাতির অধিকার সম্বন্ধে গার্গী, মৈত্রেয়ী, সুলভা প্রভৃতি প্রসিদ্ধা

ব্রহ্মবাদিনীগণই জ্বলন্ত নিদর্শন। এজন্যই বোধ হয় শঙ্করাচার্য্য নারীজাতির অধিকার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা সঙ্গত বোধ করেন নাই। তিনি শূদ্রের অধিকার সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া, দেশের প্রচলিত সংস্কারের অনুবর্ত্তন করিয়া শূদ্রের বিরুদ্ধেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি প্রথমে প্রতিপক্ষের যুক্তির উল্লেখ করিতেছেন:—"শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যা লাভে অধিকার আছে স্বীকার করা যাউক, কারণ অর্থিত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বাসনা, এবং সামর্থ্য অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের উপযোগী মেধা-শক্তি শূদ্রের ও থাকা সম্ভবপর। যজ্ঞে শূদ্রের অধিকার নাই সত্য, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভে শূদ্রের অধিকার নাই, এরূপ কোন নিষেধ-শ্রুতি নাই"। পাঠক আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি বৈদিক ঋষিগণ, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, শূদ্র ঋষি দ্যূতকার কবষ ঐলুষকে যজ্ঞে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব যজ্ঞেও শূদ্রের অধিকার নাই বলা যায় না। বল প্রয়োগেই কবষকে অধিকার চ্যুত করা হইয়াছিল। শুধু তাহা নয়, ঋগ্বেদ সংহিতাতে দেখা যায় যে, দশম মণ্ডলের ৩০ হইতে ৩৪ পর্য্যন্ত পাঁচটী উৎকৃষ্ট সূক্তেরই দ্রষ্টা বা ঋষি এই কবষ। এই কারণে ও এই শূদ্র ঋষি কবষের প্রতি ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতির মনে কিঞ্চিৎ বিদ্বেষ ভাব থাকা ও আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। সে যাহাহউক, শঙ্কর বলিতেছেন:— "অনগ্নিত্বই শূদ্রের কর্ম্মে অনধিকারের কারণ। ব্রহ্ম-বিদ্যা-লাভ সম্বন্ধে অনগ্নিত্ব অনধিকারের কারণ হইতে পারে না। আহবনীয়াদি অগ্নিস্থাপন করেনা বলিয়া কেহ ব্রহ্মবিদ্যা লাভে অসমর্থ হয় না। ব্রহ্মবিদ্যা লাভে শূদ্রের অধিকারের সমর্থনকারী নিদর্শন সকল ও বর্ত্তমান। সম্বর্গ-বিদ্যায় ব্রহ্মজ্ঞান-শ্রবনার্থী রাজা জানশ্রুতিকে শূদ্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বিদুর প্রভৃতি শূদ্র যোনিজাত হইলেও স্মৃতিতে তাঁহাদের বিশেষ জ্ঞান লাভের উল্লেখ আছে।

অতএব ব্রহ্মজ্ঞান লাভে শূদ্রেরও অধিকার আছে। এরূপ মীমাং-সার বিরুদ্ধে আমরা বলিতেছি :—শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই, কারণ তাহার পক্ষে বেদাধ্যয়নের অভাব।" প্রতিপক্ষের মত ও যুক্তি অতি বিশদরূপে প্রকাশ করাতেই শঙ্করের বিচারের প্রধান গৌরব। প্রতিপক্ষের উক্তি বলিয়া শঙ্কর যে অকাট্য যুক্তি-বিন্যাস করিয়াছেন, আমরা আশা করিয়াছিলাম যে শঙ্করের ও তাহাই মত। তাহা হইলেই আমরা তাঁহার উদারতার ভূয়সী প্রশংসা করিতাম। তাহা নয় শঙ্করের মত শূদ্রের প্রতিকূল। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে শূদ্রের বেদাধ্যয়নের অভাব কেন? শঙ্কর তদুত্তরে বলিতেছেন :—"উপনয়ন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিতে হয়, এবং উপন-য়ন ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়েরই জন্য।" শঙ্করের কথার সার মর্ম্ম এই :—উপনয়ন ভিন্ন বেদপাঠ হয় না, বেদপাঠ ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না; শূদ্রের উপনয়নের ব্যবস্থা নাই। যদি প্রশ্ন কর:—শূদ্রের উপনয়ন নাই কেন? তাহার উত্তর:—যেহেতু সে শূদ্র। হেতুর নামে, এরূপ চক্রক হেত্বাভাসের (arguing in a circle) সদুত্তর স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগ্বেদের অনুবাদ করিয়াই প্রদান করিয়াছেন। শূদ্রের উপনয়ন শ্রুতি-নিষিদ্ধ, শঙ্কর এরূপ ও বলিতেছেন না। উপনয়ন লোকের কার্য্য। শূদ্রের উপনয়ন করিলেই ত শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানে অনধিকার বলিবার আর কোন ভিত্তি থাকে না। শ্রুতিতে জাবালের উপনয়ন সম্বন্ধে গৌতম যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে, সেই প্রণালী মতে, যে কেহ সত্যবাদী, সে ই ব্রাহ্মণ, এবং তাহারই উপনয়ন হইতে পারে। জাবাল সত্যকামের গোত্র, এমন কি পিতার নাম ও অপরিজ্ঞাত ছিল, কারণ তাঁহার মাতা যৌবনকালে বহুচারিণী দাসী ছিলেন। তখনই সত্য-কামের জন্ম হয়। সত্যকাম ব্রহ্মচর্য্য গ্রহনার্থে হারিদ্রুমত গৌত-মের নিকটে উপস্থিত হইলে পর, গৌতম তাহাকে তাহার গোত্র

জিজ্ঞাসা করিলেন। সত্যকাম বলিল:—"আমি কোন্ গোত্র জানি না। আমার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এবং তিনি বলিয়াছেন যে যৌবনকালে তিনি বহুচারিণী পরিচারিকা ছিলেন, তখন আমার জন্ম হয়। আমার গোত্র তিনিও জানেন না। তাঁহার নাম জবালা, আমার নাম জাবাল।" ব্রহ্মচর্য্য গ্রহনার্থ উপনয়নের অধিকার বিচার সম্বন্ধে গৌতম এই মাত্রই যথেষ্ট মনে করিয়া, সত্যকামের সত্য-পরায়ণতা দৃষ্টেই তাহার উপনয়ন ক্রিয়া-সম্পন্ন করিলেন। ইহাতে কি মনে হয় না যে চরিত্র দৃষ্টে উপনয়নের অধিকার-অনধিকার স্থির করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য, জন্মদৃষ্টে নয়! বিনা উপনয়নে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করা নিষিদ্ধ, শ্রুতির এরূপ ও অভি-প্রায় নয়। বরং ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা দেখিতেছি (৫ম প্রপাঠক—৫ম অধ্যায়):—উপমন্যব প্রভৃতি ব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ লাভ করিবার জন্য উদ্দালক আরুণির নিকট গমন করেন। পরে তথা হইতে তাঁহারা সকলে মিলিয়া কেকয়রাজ অশ্বপতির নিকটে যাইয়া বৈশ্বানর-ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশের প্রার্থী হন, এবং সমিৎ-হস্তে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে পর, রাজা তাঁহাদের উপনয়ন না করি-য়াই ব্রহ্মোপদেশ করিয়াছিলেন—"তান্ হানুপনীয়ৈবৈতদুবাচ"। স্ত্রীলোকেরও উপনয়নে অধিকার নাই—শূদ্রেরই তুল্য। তথাপি গার্গী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী। "চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ" "দ্বিজোপি শ্বপচাধমঃ"—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ" ইত্যাদি অসংখ্য স্মৃতি বচন শূদ্রের অনুকূলে রহিয়াছে। তাহা জানিয়াও শঙ্কর "শাস্ত্রীয় সামর্থ্যের" অভাব হেতু, শূদ্রকে ব্রহ্মজ্ঞানে অনধিকারী স্থির করিতেছেন।

শঙ্কর নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে "ব্রহ্মজ্ঞানে শূদ্রের অনধি-কার, এরূপ নিষেধ-শ্রুতি নাই," তথাপি তিনি বলিতেছেন:—"সামর্থ্য না থাকিলে শুধু অর্থিত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বাসনা, অধিকারের কারণ

হয় না। কেবল 'লৌকিক সামর্থ্য' ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারের কারণ হয় না। শাস্ত্রীয় বিষয়ে 'শাস্ত্রীয় সামর্থ্য' থাকা আবশ্যক। যখন শূদ্রের জন্য বেদাধ্যয়ন নিরাকৃত হইয়াছে, সেই সঙ্গেই 'শাস্ত্রীয় সামর্থ্য' ও নিরাকৃত হইয়াছে। যে ন্যায়ের বলে শূদ্র যজ্ঞে অনধিকারী, সেই ন্যায়ের বলেই তাহার ব্রহ্মবিদ্যাতেও অনধিকার প্রমাণিত হয়, কারণ সেই ন্যায় উভয়তঃই সাধারণ।" স্বর্গীয় রমেশদত্ত কিম্বা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র শীলের মত লোকের বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণের সামর্থ্য নাই, একথা বলা বাতুলতা। তবে বলিতে হয়, এসামর্থ্য 'লৌকিক'। 'শাস্ত্রীয় সামর্থ্য" নয়। রৈক্ক প্রযুক্ত "হা রে ত্বা শূদ্র" এই বাক্যে জানশ্রুতি যে সত্য সত্যই শূদ্র ছিলেন, ক্ষত্রিয় কিম্বা অন্য কিছু ছিলেন না, এইরূপ কোন লিঙ্গ বা ব্যাবর্ত্তক গুণের উল্লেখ নাই। শঙ্করের এ আপত্তি অমূলক। 'শূদ্র' নামে সম্বোধনই তাহার শূদ্রত্বের লিঙ্গ। গুহ যেমন চণ্ডাল রাজা ছিলেন, জানশ্রুতিও সেইরূপ একজন শূদ্র রাজা ছিলেন—এরূপ অনুমানই যুক্তি-যুক্ত। আবার শঙ্কর বলিতেছেন:—"জানশ্রুতির শূদ্রত্ব স্বীকার করিলেও একমাত্র সম্বর্গ (জগতের লয় বিষয়ক) ব্রহ্ম-বিদ্যাতেই শূদ্রের অধিকার, সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় নয়"। 'আধখানা নৌকা, আধখানা কুমীর' কখনও হয় না। শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানে অনধিকার প্রমাণ করিবার জন্য শঙ্করের মত শুদ্ধাদ্বৈতবাদির এইরূপ শিরঃপীড়া অতিশয় বিস্ময়কর। সম্বর্গ-বিদ্যায় শূদ্র রাজা জানশ্রুতির অধিকার দৃষ্টে সমগ্র ব্রহ্মবিদ্যায় সমগ্র শূদ্র জাতির অধিকার অনুমান করাই সঙ্গত। শঙ্কর আবার বলিতেছেন:—"শূদ্র শব্দ এস্থলে অর্থ-বাদ বা নিন্দাবাক্য মাত্র, এতদ্দারা কোন ব্রহ্ম-বিদ্যাতেই শূদ্রের অধিকার প্রমাণিত হয় না"। নিন্দার্থে দ্বিজাতির প্রতি শূদ্র শব্দের প্রয়োগ, অথবা প্রশংসার্থে শূদ্রের প্রতি দ্বিজ শব্দের প্রয়োগ, শ্রুতিতে অন্য কোথাও আছে, শঙ্কর ও এরূপ বলেন না।

অতএব জানশ্রুতির প্রতি প্রযুক্ত শূদ্র শব্দকে অর্থবাদ মাত্র মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু শঙ্কর কোন মতেই নিরস্ত হইতেছেন না। তিনি বলিতেছেন :—"এস্থলে শূদ্র শব্দের অন্য অর্থ ও করা যায়। হংস-বাক্য শ্রবণ করিয়া জানশ্রুতি শোক-যুক্ত মনে রৈক্বের নিকট গমন করিয়াছিলেন (শুক্ + দ্রু), এজন্যই পরোক্ষজ্ঞ রৈক্ব তাঁহাকে শূদ্র নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাহারা জাতিতে শূদ্র—তাহাদেরই অনধিকার।" রৈক্ব যে পরোক্ষজ্ঞ ছিলেন, অথবা জানশ্রুতি যে জাতিতে শূদ্র ছিলেন না, শঙ্কর তাহার কোন প্রমাণ দিতেছেন না। এরূপ স্থলে দীর্ঘ ঊকারান্ত শূদ্র শব্দের সহজ রূঢ় অর্থ শূদ্র-জাতিত্ব, গ্রহণ না করিয়া, ব্যাকরণের শ্রাদ্ধ করিয়া, হ্রস্ব উকারান্ত শুক্ শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন বলিয়া, তাহার অন্যরূপ অর্থকরা, শঙ্করের পক্ষে নিতান্তই অসঙ্গত, সুধু অসঙ্গত তাহা নয়, নিতান্তই অনুদারতার পরিচায়ক। অপরদিকে ছান্দোগ্য-উপনিষদে রৈক্বের যে বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাহাকে ও শূদ্রভিন্ন অন্য কিছুই মনে করা যায় না। তিনি 'সযুগ্বান্' বা শকটবান্ ছিলেন ; তাঁহার শকটের নিম্নে তিনি বসিয়াছিলেন—"অধস্তাচ্ছকটস্য'। তিনি শূদ্র ছিলেন বলিয়াই, বোধ হয়, বিনা বাক্যবয়ে শূদ্র রাজা জানশ্রুতির কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পুনরায় শঙ্কর বলিতেছেন :—"ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদায়ে উপনয়নাদি সংস্কারের উল্লেখ আছে"। উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু উপনয়নের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার নিমিত্ত-নৈমিত্তিক কোন সম্বন্ধ আছে, শঙ্করও তাঁহা বলেন না। আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে ঔপমন্যব প্রভৃতির দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছি যে শ্রুতিতে উপনয়ন ভিন্ন ও ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে শ্রুতি-বচন দ্বারা শূদ্রের বেদে বা ব্রহ্মজ্ঞানে অনধিকার প্রমাণ করিতে অসমর্থ হইয়া, শঙ্কর মন্বাদি স্মৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

শঙ্কর বলিতেছেনঃ—"স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে শূদ্র চতুর্থবর্ণ, একজাতি, এবং সংস্কারের অযোগ্য। তাহার পক্ষে বেদ শ্রবণ নিষিদ্ধ; শ্রবণ করিলে সীসা বা লাক্ষা দ্বারা তাহার কর্ণ বিবর রুদ্ধ করিয়া দিতে হয়। শূদ্র চলন্ত শ্মশান-স্বরূপ, তাহার নিকটে শ্রুতি পাঠ করিবেনা। যাহার নিকটে বেদ-পাঠই নিষিদ্ধ, সে কিরূপে বেদ পাঠ করিবে? শূদ্রকে জ্ঞান দান করিবে না, ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য দ্বারা দ্বিজাতির জন্যই অধ্যয়ন, ইজ্যা, এবং দানাদি কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইতেছে"। ইহা সাতিশয় পরিতাপের বিষয় যে যিনি স্বীয় জীবনে চণ্ডাল বা পুক্কস্‌কেও গুরু মান্য করিতে প্রস্তুত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, সেই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-বাদী শঙ্কর ও এইসকল জাতিগত বিদ্বেষপূর্ণ একদেশদর্শি শ্রুতি-বিরুদ্ধ স্মৃতি-বচন প্রমাণরূপে ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই। তপস্যা করিবার অপরাধে রাম কর্ত্তৃক নিহত রামায়ণোক্ত শম্বুক নামা শূদ্রের বধ ও কি তিনি শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানে অনধিকারের প্রমাণরূপে গণ্য করিতে প্রস্তুত? শঙ্কর নিজেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "শ্রুতির সহিত বিরোধ হইলে, স্মৃতি-প্রমাণ আদরের অযোগ্য"। শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে বহুচারিণী দাসী জবালার অজ্ঞাত-গোত্র পুত্র সত্যকাম, অথবা শূদ্র রাজা জানশ্রুতি, অথবা ঐলুষ কবষ ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী। শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারাই সিদ্ধ হইতেছে যে উপনয়নে স্ত্রীজাতির অধিকার না থাকিলেও, গার্গী এবং মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনীগণ ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারিণী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এইসকল শ্রুতি-প্রমাণের সহিত বিরোধ হেতু, ব্রহ্ম-বিদ্যায় শূদ্রের অনধিকার-সূচক স্মৃতি-বচন সকল শঙ্করের নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারেই দুর্ব্বল, এবং আদরের অযোগ্য। কিন্তু শঙ্কর যেন প্রচলিত সংস্কারের উপরে আঘাত করিবার ভয়ে ভীত হইয়াই এস্থলে শ্রুতি-বিরুদ্ধ স্মৃতি-বচন অগ্রাহ্য করেন নাই। বরং তিনি মহাভারতোক্ত শূদ্র-প্রবর ব্রহ্মজ্ঞানী বিদুর, এবং ধর্ম্ম-ব্যাধ যিনি গুরুর আসন

গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ-কুমারকেও ব্রহ্মজ্ঞান দান করিয়াছিলেন, অথবা ধীবরী-পুত্র ব্যাস, এবং দাসীপুত্র নারদ প্রভৃতির ব্রহ্মজ্ঞান লাভের এক অপূর্ব্ব প্রমাণ-শূন্য কারণ কল্পনা করিতেছেনঃ—"বিদুর ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি যাহাদের পূর্ব্বকৃত সংস্কার হেতু জ্ঞানোদয় হয়, তাহাদের জ্ঞানের ফল-প্রাপ্তি বারণ করা যায় না, কারণ জ্ঞানের ফল-লাভ অবশ্যম্ভাবি।" প্রচলিত সংস্কারের দাসত্ব কি শঙ্করের মনে এতই প্রবল ছিল যে বিদুরাদি শূদ্র মহাপুরুষগণের স্বার্জ্জিত জ্ঞান-ফল-লাভের প্রতিবন্ধক জন্মাইতেও তিনি অসম্মত নহেন। যাহার অন্তরে শূদ্র-বিদ্বেষ এতদূর প্রবল, তাহার পক্ষে শূদ্রের অধিকার বিচার ভার গ্রহণ করা, অথবা শূদ্রের পক্ষে তাহার হস্তে সে ভার অর্পণ করা, কখনও নিরাপদ হইতে পারে না। যে বিদ্বেষ শূদ্রের মোক্ষ-পথ পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিতে প্রস্তুত, তাহা আমেরিকাবাসী গোরাদের কালাবিদ্বেষ অপেক্ষাও ঘৃণার্হ। পূর্ব্বকৃত সংস্কার কাহার আছে, কাহার নাই, কে বলিবে? তাহা জানিবার যদি কাহারও অকপট আগ্রহ থাকে, তবে শূদ্রজাতির জন্য বেদ-পাঠের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া পরীক্ষা করিয়া, ফল দৃষ্টে নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য, কাহার পূর্ব্ব সংস্কার আছে, এবং কাহার নাই। পূর্ব্ব-কৃত সংস্কার সম্বন্ধে সকল জাতিই সমান। দ্বিজাতিরও যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ পূর্ব্ব-সংস্কার-জনিত নয়, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? সে যাহা হউক, উল্লিখিত একদেশদর্শি যুক্তি অবলম্বন করিয়া শঙ্কর সিদ্ধান্ত করিতেছেনঃ—"অতএব বেদ-পাঠ-পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান লাভে শূদ্রের অধিকার নাই।" ব্রহ্মসূত্র-অ-১। পা-৩। সূ-৩৪, ৩৮॥

---

(৬) ব্যবহারিক দ্বৈতবাদ।

শঙ্কর শুদ্ধাদ্বৈতবাদী, কিন্তু তাঁহার অদ্বৈতবাদ কেবল মাত্র পারমার্থিকেই (Absolute) নিবদ্ধ। ব্যবহারিক (Relative) দ্বৈতবাদ

তিনিও সম্পূর্ণই স্বীকার করেন। শঙ্কর প্রতিপক্ষের আপত্তি বর্ণন করিতেছেন (ব্রহ্ম সূত্র অ-২।পা-১।সূ-১৩।)—"যদিও শ্রুতি স্ববিষয়ে প্রমাণরূপে গণ্য, তথাপি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তর দ্বারা অপহৃত বিষয় (অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি-সিদ্ধ বস্তু) সম্বন্ধে শ্রুতি-বাক্য প্রত্যক্ষাদি বিরুদ্ধ হইলে, তাহার অন্যরূপ অর্থ করা উচিত। তর্ক ও সেইরূপ স্ববিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে নির্ভরের অযোগ্য,—যেমন ধর্ম্মাধর্ম্ম, অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠান। অতএব ইহা অযুক্ত যে যাহা প্রমাণান্তর দ্বারা সম্যক্ সিদ্ধ, শ্রুতি দ্বারা তাহা বাধিত হইবে।" "প্রমাণান্তর দ্বারা সম্যক্ সিদ্ধ বিষয় কিরূপে শ্রুতি দ্বারা বাধিত হইতে পারে?" "তাহার উত্তর এইঃ—ভোক্তৃভোগ্য বিভাগলোক-প্রসিদ্ধ, ভোক্তা—চেতন শরীরী জীব, এবং ভোগ্য—শব্দাদি বিষয়, যথা,—ভোক্তা দেবদত্ত, ভোগ্য ওদন (ভাত)। ভোক্তা যদি ভোগ্য ভাব প্রাপ্ত হয়, অথবা ভোগ্য যদি ভোক্তৃভাব প্রাপ্ত হয়, তবে সেই লোক-প্রসিদ্ধ বিভাগের অভাব প্রতি-পাদিত হয়। পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে তাহাদের অভিন্নত্ব স্বীকার করিলে, তাহারা পর-স্পরের ভাব প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি- মাণ দ্বারা এই লোক প্রসিদ্ধ ভোক্তৃ-ভোগ্য বিভাগের বাধা অসঙ্গত। অতএব অদ্বৈত ব্রহ্ম-কারণতারূপ সিদ্ধান্ত অযুক্ত"। (আপত্তি খণ্ডন) ইহার উত্তরে বলিতেছিঃ— "আমাদের মতেও সেই ভোক্তৃ-ভোগ্য বিভাগ সঙ্গত, কারণ লোকে ও তাহা দেখা যায়ঃ— যেমন সমুদ্র জলাত্মক, এবং ফেণ-বীচি-তরঙ্গ-বুদ্বুদাদি তাহারই বিকার মাত্র, সমুদ্র হইতে অভিন্ন। ফেণ-বীচি প্রভৃতির পরস্পর বিভাগ, এবং পরস্পর সংযোগ দৃষ্ট হয়। উদকাত্মক সমুদ্র হইতে অভিন্ন বলিয়া ফেণ-তরঙ্গাদি উদকের বিকার, একটীর মধ্যে আর একটী মিলিয়া যায় না, অথবা তাহারা একটির মধ্যে অন্যটি মিলিয়া যায় না বলিয়া, তাহারা সমুদ্র হইতে ভিন্ন হয় না। সেইরূপে এই স্থলে ও ভোক্তৃ-

ভোগ্য একটার মধ্যে অন্যটা মিলিয়া যায় না, অথবা একটার মধ্যে অন্যটা মিলিয়া যায় না বলিয়া, পরব্রহ্ম হইতে তাহাদের ভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হয় না। যদিও ভোক্তা (জীব) ব্রহ্মের বিকার না হউক, কারণ শ্রুতি বলিতেছে "তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন" অর্থাৎ স্রষ্টা নিজে অবিকৃত ভাবেই তাহার কার্য্যমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, এবং তাহাতেই তাঁহার ভোক্তৃত্ব, তথাপি কার্য্যে অনুপ্রবিষ্ট হওয়াতে, সেই কার্য্যোপাধি-নিমিত্ত বিভাগ রহিয়াছে, যেমন ঘটাদি-নিমিত্ত আকাশের বিভাগ। অতএব পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও ভোক্তৃভোগ্য লক্ষণ ব্যবহারিক বিভাগ, সমুদ্র তরঙ্গাদির ন্যায় উপপন্ন হয়"।

পরের সূত্রে শঙ্কর বলিতেছেন:—"কিন্তু ব্যবহারিক বিভাগের পারমার্থিক সত্তা নাই,—কারণ কার্য্যকারণের অনন্যত্ব *। কার্য্য এই বহু বিস্তীর্ণ জগৎ, কারণ পরব্রহ্ম। পারমার্থিক দৃষ্টিতে কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব,—যেহেতু কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের অভাব দেখা যায়। এইরূপে এই ভোগ্য-ভোক্তৃত্বাদি প্রপঞ্চ জগতের ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অভাব। আপত্তিঃ—"তবে বস্তুতঃ ব্রহ্মও অনেকাত্মক হইল। বৃক্ষ যেমন অনেক শাখাযুক্ত, সেইরূপ ব্রহ্ম ও অনেক শক্তি এবং প্রবৃত্তিযুক্ত। অতএব ব্রহ্মের একত্ব এবং নানাত্ব উভয়ই সত্য, যেমন বৃক্ষ এই অর্থে একত্ব, শাখা এই অর্থে নানাত্ব;—সমুদ্র রূপে একত্ব, ফেণ-তরঙ্গাদি রূপে নানাত্ব,—মাটিরূপে একত্ব, ঘটশরাবাদিরূপে নানাত্ব। সেই একত্ব অংশের জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ-সিদ্ধি, এবং নানাত্বের জ্ঞান দ্বারা কর্ম্মকাণ্ডাশ্রিত লৌকিক এবং বৈদিক ব্যবহার-সিদ্ধি। এরূপ হইলে মৃদাদির দৃষ্টান্ত ও অনুরূপই হয়।" উত্তরঃ—"তাহাও বলা যায় না, কারণ মৃত্তিকা ইহাই সত্য। বিকারজাতকে শ্রুতিতে মিথ্যা বলা হইয়াছে। শ্রুতি 'তৎ সত্যং' বলিয়া পরম কারণ এক ব্রহ্মকেই সত্য বলিতেছে, এবং

* পরে (ছ) দ্রষ্টব্য,—'কারণ' শব্দে এস্থলে উপাদান কারণকেই লক্ষ্য করিতেছে।

'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা জীবের ব্রহ্মভাব উপদিষ্ট হইয়াছে। জীবের ব্রহ্মাত্মত্ব স্বয়ং-সিদ্ধ, যত্নান্তরসাধ্য নয়। শাস্ত্রোক্ত এই ব্রহ্মাত্মত্ব-জ্ঞান-লাভ, জীবের স্বাভাবিক শারীরাত্মত্বের বাধক হয়। রজ্জ্বাদি জ্ঞান যেমন সর্পাদি বুদ্ধির বাধক। সেই শারীরাত্মত্ব বাধিত হইলে, তদাশ্রিত সমস্ত স্বাভাবিক ব্যবহার ও বাধিত হয়। সেই সকল লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের সিদ্ধির জন্যই ব্রহ্মের নানাত্ব-রূপ অপর এক অংশ কল্পিত হইয়া থাকে। একত্বই পারমার্থিক। নানাত্ব মিথ্যা জ্ঞান বিজৃম্ভিত মাত্র। একত্ব এবং নানাত্ব উভয় সত্য হইলে, একত্ব জ্ঞান দ্বারা নানাত্ব জ্ঞান কিরূপে দূর হইবে।" আপত্তিঃ—"কিন্তু যদি একত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করা যায়, তবে নানাত্বের অভাব-জনিত বিষয়-শূন্যত্ব হেতু প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণ সকলের ব্যাঘাত হয়,—খুঁটি প্রভৃতিতে পুরুষ বুদ্ধির ন্যায় হইয়া পরে। আর বিধিনিষেধ শাস্ত্র ও ভেদাপেক্ষী, ভেদ না থাকিলে তাহাও মিথ্যা হয়। এমন কি মোক্ষশাস্ত্রও গুরু শিষ্য ইত্যাদি ভেদাপেক্ষী। ভেদ না থাকিলে, তাহাও মিথ্যা হয়। তবে মিথ্যা-ভূত মোক্ষ-শাস্ত্র-সিদ্ধ একত্বের সত্যত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে।" "তাহার উত্তর এই ঃ—এরূপ কোন দোষ নাই। ব্রহ্মাত্মত্ব-বিজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে সকল লৌকিক ব্যবহারেরই সত্যত্ব যুক্তি-সঙ্গত, জাগরণের পূর্ব্বে স্বপ্ন ব্যবহারের ন্যায়। যতক্ষণ না পারমার্থিক একাত্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে, ততক্ষণ প্রমাণ-প্রমেয় এবং ফলাদি-যুক্ত ব্যবহারে কাহারও মিথ্যাত্ব বুদ্ধি হয় না। ততক্ষণ অবিদ্যা বশতঃ স্বাভাবিক ব্রহ্মাত্মতা পরিত্যাগ করিয়া বিকার সকলকেই 'আমি' 'আমার' এইরূপ আত্ম-আত্মীয় ভাবে সকল জন্তুই গ্রহণ করে। অতএব ব্রহ্মাত্ম-বিজ্ঞানের পূর্ব্বে, সকল লৌকিক এবং বৈদিক ব্যবহারই যুক্তি-সঙ্গত।

ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম প্রপাঠকোক্ত বিখ্যাত ইন্দ্র-বিরো-চনাখ্যায়িকার ভাষ্যে শঙ্কর ব্রহ্মলোকে মুক্তাত্মাদিগের দ্রষ্টব্য অর্ণব-

বৃক্ষ-পুর-স্বর্ণমণ্ডপাদির মানস সত্তার আলোচনা করিতে গিয়া বলিতে-ছেনঃ—(ব্রহ্মলোকে দ্রষ্টব্য) "মূর্ত্তি সকল মানস-আকার যুক্ত হইলেই (মুক্তাত্মাদিগের) মানস দেহের অনুরূপ সম্বন্ধ-যোগ্য হয়। স্বপ্নেও মানস আকার যুক্ত পুংস্ত্র্যাদিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। আপত্তি হইতে পারে যে স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তি সকল মিথ্যা, কিন্তু ব্রহ্মলোক সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেঃ—"সত্যাঃ কামাঃ।" অতএব ইহাতে শ্রুতি-বিরোধ হয়। তাহা নয়। মানস প্রত্যয়ের ও সত্ত্ব যুক্তি সঙ্গত। স্ত্রীপুরুষাদ্যাকার মানস প্রত্যয় সকল স্বপ্নে দৃষ্ট হয়। যদি বলা যায় স্বপ্ন-দৃশ্য বস্তু সকল জাগ্রদ্বাসনানুরূপ, বস্তুতঃ স্বপ্নে স্ত্র্যাদি থাকে না। এ কথা কিছুই নয়। জাগ্রদ্বিষয় সকল ও মানসপ্রত্যয় হইতে উৎপন্ন,—কারণ জাগ্রদ্বিষয় সকল ও সৎস্বরূপের ইচ্ছা (বা জ্ঞান) জনিত, তেজ-অপ্-অন্নময়। শ্রুতি বলিতেছে "সংকল্পই লোক সকলের মূল"--প্রত্যগাত্মা বা সর্ব্বাত্ম-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই আকাশ-পৃথিবীর উৎপত্তি, তাহাতেই তাহাদের লয় ও স্থিতি। রথনাভি প্রোথিত রথ-চক্রের পাখির (অর) ন্যায়। অতএব মানস এবং বাহ্য বিষয়সকল বীজাঙ্কুরের ন্যায়—পরস্পরের কার্য্য কারণ। যদি ও বাহ্যই মানস, এবং মানসই বাহ্য, তাহাদের নিজের সম্বন্ধে তাহাদের কোনটিই মিথ্যা নয়। তবে স্বপ্ন দৃষ্ট বিষয় সকল জাগরিতের সম্বন্ধে মিথ্যা, এ কথা সত্য। জাগ্রদ্বোধের তুলনায়ই তাহাদের মিথ্যাত্ব,—তাহাদের নিজের মধ্যে কোন মিথ্যাত্ব নাই। সেইরূপই আবার স্বপ্ন দৃষ্ট বিষয়ের তুলনায় জাগ্রদ্দৃষ্ট বিষয়ের মিথ্যাত্ব। তাহার নিজের মধ্যে কোন মিথ্যাত্ব নাই। তবে স্বপ্নেরই হউক, আর জাগ্রদাবস্থারই হউক, বিশেষ-আকারতা মাত্রই মিথ্যা প্রত্যয় জনিত। কিন্তু তাহাও কেবল আকার-বিশেষ সম্বন্ধেই মিথ্যা। বস্তুতঃ নিজের সম্বন্ধে সন্মাত্র-রূপতা হেতু সত্য। সদাত্ম-প্রতিবোধের পূর্ব্বে, স্ব স্ব বিষয়ে, সকলই সত্য। অতএব ব্রহ্মলোকের মূর্ত্তি সকল স্বপ্ন

—দৃশ্যের ন্যায় বলিলে, শ্রুতি-বিরোধ-দোষ হয় না। ব্রহ্ম-লোকের সাগর এবং সঙ্কল্প-মাত্র উত্থিত পিত্রাদি কাম্যজাত ও মানস ই। অষ্টম প্রপাঠকের দ্বাদশ খণ্ডের ভাষ্যে মুক্তাত্মা সম্বন্ধে শঙ্কর আবার বলিতেছেনঃ—"যে খানে অন্য কাহাকেও দেখে না, অন্য কিছুই শোনে না, তাহাই ভূমা"—তবে এক হইয়া মুক্তাত্মা কিরূপে ব্রহ্মলোকে 'পিতৃ-মাতৃলোকাদি' দর্শন করিয়া, অথবা 'স্ত্রীর সহিত' বা 'জ্ঞাতিদিগের সহিত' বিহার করিয়া,' আনন্দিত হয়েন? ইহা বিরুদ্ধ, কারণ একই ব্যক্তি যে সময়ে (ব্রাহ্মলৌকিক কাম সকল) দর্শন করে, সেই সময়েই বলা হইতেছে যে অন্য কাহাকেও সে দেখে না, "নান্যৎ পশ্যতি"। ইহাতে দোষ হয় না। ভূমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও সে দেখে না। শ্রুত্যন্তরেও সে দোষ পরিহৃত হইয়াছে,—দ্রষ্টার দৃষ্টির অবিপরিলোপ হেতু সে দেখে ই। তবে দ্রষ্টা হইতে পৃথক্ কোন কাম্য-বস্তুর অভাব হেতু, দেখে না বলা যায়। যদি ও শ্রুতিতে সুষুপ্তি সম্বন্ধেই ঐরূপ বলা হইয়াছে, মুক্ত ব্যক্তিরও সর্বৈবিকত্ব হেতু, দ্বিতীয়াভাব সমান। "কি দিয়া কাহাকে দেখিবে?" তাহাও বলা হইয়াছে"। মোক্ষ সম্বন্ধে আলোচনা কালে পাঠক দেখিতে পাইবেন, যে শঙ্কর মুক্তাত্মার অবস্থা আমাদের রোগ-মুক্তাবস্থার সহিত তুলনা করিতেছেনঃ— "যথা রোগনিবৃত্তাবরোগোঽভিনিষ্পদ্যতে।" (ব্রহ্ম-সূত্র। অ-৪।পা-৪। সূ-২।)। তিনি আবার বলিতেছেন যে মুক্তাত্মাদিগের "অনিমাদ্যাত্মক ঐশ্বর্য্য" ও সেই নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন,— 'নিত্য-সিদ্ধেশ্বরায়ত্তমিতরেষামৈশ্বর্য্যং" (সূত্র ১৭, ১৮।) এতদ্দ্বারা পাঠক দেখিবেন যে ব্যবহারিক দ্বৈতভাব শঙ্করাচার্য্যের মতে, মুক্তাবস্থাতে ও থাকে,—মুক্তাত্মা নিয়ম্য, এবং ঈশ্বর নিয়ামক।

(চ) জীবের পুরুষকার এবং ঈশ্বরের বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য।

শঙ্কর যে শুধু ব্যবহারিক দ্বৈতমাত্র সমর্থন করিয়াছেন তাহা নয়, তিনি জীবের পুরুষকারেরও সমর্থন করেন। আমাদের দেশে অনেকেই অদ্বৈত-বাদের নামে কাষ্ঠ-লোষ্ট্রবৎ কপালবাদী হইয়া থাকেন, অথবা লোকের যত্নচেষ্টার উপরে আস্থা-শূন্য হইয়া থাকেন। শঙ্কর সেরূপ কাষ্ঠ-লোষ্ট্রবৎ হতোদ্যম কপালবাদী ছিলেন না। তিনি দার্শনিক ক্ষেত্রে যেরূপ পুরষকার স্বীকার করিতেন, সেইরূপেই স্বীয় জীবনে সিংহ-বিক্রমের সহিত, জীবের হিতের জন্য পুরষকার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পুরুষকার-সাধনার অভাবই ভারতীয় জাতি সকলের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। যোগ-বাশিষ্ঠে বশিষ্ঠ-দেব রামকে বলিতেছেন:—"বাসনারূপ সরিৎ শুভ এবং অশুভ এই দুই পথেই প্রবাহিত হয়, তাহাকে পুরুষকারের দ্বারা বিশেষ যত্নের সহিত শুভ পথে সংযোজিত করিবে। তোমার মন যখন অশুভ পথে সমাবিষ্ট হয়, হে বীরবর, তখন বলের সহিত পুরুষার্থ দ্বারা টানিয়া তাহাকে শুভ পথে ফেলিবে। লোকের চিত্ত শিশুর তুল্য, অশুভ পথ হইতে চালিত হইলে, শুভ পথে গমন করে, আবার তাহা হইতে চালিত হইলে, অশুভ পথে গমন করে। অতএব বলের সহিত তাহাকে শুভ পথে চালনা করিবে।"* পঞ্চদশী বলিতেছেন:—"ঈশ্বরই জীবের পুরুষকারের রূপেও প্রকাশিত হইতেছেন"—"ঈশঃ পুরুষকারস্য রূপেণাপি বিবর্ত্ততে।" শঙ্কর নিজে পুরুষকার সম্বন্ধে কি বলিতেছেন? ব্যাস তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে (অ-২। পা-৩। সূ-৪২॥)

* "শুভাশুভ-মার্গাভ্যাং বহন্তী বাসনা-সরিৎ। পৌরুষেণ প্রযত্নেন যোজনীয়া শুভে পথি॥ অশুভেষু সমাবিষ্টং শুভেষ্বেবাবতারয়। স্বং মনঃ পুরুষার্থেন বলেন বলিনাং বর॥ অশুভাচ্চলিতং যাতি শুভং তস্মাদপীতরৎ। জন্তোশ্চিত্তং তু শিশুবৎ তস্মাত্তচ্চালয়েৎ বলাৎ॥" ॥ যোগ-বাশিষ্ঠ॥

সূত্র করিতেছেন :— "কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিত-প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যা-দিভ্যঃ" ॥ তাহার উপরে শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যে বলিতেছেন :— "জীব ধর্ম্মাধর্ম্ম লক্ষণ যেরূপ প্রযত্ন করে, সেই প্রযত্ন অনুসারেই ঈশ্বরও তাহাকে দিয়া কর্ম্ম করাইয়া থাকেন।" পরে আবার বলি-তেছেন :—"লোকে যেমন নানাবিধ লতা গুল্ম বা ব্রীহিযবাদি প্রত্যেকটী নিজ নিজ বীজ হইতেই,উৎপন্ন হয়, এবং পর্জ্জন্য বা বৃষ্টি তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে সকলের মধ্যে সাধারণ নিমিত্ত,—যদি বৃষ্টি না হয়, তবে তাহাদের নানা প্রকার রস, পুষ্প, ফল, পত্রাদি জন্মে না, আবার তাহাদের স্ব স্ব বীজ না থাকিলেও জন্মে না, সেইরূপ জীবের কৃত প্রযত্ন অনুসারেই ঈশ্বর তাহাদিগের শুভাশুভ বিধান করেন। (তবে আপত্তি হইতে পারে) জীব পরমেশ্বরের কর্তৃত্বের অধীন হইলে, তাহার কৃত প্রযত্নের উপরে তাহার শুভাশুভ কিরূপে নির্ভর করিবে? (উত্তর) জীব পরমেশ্বরের কর্তৃত্বাধীন হইলেও জীবই করে, জীব করে বলিয়াই ঈশ্বর তাহা দ্বারা করাইয়া থাকেন। এজন্যই বিধি-নিষেধ শাস্ত্র বৃথা হয় না। অন্যথা ঈশ্বরই যদি জীবকে বিহিত কিম্বা প্রতিষিদ্ধ কার্য্য করান, এবং জীব সম্পূর্ণ পরতন্ত্রই হয়, তাহা হইলে বিধি-নিষেধ শাস্ত্র নিরর্থক হয়। আবার জীবের কর্তৃত্ব যদি সম্পূর্ণ ঈশ্বর-নিরপেক্ষ হয়, তাহা হইলেও শুভাশুভ বা দণ্ড-পুরস্কারের অভাবে, লৌকিক পুরুষকার নিস্ফল হয়। জীব এবং ঈশ্বরের পরস্পর উপকার্য্য এবং উপকারক সম্বন্ধই বলা হইতেছে।"

অন্য আর এক সূত্রের ভাষ্যে (সূত্র-৩৪) ঈশ্বরের উচ্চাবচ নানা শ্রেণীর প্রাণীযুক্ত এই জগৎ নির্ম্মাণ-জন্য বৈষম্য বা পক্ষপাতিতা এবং নৈর্ঘৃণ্য বা নিঠুরতার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া, সেই প্রশ্নের সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য, শঙ্কর সিদ্ধান্ত করিতেছেন,—যে প্রাণীবর্গের স্বকৃতকর্ম্ম জন্যই জগতে সুখদুঃখের বৈষম্য, ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব

বা নিষ্ঠুরতার জন্য নয়। শঙ্কর বলিতেছেন,—“যদি আপত্তি কর, যে ঈশ্বর এই জগতের কারণ হইতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে পক্ষপাতিত্ব এবং নিষ্ঠুরতা দোষ আরোপ করিতে হয়,—যথা, তিনি দেবতাদিগকে অত্যন্ত সুখভাক্, এবং পশ্বাদিকে অত্যন্ত দুঃখভাক্ করিয়া থাকেন। তাহাতে সাধারণ লোকের ন্যায়, তাঁহার মধ্যেও রাগ (আসক্তি) এবং দ্বেষ বা বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ পায়। আবার দুঃখ-যোগ বিধান, এবং প্রজাবর্গের সংহার-সাধন করাতে ঈশ্বরের অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা ও প্রকাশ পায়। তাহা নয়। ঈশ্বরেতে পক্ষপাতিতা এবং নিষ্ঠুরতা আরোপ করা যায় না, কারণ ঈশ্বর যাহা করেন, তাহা সাপেক্ষ। কাহার অপেক্ষা করে? সৃজ্যমান প্রাণীকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষা করে। ঈশ্বরকে পর্জ্জন্যবৎ দেখিতে হইবে। ব্রীহি-যবের সৃষ্টি সম্বন্ধে যেমন পর্জ্জন্য সাধারণ কারণ, এবং ব্রীহি-যবের বৈষম্য সম্বন্ধে তাহাদের বীজগত স্বস্ব সামর্থ্যই কারণ, সেইরূপ দেব-মনুষ্য-পশ্বাদির সৃষ্টি বিষয়ে ঈশ্বর সাধারণ কারণ, কিন্তু জীবগত তাহাদের স্বস্ব ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মই সংসার বৈষম্যের কারণ। “পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন।” সূত্র-৩৪॥ এস্থলে আমাদের উল্লেখ করা আবশ্যক যে বৃষ্টি এবং বীজ—এই দুয়ের মধ্যে লোকে বীজকেই বৃক্ষের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। বৃষ্টিকে কেহ বৃক্ষের কারণ বলিয়া উল্লেখ করে না। বৃষ্টি সাহায্যকারী মাত্র। শঙ্করের এই দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবগণের স্ব স্ব কর্ম্মই জীব-জগতের বৈষম্যের কারণ, ঈশ্বর সহকারী মাত্র,—এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে ঈশ্বরকে স্রষ্টৃপদচ্যুত করা হয় না কি?

পরের সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর পুনরায় বলিতেছেনঃ—“হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সৎস্বরূপই ছিলেন” ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য দ্বারা দেখা যায় সৃষ্টির পূর্ব্বে অবিভাগ ই ছিল। (পাঠক অবশ্য এই সঙ্গেই ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে সৃষ্টির একটা ‘পূর্ব্ব’ বা আদি ও

ছিল, সৃষ্টি "অনাদি" বলা শ্রুতি-বিরুদ্ধ।) সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্মই ছিল না, যদনুসারে এই বৈষম্য-দোষ-পূর্ণ সৃষ্টি-কার্য্য সাধিত হইতে পারে। সৃষ্টির পরেই শরীরাদির বিভাগ, এবং সেই বিভাগ অনুসারেই (দেবতির্য্যগ্নরাদির) যাহার যেমন কর্ম্ম,—অর্থাৎ যাহার যেরূপ শরীর, তাহার তদনুরূপই কর্ম্ম। তাহা হইলে কিরূপে বলা হইতেছে যে কর্ম্মানুসারেই যাহার যেরূপ শরীর? ইহাতে ইতরেতরাশ্রয় দোষ (Arguing in a circle) ঘটিতেছে। এই আপত্তির উত্তর এই,—সৃষ্টি অনাদি। (কিন্তু "সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সৎ স্বরূপই ছিলেন" এই কথা দ্বারা সৃষ্টির অনাদিত্ব কি শ্রুতি-বিরুদ্ধ হইতেছে না?) —এবং অনাদিত্ব হেতু বীজাঙ্কুরের ন্যায়, জীবের কর্ম্ম এবং সৃষ্টি বৈষম্য পর্য্যায়ক্রমে পরস্পারের কার্য্য এবং কারণরূপে (অনন্তকাল) চলিয়া আসিতেছে! ইহাতে কোন বিরোধ নাই।" (সূত্র-৩৫ ॥)

পরবর্ত্তী সূত্রের ভাষ্যে আবার শঙ্কর বলিতেছেনঃ—"সংসারের আদি আছে, এরূপ কল্পনা করিলে সংসার যেন অকস্মাৎ উদ্ভূতের ন্যায় হয়। (অর্থাৎ অনন্তকাল বিনা সৃষ্টিতে থাকিয়া, অকস্মাৎ যেন নিদ্রাভঙ্গ হইয়া ঈশ্বর সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, এরূপ দেখায়।) অবিদ্যা ও একরূপা। অতএব অবিদ্যা ও বৈষম্যের কারণ হইতে পারে না। একথার উত্তর এইঃ—রাগাদি ক্লেশ, এবং বাসনা-জনিত বিচিত্র-কর্ম্মের সহযোগে, অবিদ্যা ও সংসার বৈষম্যের কারণ হইতে পারে। আর কর্ম্ম ভিন্ন শরীর হয় না, শরীর ভিন্ন কর্ম্ম হয় না,—সৃষ্টির আদি আছে, এরূপ স্বীকার করিলে, ইতরেতরাশ্রয় দোষ ও ঘটে। অপর পক্ষে সৃষ্টি অনাদি বলিলে বীজাঙ্কুরের ন্যায় কোনরূপ দোষ থাকে না।" ব্রহ্ম-সূত্র-অ-২। পা১। সূত্র-৩৬ ॥ সৃষ্টি-প্রবাহ ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গেই অনাদিকাল হইতে, চলিয়া আসিতেছে, বলাতে কোনরূপ দোষ থাকে না। তাহা হইলে সংসার ও "অকস্মাৎ উদ্ভূতের ন্যায় হয় না"

সত্য। কিন্তু কোন সৃষ্ট জীবের কর্ম্ম-বিশেষকে অনাদি বলিলে, তাহার কর্ম্মত্ব অর্থাৎ কৃতকত্ব থাকে না। কালে অনাদি হইলেও, ঐ জীব-বিশেষ সম্বন্ধে, তাহার কর্ম্ম আদিমান্, কারণ কর্ম্ম ঐ জীবেরই কৃত। জীব ও সেইরূপে কাল-প্রবাহ সম্বন্ধে অনাদি হইলেও, ঈশ্বর সম্বন্ধে আদিমান্. কারণ জীব ঈশ্বরেরই সৃষ্ট,—"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"—ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত। সৃষ্টি-বৈষম্য যদি অনাদি অথচ কর্ম্ম-জন্য বলা হয়, তবে স্রষ্টার স্রষ্টৃত্ব থাকে না। কর্ম্ম জীবেরই কৃত। সেই কর্ম্মই যদি ঈশ্বরের সমকালবর্ত্তী, এবং অনাদি হয়, তবে জীব কি ঈশ্বরের ও পূর্ব্ববর্ত্তী? ন্যায়মতে ক্রিয়া বা কর্ম্ম ক্রিয়াবানেরই আশ্রিত, এবং ক্রিয়াবানের সহিত সমবায় সম্বন্ধে সম্বন্ধ। কর্ম্মকে অনাদি বলিলে জীবকেও অনাদি বলা হয়, এবং আমাদের শাস্ত্রে তরুলতা-গুল্মাদি ও জীব-বিশেষই। তবে ঈশ্বরকে কিরূপে এ সকলের স্রষ্টা বলা যাইতে পারে? আবার আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, যে কর্ম্মই যদি জীব-সৃষ্টির নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ হয়, এবং ঈশ্বর পর্জ্জন্য-স্থানীয় সহকারী মাত্র হয়, তবে কর্ম্মই যথার্থ স্রষ্টা হইল, ঈশ্বর কর্ম্মেরই সহকারী মাত্র। "কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ"—শঙ্করের বিরুদ্ধপক্ষ কর্ম্ম-মীমাংসকদিগের এই মত, এবং নৈয়ায়িকাদির তটস্থ ঈশ্বরবাদই প্রবল হইল। সৃষ্টি কাল-প্রবাহ সম্বন্ধে অনাদি, কিন্তু স্রষ্টা হইতেই সৃষ্টি, স্রষ্টারই লীলা অথবা স্বভাব সৃষ্টি। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম ফলেরই লীলা সৃষ্টি, এ কথা শ্রুতি-বিরুদ্ধ। শ্রুতি বলিতেছে ঈশ্বর "স্বরাট্," কর্ম্মকে সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহার অংশী বলিয়া ও স্বীকার করা যায় না। অতএব সংসারের বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য দৃষ্টে কর্ম্মের সৃষ্টি-বীজত্ব এবং অনাদিত্ব স্বীকার করা সঙ্গত হইতে পারে না।

বস্তুতঃ চিন্তা করিয়া দেখিলে, শঙ্করের ন্যায় শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর পক্ষে পরমেশ্বরের "বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যের" প্রশ্নই হইতে পারে না,

কারণ সকলই তিনি। তিনি নিজের প্রতিই নিজে সেই বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য প্রদর্শন করেন। দুইজন যেখানে আছে, সেখানেই মাত্র বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যের প্রশ্ন সম্ভব। কিন্তু ভূমাস্বরূপ পরমেশ্বরে—যাঁহার মধ্যে অন্য বলিয়া কেহ নাই, "যত্র নান্যৎ পশ্যতি"—সে প্রশ্নই উঠিতে পারে না। "মৃত্যোঃ স মৃত্যু মাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" সংসারের দুঃখ-সুখ অজ্ঞানতা বা অবিদ্যা-জনিত। শঙ্কর নিজেই তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন,—"অবিদ্যাবেশ হেতু জীব দেহাদিতে আত্মভাব আরোপ করিয়া, তজ্জনিত দুঃখ দ্বারা নিজেকে দুঃখী মনে করে। জীবের দুঃখ পারমার্থিক নয়। অবিদ্যাকৃত-নামরূপ-জনিত দেহেন্দ্রিয়াদি-বিষয়ক অবিবেক এবং ভ্রম হইতেই জীবের দুঃখাভিমান। দেহাত্মাভিমান-ভ্রান্তি দ্বারা যেমন স্বদেহগত দাহচ্ছেদাদি-নিমিত্ত দুঃখ লোকে অনুভব করে, সেইরূপ পুত্রমিত্রাদি-গোচর দুঃখও তদভিমান-জনিত ভ্রান্তি দ্বারাই অনুভব করে। স্নেহবশে 'আমিই পুত্র' 'আমিই মিত্র' এইরূপে নিজেই পুত্রমিত্রাদিতে অভিনিবিষ্ট হয়। ইহা দ্বারা নিশ্চিত জানা যায় যে মিথ্যা অভিমান-ভ্রম হইতেই দুঃখের উৎপত্তি। ব্যতিরেক দর্শন দ্বারাও ইহাই প্রতিপন্ন হয়ঃ—যথা, বহুলোক একত্র উপস্থিত থাকিলে, যদি ঘোষণা করা যায় 'পুত্র মৃত', 'মিত্র মৃত', তখন যাহাদের পুত্রমিত্রাদিমত্ত্ব অভিমান আছে, তাহাদেরই তন্নিমিত্ত দুঃখ উৎপন্ন হয়, কিন্তু অভিমান-শূন্য পরিব্রাজকাদির দুঃখ উৎপন্ন হয় না।" ব্রহ্ম-সূত্র। অ-২। পা-৩। সূ ৪৬॥

অতএব লোকের অবিদ্যাজনিত ব্যবহারিক-সংসারের সুখ দুঃখ দৃষ্টে ঈশ্বরের পারমার্থিক স্বরূপে বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য দোষ আরোপ করা অসঙ্গত। পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখিলে ঈশ্বর নিজের প্রতিই নিজে সেই ব্যবহারিক বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য প্রদর্শন করিতেছেন। যে ঐশ্বর্য্য-বলে, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় হইয়াও, যুগপৎ অসংখ্য স্থানের

অসংখ্য ভক্ত উপাসকের, অসংখ্য প্রকারের পূজা গ্রহণ, এবং প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া থাকেন, অথবা যে ঐশ্বর্য্য-কণিকার বলে, জীব নিজেও স্বপ্ন কালে, নিজের মধ্যে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন-জগৎ রচনা করিয়া নিজের নিকটেই নিজে যুগপৎ বহুরূপে প্রকাশিত হয়,—অথচ তাহা একের বহুস্বরূপ বিরোধ দোষে (Law of contradiction) বাধিত হয় না, ঈশ্বর ও সেইরূপ তাঁহার পূর্ণ ঐশ্বর্য্য বলে দেবতির্য্যগ্নরাদি অসংখ্য ভোক্তারূপে নিজেই ব্যবহারিক সংসারের সর্ব্ববিধ বৈষম্য-নৈঘৃণ্য ভোগ করিতেছেন। যিনি সর্ব্বাত্ম-স্বরূপ তাঁহার সম্বন্ধে বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যের আপত্তি নিতান্ত অমূলক*। ঈশ্বরের সর্ব্বাত্ম-স্বরূপকেই লক্ষ্য করিয়া শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ বলিতেছেনঃ—"হে বিশ্বরূপ, তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমিই কুমার অথবা কুমারী, তুমিই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ হইয়া দণ্ড ধারণ কর, তুমিই নবজাত-শিশুরূপে জন্ম গ্রহণ কর। তুমিই নীলবর্ণ পতঙ্গ, অথবা হরিদ্বর্ণ লোহিতাক্ষ শুকাদি পক্ষী, তুমিই তড়িৎগর্ভ মেঘ, তুমিই ঋতু, অথবা সমুদ্র সকল।" ৩,৪।অ-৪। শ্বেতাশ্বতর ॥

(ছ) ঈশ্বরই জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ, কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব।

'কারণ' কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে, আর্য্য এবং অনার্য্য, আধুনিক এবং প্রাচীন, সকল শ্রেণীর দার্শনিকদিগের মধ্যেই অত্যন্ত মতভেদ দৃষ্ট হয়। কাহারও মতে কার্য্যের উৎপাদক শক্তি-বিশেষেরই নাম কারণ। তাহাদের মতে আমাদের পুরুষকার ভিন্ন অন্য কোন রূপ শক্তিরই ধারণা আমাদিগের হয় না। এ জন্যই তাহারা বলেন, বিশ্বাত্মার পুরুষকারই জগতের সর্ব্বপ্রকার কারণ

* In this view, the time honoured but still unsettled controversy betwen human free will on the one hand, and Divine fore-knowledge on the other, never arises.

বা কার্য্যোৎপাদিকা শক্তিরূপে প্রকাশিত।* অনেকে আবার শক্তিই স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে কোন কার্য্য উৎপন্ন হইবার অব্যবহিত এবং নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা বা ব্যাপার সমষ্টির নামই কারণ। তাঁহাদের মতে কোন একটী অবস্থা বা ব্যাপার-বিশেষকে পৃথক্ ভাবে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করাই ভ্রম। প্রাচীন যবন দার্শনিক আরিষ্টটল্ Aristotle) চারিপ্রকার কারণ বিভাগ করেন, যথা—উপাদান (Material cause) (২) অবয়ব বা আকৃতি (Formal cause) (৩) নিমিত্ত (Efficient cause) এবং (৪) উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন (Final cause)। আধুনিক দার্শনিকগণ নিমিত্ত-কারণকেই বিশেষভাবে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমাদের ন্যায় মতে "অন্যথাসিদ্ধি শূন্যত্বে সতি, নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্বং কারণত্বং।" কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী, তথাপি কার্য্যের অনুৎপাদক,—এইরূপ ব্যাপারের নাম অন্যথা-সিদ্ধি,—যথা ঘটরূপ কার্য্যসম্বন্ধে কুলালের পিতা। 'অন্যথাসিদ্ধি' নয়, অথচ কার্য্যের অব্যবহিত এবং নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী, এরূপ ব্যাপার-কেই কার্য্যের কারণ বলা যায়। অর্থাৎ যে ব্যাপার অব্যবহিত-পূর্ব্ববর্ত্তী থাকিলেই কার্য্য হয় (অন্বয়), এবং না থাকিলে হয় না (ব্যতিরেক), এরূপ অব্যবহিত এবং নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাপারকেই সেই কার্য্যের কারণ বলা যায়। ন্যায়মতে কারণ তিন প্রকারঃ—সমবায়ী, অসমবায়ী, এবং নিমিত্ত। সমবায়ী কারণ,—ঘট সম্বন্ধে যেমন মৃত্তিকা, অসমবায়ী কারণ বলিতে সমবায়ী কারণের প্রত্যাসন্ন অর্থাৎ নিকটতম কারণ,—যথা, ঘট সম্বন্ধে, ঘট-কপালদ্বয়ের সংযোগকে বুঝায়। নিমিত্ত কারণ সমবায়ী কারণ হইতে ভিন্ন, যেমন ঘট সম্বন্ধে কুম্ভকার। বেদান্ত

* পাঠক মার্কণ্ডেয় চণ্ডোক্ত—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তি-রূপেণ সংস্থিতা" ইত্যাদির তুলনা করুন।

মতে কারণ দুই প্রকার ঃ—উপাদান এবং নিমিত্ত,—যথা ঘট সম্বন্ধে তাহার উপাদান কারণ—মৃত্তিকা, এবং নিমিত্ত কারণ—কুম্ভকার (কুলাল)।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার কৃত ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে 'কারণ' শব্দে অনেক স্থলেই উপাদান কারণকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন, যথা "কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্য"—(ঘটাদি) কার্য্য তাহার (উপাদান) কারণ (মৃত্তিকাদি) হইতে অভিন্ন। নিমিত্ত কারণকে স্থানে স্থানে তিনি 'কারক' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন, যথা ঘট সম্বন্ধে কুলাল বা কুম্ভকার। জগৎরূপ কার্য্য সম্বন্ধে শঙ্করের মত যে ঈশ্বরই তাহার উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ। তিনি বলিতেছেন, (সূত্রভাষ্য—অ—১। পা—৪। সূ—২৩ হইতে ২৭)—"ব্রহ্মজ্ঞান লাভই মুক্তির কারণ। শ্রুতি ব্রহ্মের লক্ষণ করিতেছেন ;—"জন্মাদ্যস্য যতো"—'যাহা হইতে এ সকলের জন্ম।' ঘট এবং রুচক (স্বর্ণহার) প্রভৃতির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে, উক্ত লক্ষণ দ্বারাই দেখা যায়, ঘট এবং রুচকাদির সম্বন্ধে মৃত্তিকা এবং সুবর্ণাদির ন্যায় প্রকৃতিত্ব (উপাদান কারণত্ব), এবং কুম্ভকার (কুলাল) ও সুবর্ণকারাদির ন্যায় নিমিত্ত কারণত্ব, উক্ত শ্রুতি বাক্যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই উভয়বিধ কারণত্বকেই লক্ষ্য করা হইতেছে।" আবার বলিতেছেনঃ—"ব্রহ্মের জগৎ কারণত্ব কিমাত্মক,—এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে। ব্রহ্ম কি জগতের উপাদান অথবা নিমিত্ত কারণ? ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ মাত্রই বলা যাউক, কারণ তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। কিসের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে? শ্রুতিই ঈশ্বরের জ্ঞান-পূর্ব্বক কর্তৃত্বের উল্লেখ করিতেছে। ব্রহ্মের কর্তৃত্ব ঈক্ষা বা জ্ঞান-পূর্ব্বক। 'স ঈক্ষাঞ্চক্রে' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারাই তাহা দেখা যায়। ঘটাদি সম্বন্ধেও ঈক্ষা বা জ্ঞান-পূর্ব্বক কর্তৃত্ব কুম্ভকারাদি নিমিত্ত-কারণেই দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব (অর্থাৎ কর্তৃত্ব) সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। রাজা-প্রভৃতি ঈশ্বর বা কর্তৃস্থানীয়-

দিগের কেবল নিমিত্ত-কারণত্বই দৃষ্ট হয়। অতএব পরমেশ্বরেরও নিমিত্ত কারণত্ব মাত্র স্বীকার করাই সঙ্গত"।

আবার "পরমেশ্বরের কার্য্য—এই জগৎ—সাবয়ব—অচেতন এবং অশুদ্ধ। ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। তাহার (উপাদান) কারণও ঐরূপই হওয়া সঙ্গত, যে হেতু কার্য্য এবং তাহার (উপাদান) কারণের সারূপ্য (সমানরূপতা) দৃষ্ট হয়। এই জগৎ কার্য্যের ন্যায়, ব্রহ্ম সাবয়বত্ব, অচেতনত্ব, এবং অশুদ্ধত্বাদি লক্ষণ-যুক্ত নহেন,—কারণ শ্রুতি বলিতেছেন, ব্রহ্ম "নিষ্কলং,নিষ্ক্রিয়ং, শান্তং, নিরবদ্যং নিরঞ্জনং।" অতএব শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মকারণত্ব নিমিত্তত্ব মাত্রেই পর্য্যবসিত হইতেছে। অচেতনত্ব, অশুদ্ধত্বাদি গুণযুক্ত জগতের অন্য (উপাদান) কারণ (যেমন সাংখ্যোক্ত প্রধান বা প্রকৃতি) স্বীকার করিতে হইতেছে। এই কথার উত্তরে আমরা বলিতেছিঃ—ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান কারণ বা প্রকৃতি* এবং নিমিত্ত-কারণ স্বীকার করিতে হয়। তিনি কেবল নিমিত্ত-কারণ নহেন। কেন? তাহা হইলেই শ্রুত্যুক্ত প্রতিজ্ঞা এবং দৃষ্টান্ত বাধিত হয় না। প্রতিজ্ঞা—"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতম বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিত্যাদি—যাহার শ্রবণ, মনন এবং বিজ্ঞান দ্বারা অশ্রুত বস্তু শ্রুত হয়, অচিন্তিত বস্তু চিন্তিত হয়, এবং অবিজ্ঞাত বস্তু বিজ্ঞাত হয়"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা দেখা যায় যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইলে অপর সকল অজ্ঞাত বস্তু সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ হয়। এ কথা একমাত্র উপাদান কারণ সম্বন্ধেই সত্য। একমাত্র (মৃদাদি) উপাদান কারণ বিষয়ক জ্ঞান দ্বারাই (সেই উপাদান গঠিত) অজ্ঞাত বস্তু বিষয়ক বিজ্ঞান লাভ হয়,—যেহেতু কার্য্য মাত্রেই তাহার উপাদান কারণ হইতে অভিন্ন। নিমিত্ত কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন বলা যায় না, যেহেতু শিল্পী তাহার নির্ম্মিত প্রাসাদাদি হইতে ভিন্নরূপেই সংসারে দৃষ্ট হয়।

* Compare radio-activity.

জগতের ব্রহ্ম-কারণত্ব বিষয়ক শ্রুত্যুক্ত দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে শঙ্কর পুনরায় বলিতেছেন :—"হে সৌম্য, একখণ্ড মৃত্তিকা দৃষ্টে যেমন ঘটাদি সমস্ত মৃণ্ময় বিকার-জাত সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ হয়, কারণ বিকার মাত্রেই শব্দ (স্ফোট—Logos)-জনিত নাম-রূপ ভেদমাত্র, 'মৃত্তিকা ইহাই সত্য'। এই শ্রুত্যুক্ত দৃষ্টান্ত উপাদান সম্বন্ধী। সেইরূপ একখণ্ড সুবর্ণ দৃষ্টে, মুকুট বলয়াদি স্বর্ণময় সমস্ত বিকার-জাত সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়, অথবা একটী মাত্র নখ-নিকৃন্তন (নরুণ) দৃষ্টে লৌহময় সমস্ত বিকার-জাত সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে মৃৎপিণ্ড, স্বর্ণখণ্ড, এবং নখ-নিকৃন্তন প্রভৃতির দৃষ্টান্ত সকলই ব্রহ্মের উপাদান কারণত্ব বিষয়ক। এইরূপে সর্ব্ব বেদান্তোক্ত প্রতিজ্ঞা এবং দৃষ্টান্ত উভয়ই যথাসম্ভব ব্রহ্মের প্রকৃতিত্ব বা উপাদানত্বই প্রতিপন্ন করিতেছে। আবার "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—'যাহা হইতে এই ভূত সকল জন্মে' এই শ্রুতি বাক্যে 'যতো' 'যাহা হইতে' এই অপাদান কারকের প্রয়োগ দ্বারাও ব্রহ্মের প্রকৃতিত্বই বুঝাইতেছে। অন্য স্বতন্ত্র অধিষ্ঠাতার অভাব হেতু ব্রহ্মের নিমিত্ত কারণত্বও জানা যাইতেছে। সংসারে ঘট বা স্বর্ণহাররূপ কার্য্য বা উৎপন্ন বস্তু সম্বন্ধে মৃত্তিকা বা সুবর্ণাদির উপাদান-কারণত্ব যেমন তাহা হইতে স্বতন্ত্র কুম্ভকার বা সুবর্ণকার প্রভৃতি অধিষ্ঠাতৃ-সাপেক্ষ, জগৎ কার্য্য সম্বন্ধে ব্রহ্মের উপাদান-কারণত্ব সেরূপ হওয়া সম্ভব নয়, কারণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অধিষ্ঠাতা (কুম্ভকারাদি স্থানীয়) জগৎ সৃষ্টি কার্য্য যাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্বের অপেক্ষা করিতে পারে,—ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র সেরূপ অধিষ্ঠাতা কেহ নাই। শ্রুতিই প্রকাশ করিতেছে, জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই ছিলেন।"

শঙ্কর আবার বলিতেছেন—"এতদ্বারাও দেখা যায় যে ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি বা উপাদান, যেহেতু শ্রুতি সাক্ষাৎ ব্রহ্মকেই

কারণরূপে উল্লেখ করিয়া প্রলয় এবং উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিতেছে:—
"এই সমস্ত ভূত-গ্রাম, আকাশ (ব্রহ্ম) হইতে উৎপন্ন, এবং আকাশেই লয়প্রাপ্ত হয়।" যাহা হইতে যে বস্তু উৎপন্ন হয়, এবং যাহাতে যে বস্তু লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই সেই বস্তুর উপাদান বলিয়া প্রসিদ্ধ, যথা ব্রীহি যবাদি সম্বন্ধে এই পৃথিবী।"

আবার 'এতদ্দ্বারা ও ব্রহ্মের প্রকৃতিত্ব বা জগতের উপাদানত্ব প্রতিপন্ন হয়, কারণ ব্রহ্মের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছে:—"তদাত্মানং স্বয়মকুরুত"—তিনি আপনাকে স্বয়ংই করিলেন। এতদ্দ্বারা আত্মার কর্তৃত্ব এবং কর্ম্মত্ব, উভয়ই প্রদর্শিত হইতেছে। ব্রহ্ম যিনি কর্ত্তারূপে পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ক্রিয়মানত্ব বা কর্ম্মরূপত্ব কিরূপে হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতেছি:—বিকাররূপে পরিণতি দ্বারা। সেই আত্মা পূর্ব্বসিদ্ধ হইয়াও স্বয়ংই আপনাকে বিকার বিশেষরূপে পরিণমিত করিয়াছেন। বিকাররূপে পরিণাম প্রাপ্তি মৃদাদি প্রকৃতি বা উপাদানের সম্বন্ধেই দৃষ্ট হয়। 'স্বয়ং' এই বিশেষণ শব্দদ্বারা ব্রহ্মের নিমিত্তান্তরানপেক্ষিত্ব ও প্রকাশিত হইতেছে।"

'এইরূপে ব্রহ্মের প্রকৃতিত্ব বা জগদুপাদানত্ব প্রমাণিত হইল। তবে যে আপত্তি করা হয়:—ঈক্ষা বা জ্ঞানপূর্ব্বক কর্তৃত্ব সংসারে কুম্ভকারাদি নিমিত্ত কারণেই দৃষ্ট হয়, মৃদাদি উপাদান কারণে তাহা দৃষ্ট হয় না.—ইহার উত্তর এই:—সৃষ্টি সম্বন্ধে লৌকিক দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হইতে পারে না, যেহেতু সৃষ্টি ব্যাপার অনুমানগম্য নয়। তাহা শব্দ বা শ্রুতি প্রমাণেরই গম্য। শ্রুতি অনুসারেই তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রুতি ঈক্ষিতা বা জ্ঞানময় ঈশ্বরের প্রকৃতিত্ব বা উপাদানত্বও প্রমাণ করিতেছে।

শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া শঙ্করাচার্য্য নিবৃত্ত হইতেছেন না। তিনি তর্কদ্বারাও ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব

প্রমাণ করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। "কারণ হইতে কার্য্য অনন্য",—এই মূল সূত্রের উপরে তিনি তাঁহার তর্ক প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। ভাবিলে দুঃখ হয় যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব—যথা ক্রিয়া (Work or kinetic energy), শক্তি (Potential energy), শক্তির এবং দ্রব্যের রূপ-বাতায়, এবং অনশ্বরত্ব (Conservation and transformation of energy, conservation and transformation of matter) ইত্যাদি, যাহা আজ কাল অনেকেই অবগত আছেন, শঙ্কর তাহা অবগত ছিলেন না। যদি শঙ্করের তাহা জানা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার তর্কের মূল তত্ত্ব—"কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব" প্রমাণ করিবার জন্য, তাঁহাকে এত আয়াস স্বীকার করিতে হইত না।

শঙ্কর বলিতেছেনঃ—"ইহা দ্বারাও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব প্রতিপন্ন হয়, যে কারণ থাকিলেই কার্য্যের উপলব্ধি, না থাকিলে নয়,—যেমন মৃত্তিকা থাকিলেই ঘটের, এবং তন্তু থাকিলেই পটের উপলব্ধি, না থাকিলে নয়। এইত নিয়ম যে এক বস্তু থাকিলে, তাহা হইতে ভিন্ন বস্তুর উপলব্ধি দেখা যায় না; যথা,—গো হইতে অশ্ব ভিন্ন, সেজন্য অশ্ব থাকিলে গো সত্তার উপলব্ধি হয় না। কুলালের সহিত ঘটের যদিও নিমিত্ত নৈমিত্তিক ভাব আছে, কিন্তু ভিন্নত্ব হেতু কুলাল থাকিলেও ঘটের উপলব্ধি হয় না। (আপত্তি) কিন্তু একের সদ্ভাবেও ত অন্যের উপলব্ধি সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়, যথা অগ্নির সদ্ভাবে ধূমের। (উত্তর) তাহা নয়, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেও গোপ গৃহ প্রভৃতির মধ্যে আবদ্ধ ধূম দৃষ্ট হয়"।

"কার্য্য কারণের অনন্যত্বের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিও হয়। যথা তন্তু সংস্থান সম্বন্ধে,—তন্তু পরিত্যাগ করিলে পট নামক কার্য্যের উপলব্ধি হয় না। পটরূপ কার্য্যে আতানবিতান-যুক্ত (টানা-পৈরাণ—warp and woof) তন্তু মাত্রেরই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি

হয়। সেইরূপ আবার তন্তুর মধ্যে অংশু (আঁশ)। অংশুর মধ্যে তাহার অবয়ব সকল। এই প্রকারে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারাই লোহিত, শুক্ল, এবং কৃষ্ণ, তিন প্রকার রূপ। তৎপর বায়ুমাত্র, এবং তৎপর আকাশ-মাত্রও অনুমান করা যায়। তৎপর একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম। আমাদের কথা এই যে তাঁহাতেই সকল প্রমাণের শেষ। ২—১-১৫।

আবার বলিতেছেন:—"ইহা দ্বারাও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব সিদ্ধ হয়,—যে উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণ রূপেই পরকালীন-জাত কার্য্যের কারণেতে সত্তা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে:—"হে সৌম্য, পূর্ব্বে এ সমস্ত সৎরূপেই ছিল", "পূর্ব্বে এই সমস্ত এক আত্মারূপেই ছিল",—ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা "ইদং" বা 'এই' শব্দ গৃহীত কার্য্যজাতের কারণের সহিত সামানাধিকরণ্য বুঝায়। যে বস্তু যেরূপে যাহাতে না থাকে, সেই বস্তু তাহা হইতে উৎপন্ন হয় না,—যথা বালি হইতে তৈল উৎপন্ন হয় না। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে, কার্য্য যখন তাহার কারণ হইতে অনন্য, উৎপত্তির পরেও কার্য্য তাহার কারণ হইতে অনন্য জানা যায়।" ২—১—১৬।

আবার:—"শব্দ বা শ্রুতি প্রমাণ ভিন্নও উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্তা, এবং তাহার কারণ হইতে অভিন্নত্ব যুক্তিসঙ্গত জানা যায়। যুক্তি বর্ণনা করা যাইতেছে:—সংসারে দধি, ঘট, বা স্বর্ণহারাদি যাহারা লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সর্ব্বদাই তাহাদিগকে ক্ষীর, মৃত্তিকা, অথবা সুবর্ণাদি সংগ্রহ করিতে দেখা যায়। যে দধি ইচ্ছা করে, সে মৃত্তিকা, অথবা যে ঘট ইচ্ছা করে, সে ক্ষীর কখনও সংগ্রহ করে না। যাহারা অসৎকার্য্যবাদ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ, এইমত সমর্থন করে, তাহাদের কথা সত্য হইলে, সেরূপ করাও সঙ্গত হইত। উৎপত্তির পূর্ব্বে সকলের মধ্যেই সকলের অভাব যদিও সমান বা বিশেষত্ব-রহিত তবু ক্ষীর হইতেই বা কেন দধি হইবে, মৃত্তিকা

হইতে কেন হইবে না, অথবা মৃত্তিকা হইতে কেন ঘট হইবে, ক্ষীর হইতে হইবে না? প্রাগসত্ত্ব সমান বা বিশেষত্ব-রহিত হইলেও ক্ষীরের মধ্যেই দধি বিষয়ে, এবং মৃত্তিকাতেই ঘট বিষয়ে কোনরূপ উৎকর্ষ বা 'অতিশয়' আছে, যাহা দধি-বিষয়ে মৃত্তিকাতে অথবা ঘট-বিষয়ে ক্ষীরেতে নাইঃ—তুমি হয়ত এরূপ বলিবে। তাহা যদি হয়, তবে এই অতিশয় বা উৎকর্ষবত্ত্ব হেতুই, উৎপত্তির প্রাগবস্থাতে অসৎ-কার্য্যবাদ অসিদ্ধ, এবং সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হইল। 'অতিশয়' শব্দ-দ্বারা কারণের কার্য্যোৎপাদিকা-শক্তি-বিশেষই কল্পিত হইতেছে (Compare energy, kinetic and potential)। তাহা না হইলে, যে কোন শক্ত্যন্তর অথবা শক্তির অভাবও সেই কার্য্য উৎপাদন করিতে পারিত,—কারণ অসত্ত্ব এবং অসত্ত্ব সর্ব্বত্রই সমান। অতএব কারণের আত্মভূত সেই শক্তি-বিশেষ, এবং সেই শক্তি বিশেষের আত্মভূত কার্য্য।" আবার বলিতেছেনঃ—"অশ্ব হইতে মহিষ যেমন ভিন্ন, কারণ হইতে তাহার কার্য্য, অথবা দ্রব্য হইতে তাহার গুণ সম্বন্ধে সেরূপ ভেদ-বুদ্ধির অভাব হেতু, তাহা-দের তাদাত্ম্য স্বীকার করিতে হয়।" আবার বলিতেছেনঃ— "উৎ-পত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অভাব বলিলে, উৎপত্তি অকর্ত্তৃকা, এবং বস্তু-রহিত হয়। যেহেতু উৎপত্তি একটী ক্রিয়া, অতএব গত্যাদি ক্রিয়ার ন্যায়, তাহা সকর্ত্তৃকা হইবে। ক্রিয়া অথচ অকর্ত্তৃকা কথাই বিরুদ্ধ। ঘটেরই উৎপত্তি অর্থাৎ ঘটই উৎপত্তি ক্রিয়ার কর্ত্তা। তথাপি যদি বল ঘট কর্ত্তা নয়, তবে কি ঘটোৎপত্তি ক্রিয়া অন্য-কর্ত্তৃকা কল্পনা করিতে হইবে? এরূপ হইলে ঘট-কপালাদির উৎপত্তিও অন্য-কর্ত্তৃকাই কল্পনা করিতে হইবে? তাহা যদি হয়, তবে 'ঘট উৎপন্ন হইতেছে' বলিলে, কি কুলালাদি কারণ সকল উৎপন্ন হইতেছে, বুঝিতে হইবে? কিন্তু লোকে ঘটের উৎপত্তি হইতেছে বলিলে, কুলালাদি কারণ সকল উৎপন্ন হইতেছে,

এরূপ জ্ঞান করে না। বরং কুলাল পূর্ব্বোৎপন্ন বলিয়াই প্রতীতি থাকে। যদি বলা যায়, 'কার্য্যের উৎপত্তি, এবং আত্মলাভ' বলিলে তাহার স্বীয় কারণের সত্তার সহিত সম্বন্ধলাভ বুঝায়, তবে অলব্ধাত্মক বা অবস্তু কিরূপে সম্বন্ধ লাভ করিবে? দুইটী সৎবস্তুরই পরস্পর সম্বন্ধ সম্ভবপর, সৎবস্তুর সহিত অসতের, অথবা অসৎ বস্তু-দ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধ হয় না।"

পুনরায় প্রতিপক্ষের অন্য আপত্তির উল্লেখ করিয়া তাহা খণ্ডন করিতেছেন। আপত্তি, যথাঃ—"উৎপত্তির পূর্ব্বেই যদি (ঘটাদি) কার্য্যের সত্তা থাকে, তবে (কুলালাদি) কারকের ক্রিয়া নিরর্থক হয়। (মৃত্তিকাদি) কারণ যেমন পূর্ব্বসিদ্ধ বলিয়া, তাহার স্বরূপ-সিদ্ধির জন্য কোন-কারক-ব্যাপার নিরর্থক, সেইরূপ কারণ হইতে অনন্যত্ব, অতএব প্রাক্‌সিদ্ধত্ব হেতু, কার্য্যের ও স্বরূপসিদ্ধির জন্য (কুলালাদি) কারক-ব্যাপার নিরর্থক। অথচ দেখা যায় (কুলালাদি কারক-ব্যাপার) নিরর্থক নয়। অতএব কুলালাদি কারক-ব্যাপারের অর্থবত্ত্ব সিদ্ধির জন্যই, আমাদের মত যে উৎপত্তির পূর্ব্বে (ঘটাদি) কার্য্য থাকে না।" শঙ্কর এই আপত্তি খণ্ডন করিতেছেনঃ—"সেরূপ দোষ হয় না, যে হেতু অনন্য হইলেও কারণকে কার্য্যাকারে ব্যবস্থিত করাতেই কারক-ব্যাপারের অর্থবত্ত্ব সিদ্ধ হয়। কার্য্যাকারও কারণেরই আত্মভূত, যে হেতু কারণের আত্মভূত না হইলে, কার্য্যাকারের আরম্ভই হইতে পারে না,—এই আমাদের বক্তব্য। আর 'বিশেষ' বা ভিন্ন-প্রকারত্বমাত্র দর্শন হইলেই বস্তুর অন্যত্ব সিদ্ধ হয় না। দেবদত্ত যখন আপনার হস্ত-পদ সঙ্কোচ করে, আর যখন সে তাহার হস্ত-পদ প্রসারণ করে, তখন সে বিশেষত্ব বা ভিন্নরূপত্ব-যুক্ত দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা বস্তুর ভিন্নত্ব সিদ্ধ হয় না, কারণ আমরা জানি দেবদত্ত একই। সেইরূপ প্রতিদিনই লোকের পিত্রাদির নানাপ্রকার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়,

কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাদের ভিন্ন-বস্তুত্ব সিদ্ধ হয় না, যেহেতু 'আমার পিতা', 'আমার মাতা' প্রভৃতি আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি। যদি বল যে এই সকল স্থলে জন্ম এবং মৃত্যু দ্বারা অন্তরিত না হওয়াতে, এরূপ করা সঙ্গত, কিন্তু অপরাপর স্থলে সঙ্গত নয়। তাহা বলা যুক্তি-যুক্ত নয়, যেহেতু মানুষের জন্ম-মৃত্যুর ন্যায় ক্ষীরাদির ও দধি প্রভৃতি আকার এবং অবস্থাভেদ আমাদের প্রত্যক্ষ। অদৃশ্য (অতি ক্ষুদ্র) বটবীজ প্রভৃতিরও সমান-জাতীয় অবয়বান্তর-যোগে বর্দ্ধিত অঙ্কুরাদি-রূপ যখন আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয়, তাহাকেও আমরা জন্ম বলিয়া থাকি। আবার সে সকল অবয়বের ক্ষয় হেতু, তাহার অদর্শন প্রাপ্তি হইলে, আমরা উচ্ছেদ বা মৃত্যু বলিয়া থাকি। এইরূপে জন্ম এবং মৃত্যুদ্বারা অন্তরিত বা ব্যবচ্ছিন্ন হইলেই, যদি বস্তুর ভিন্নত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অসতের সত্তালাভ, এবং সতের অসত্তালাভ হয়। তাহা হইলে শিশু যখন গর্ভস্থ থাকে, এবং সেই শিশু যখন গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, ঊর্দ্ধমুখে শয়ান থাকে, (অর্থাৎ শিশুর জন্মের পূর্ব্বে এবং পরে) দুই ভিন্ন বস্তু। এক একজন মানুষও তবে বাল্য যৌবন, এবং বার্দ্ধক্য অনুসারে ভিন্ন ব্যক্তি। এরূপ হইলে পিত্রাদি শব্দ ব্যবহার লোপ করিতে হয়। এইরূপে ক্ষণ-ভঙ্গবাদের উত্তর প্রদত্ত হইল।" আবার বলিতেছেন:—"যে মনে করে যে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ, তাহার মতে কারক-ব্যাপার বিষয়-রহিত হইয়া পড়ে,—কারণ অভাবের বিষয়ত্ব অসম্ভব,—আকাশের বধের জন্য খড়গাদি অনেক অস্ত্র ব্যবহারের ন্যায় উপহাস-যোগ্য। যদি বল যে কারক-ব্যাপারের বিষয় সেই সেই কার্য্যেরই সমবায়ী কারণ (উপাদান), তাহা বলিতে পার না; কারণ তোমাদের মতে কার্য্য তাহার সমবায়ী কারণ বা উপাদান হইতে ভিন্ন। কারক-ব্যাপারের বিষয়—সেই উপাদান—যদি কার্য্য হইতে ভিন্ন হইল, তখন তদ্দ্বারা সেই উপাদান হইতে ভিন্ন বস্তু নিষ্পন্ন

হওয়া অসম্ভব। যদি বল যে কার্য্য তাহার সমবায়ী বা উপাদান কারণের নিজেরই অতিশয় বা অবস্থা-বিশেষ মাত্র, তাহাও তুমি বলিতে পার না, কারণ তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্ব্বে উপাদানরূপে কার্য্যের সত্তা স্বীকার করিতে হইল।" এইরূপে আপত্তি সকল খণ্ডন করিয়া শঙ্কর সিদ্ধান্ত করিতেছেন :—"অতএব ক্ষীরাদি দ্রব্যই যখন দধি প্রভৃতি রূপে অবস্থান করে, তাহাই তখন 'কার্য্য' নামে অভিহিত হয়। শত বৎসর পরিশ্রম করিলে ও কারণ হইতে কার্য্যের ভিন্নত্ব দেখান যায় না। মূল কারণও সেইরূপ কার্য্যের পর কার্য্যের আকার ধারণ করিয়া, নটের ন্যায় শেষকার্য্য পর্য্যন্ত রূপান্তরিত হইয়া, সর্ব্বব্যবহারের পাত্রত্ব লাভ করে।" ২—১—১৮॥

পরের সূত্রে আবার শঙ্কর বলিতেছেন :—"পট যখন সম্যক বেষ্টিত থাকে, তখন তাহা পট কি অপর কোন দ্রব্য, স্পষ্ট বুঝা যায় না। যখন তাহা প্রসারিত করা যায়, তখন স্পষ্ট বুঝা যায় যে সেই সম্বেষ্টিত দ্রব্যই পট। প্রসারণ দ্বারা তাহা স্পষ্টরূপে জানা যায়। সম্বেষ্টিত অবস্থায় তাহা পটই, এরূপ জানা গেলেও, তাহা কত বড়, তাহা বিশেষভাবে জানা যায় না। প্রসারিতাবস্থায় তাহা কত বড়, তাহা বিশেষভাবে জানা যায়। সম্বেষ্টিত পট হইতে প্রসারিত পট ভিন্ন নয়। এইরূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে তন্তু-প্রভৃতি কারণাবস্থায় অবস্থিত পটাদি কার্য্য অস্পষ্ট থাকিয়া, তাত (তুরী) মাকু (বেম) তাতি (কুবিন্দ) প্রভৃতি কারক-ব্যাপারদ্বারা তাহা অভিব্যক্ত হইলে পটরূপে স্পষ্টতঃ গৃহীত হয়। সম্বেষ্টিত এবং প্রসারিত পটের দৃষ্টান্ত অনুসারেও, কার্য্য তাহার কারণ হইতে অভিন্ন।" ২—১—১৯॥

পুনরায় শঙ্কর বলিতেছেন :—"আবার সংসারে দেখা যায়, প্রাণ-অপান প্রভৃতি প্রাণ-বিকার প্রাণায়ামদ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া যখন কারণরূপে অবস্থিত থাকে, তখন কেবলমাত্র জীবন রক্ষা কার্য্য নিষ্পন্ন

করে, কিন্তু আকুঞ্চন প্রসারণাদি কার্য্যান্তর নিষ্পন্ন করে না। আবার সেই সকল প্রাণবিকার পুনঃপ্রবৃত্ত হইলে, জীবন রক্ষা ভিন্ন আকুঞ্চন-প্রসারণাদি কার্য্যান্তরও নিষ্পন্ন করে। অথচ প্রণাপানাদি প্রাণ-বিকার প্রাণেরই রূপান্তর ভিন্ন অন্য কিছু নয়, —যেহেতু সমীরণ-স্বভাব বিষয়ে তাহাদের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নাই। কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্বও এইরূপ। অতএব সমস্ত জগৎ যখন ব্রহ্মকার্য এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তখন এই শ্রুত্যুক্ত প্রতিজ্ঞা "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতংমতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি" সিদ্ধ হইল। ২—১—২০॥

---

(২৬) দেহাত্মবাদ খণ্ডন।

দার্শনিক জগতে শঙ্করের প্রধান কীর্ত্তি চার্ব্বাকের দেহাত্মবাদ খণ্ডন। চার্ব্বাক বলিতেছেন:—"অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমি-বার্য্য-নিলানলঃ। চতুর্ভ্যঃ খলুভুতেভ্যশ্চৈতন্য মুপজায়তে। কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ॥ অহং স্থূলঃ কৃশোস্মীতি সামানাধিকরণ্যতঃ। দেহঃ স্থৌল্যাদি যোগাচ্চ সএবাত্মা নচাপরঃ। মম দেহোহয়ং ইত্যুক্তিঃসম্ভবেদৌপচারিকী" ইতি (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ)॥ ভূমি বারি অনিল, এবং অনল এই চারিটী স্থূলভূত। কিণ্বাদি সুরাবীজের পৃথক অবস্থানকালে তাহাদেরমধ্যে কোন মাদকত্বগুণ থাকে না। কিন্তু সে সকল পরস্পর মিলিত হইলেই মাদকত্ব গুণ লাভ করে। ভুমি-বারি প্রভৃতি স্থূল ভূতেরও সেইরূপ পৃথক্ অব-স্থানকালে তাহাদের চৈতন্য গুণ থাকে না, কিন্তু এ সকল পরস্পরের সহিত রাসায়নিক যোগে মিলিত হইলে, চৈতন্যরূপ গুণ-বিশেষ লাভ করে। আমরা বলিয়া থাকি 'আমি স্থূল' বা 'আমি কৃশ'—ইহা দ্বারা স্থূলত্বের সহিত আমিত্বের সমানাধিকরণতা (যেই স্থূল সেই আমি) বুঝায়। স্থূলত্বাদির সহিত দেহেরই যোগ। স্থূলত্ব-কৃশত্ব দেহেরই

ধর্ম্ম। স্থূলত্বাদি দেহধর্ম্মের সহিত আমিত্বের সামানাধিকরণ্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে আমিত্ব বা আত্মত্ব ও দেহেরই ধর্ম্ম-বিশেষ। দেহের অতিরিক্ত কোন আত্মা নাই। তবে যে সময়ে সময়ে আমরা "আমার দেহ" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকি, তাহা ঔপচারিক অথবা কথার কথা মাত্র। পাঠক দেখিতেছেন যে চার্ব্বাকের মতে আত্মা দেহেরই ধর্ম্ম-বিশেষ (Cf "Function of the brain"), শঙ্করের মত তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। শঙ্করের মতে দেহ এবং সমস্ত দৃশ্য জগৎ এক আত্মারই উপাধি বা গুণ বিশেষ মাত্র। জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপ ত্রিপুটী এক ভূমা মহান্ আত্মারই প্রকাশ-ভেদ মাত্র।

চার্ব্বাকের মতে "না প্রতাক্ষং প্রমাণং'। প্রত্যক্ষ ভিন্ন তিনি কোন প্রমাণই স্বীকার করেন না। আকাশ প্রত্যক্ষ করা যায় না, এজন্য তিনি প্রসিদ্ধ পঞ্চভূত হইতে আকাশকে বহিস্কৃত করিয়া দিয়া ভূতচতুষ্টয় -মাত্র স্বীকার করিতেছেন। চার্ব্বাক্ অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না :—"তস্মাদবিনাভাবস্য দুর্ব্বোধতয়া নানুমানস্যাবকাশঃ।" অতীত এবং অনাগত যখন কেহ জানে না, তখন ব্যাপ্তি বা অবিনা-ভাবের (Uniformity of nature) জ্ঞান সম্ভবপর নয়। ব্যাপ্তি-জ্ঞানই অনুমানের ভিত্তি। ব্যাপ্তিজ্ঞান যখন অসম্ভব তখন অনুমানের কোন্ ভিত্তি নাই। অগ্নির দাহিকা শক্তি আজ আছে, কিন্তু কল্য যে থাকিবে, অথবা লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বে যে ছিল, কে বলিবে? অতএব অগ্নিতে হাত দিলেই যে হাত দগ্ধ হইবে, এমন কথা বলা যায় না। অনু-মানের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া চার্ব্বাক্ কিন্তু নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিতেছেন, কারণ কিম্বাদি সুরা-বীজের মদ-শক্তিলাভ দৃষ্টে দেহাকারপরিণত ভূতচতুষ্টয়ের চৈতন্যশক্তি-লাভ অনুমান করা তাঁহার পক্ষে শোভা পায় না।

শঙ্করের দেহাত্মবাদ খণ্ডনের কথা পূর্ব্বে একবার উল্লেখ

করা হইয়াছে। শঙ্কর তাঁহার সূত্র-ভাষ্যে (অ-৩। পা-৩। সূ-৫৪)
বলিতেছেন:—"রূপাদি দেহ-ধর্ম্ম যতক্ষণ দেহ থাকে ততক্ষণ থাকে,
কিন্তু মৃতাবস্থায় দেহ থাকা সত্ত্বেও প্রাণনাদি চেষ্টা থাকে না।
আবার রূপাদি দেহধর্ম্ম একজনেরটা আর একজনে প্রত্যক্ষ
দেখিতে পায়, কিন্তু চৈতন্য-স্মৃতি প্রভৃতি আত্মধর্ম্ম জীবিতকালেও
একজনেরটা আর একজনে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় না।" এজন্য
কিম্বাদি অথবা অন্য কোন জড় বস্তুর গুণের সহিত চৈতন্য-স্মৃতি
প্রভৃতির তুলনা হয় না। অতএব মৃত্যুর পরে চৈতন্যের অপ্রত্য-
ক্ষস্বরূপ যে হেতু অবলম্বন করিয়া চার্ব্বাক্ চৈতন্যকে দেহের
ধর্ম্ম বলিয়া অনুমান করিতেছেন, দেহের জীবিতকালে ও সেই চৈতন্য
অপ্রত্যক্ষ থাকাতে সেই হেতুই সৎপ্রতিপক্ষ, অর্থাৎ তাহা দ্বারা
পক্ষে কি বিপক্ষে কোনরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় না।
তাহাই প্রদর্শন করিতেছেনঃ—"যদিও জীবিতাবস্থায় দেহ থাকিলে
চৈতন্য-স্মৃতি প্রভৃতির সদ্ভাব নিশ্চয়রূপে অনুমান করা যায়,
কিন্তু দেহ জীবিত না থাকিলে চৈতন্য-স্মৃত্যাদির অভাব নিশ্চয়রূপে
অনুমান করা যায় না, কারণ এই দেহ পতিত হইলেও, চৈতন্য-
স্মৃতি প্রভৃতি আত্মধর্ম্ম অন্যত্র কিম্বা দেহান্তরে সঞ্চারিত হইয়া
থাকিতে পারে, সুধু এই সংশয় দ্বারা ও পরপক্ষ প্রতিষিদ্ধ
হইতেছে। যাহারা ভূত সকল হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়
বলিতে চায়, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে চৈতন্য
কিংস্বরূপ? লোকায়তিকেরা (চার্ব্বাক্) ভূতচতুষ্টয়ব্যতিরিক্ত
কোন তত্ত্ব বা মৌলিক পদার্থেরই সত্তা স্বীকার করে না।
'চৈতন্য' পূর্ব্বভাবী (Antecedent) রূপে আছে বলিয়াই তদ্দারা
ভূত এবং ভৌতিক গুণ সকলের অনুভব জন্মে। ইহা যদি স্বীকার
করা যায়, তবে যেহেতু ভূত এবং ভৌতিক গুণ সেই চৈতন্যেরই
বিষয় (objects of consciousness) এবং উত্তর-ভাবী (Con-

sequent), অতএব সেই পূর্ব্বভাবী চৈতন্য উত্তরভাবী ভৌতিকের ধর্ম্ম হইতে পারে না। ভৌতিক গুণের নিজের উপরে নিজের ক্রিয়া কথাই বিরুদ্ধ। অগ্নি দাহ করে বলিয়া অগ্নি নিজেকে কখনও দাহ করে না। চৈতন্য যদি ভূত বা ভৌতিকের ধর্ম্ম হইত, তবে ভূত এবং ভৌতিকের ধর্ম্ম তাহার বিষয় হইত না,—যেমন রূপ কখনও নিজের বা পরের রূপ দেখে না। কিন্তু চৈতন্য বাহ্য এবং আধ্যাত্মিক সকল বস্তুকেই আপনার জ্ঞানের বিষয় করে। আবার যেমন আমরা চৈতন্যকে ভূত-ভৌতিক বিষয়ের উপলব্ধিকারক বলিয়া জানি, সেইরূপ আবার ভূত-ভৌতিক হইতে আত্মা যে পৃথক্ তাহাও আমরা জানি,—কারণ আমরা বুঝি যে আমাদের আত্মা উপলব্ধৃ বা জ্ঞাতৃস্বরূপ, কিন্তু ভূত-ভৌতিক সেরূপ নয়,—জ্ঞেয় মাত্র। এতদ্দারা ও আত্মার দেহ-ব্যতিরিক্তত্ব এবং নিত্যত্ব প্রতিপন্ন হয়, কারণ উপলব্ধির স্বরূপ বা জ্ঞাতৃত্ব সর্ব্বদাই একরূপ। আবার 'আমি উহা দেখিয়াছিলাম', এইরূপ কালান্তর বা অবস্থান্তর যোগ হইলেও আমরা নিজেকে সর্ব্বদা উপলব্ধৃরূপে অনুভব করি। স্মৃতি প্রভৃতি ক্রিয়ার সম্ভাবনা দ্বারা ও আত্মার দেহ-ব্যতিরিক্তত্ব প্রতিপন্ন হয়। অপরদিকে প্রদীপ প্রভৃতি উপকরণ বা সাহায্যকারী থাকিলেই উপলব্ধি হয়, না থাকিলে উপলব্ধি হয় না,—তাহা বলিয়া উপলব্ধিকে যেমন প্রদীপাদি-ধর্ম্ম বলা যায় না,—সেইরূপ দেহ থাকিলে উপলব্ধি হয়, দেহ না থাকিলে উপলব্ধি হয় না,—বলিয়া উপলব্ধি দেহধর্ম্ম হইবে না। প্রদীপাদির ন্যায় দেহ ও উপকরণ বা সাহায্যকারী স্থানীয় মাত্র হইতে পারে। আবার উপলব্ধির সহিত দেহের কোন অচ্ছেদ্য যোগ দেখা যায় না। স্বপ্নকালে দেহ যখন নিশ্চেষ্ট থাকে, তখনও নানা প্রকার উপলব্ধি দর্শন হয়। অতএব দেহ হইতে পৃথক আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে কোন সংশয় নাই।"

স্বপ্নপ্রত্যক্ষ ঘটনা সকল সম্বন্ধে শঙ্কর আরও বলিতেছেন *;—"লোকে যখন নিদ্রা যায় তখনও (জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায়) বড় ছোট নানারূপ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে, এবং জাগ্রত হইবার পূর্ব্বে সে মনে করে যে সে সকল তাহার নিশ্চিত বিজ্ঞান (Perception),—জাগ্রৎ-প্রত্যক্ষেরই মতন নিশ্চিত,—স্বপ্নকালে সে মনে করে না যে, জাগ্রৎ প্রত্যক্ষের ছায়া স্বরূপ স্বপ্নকালে সে সর্প-দংশন, এবং উদকস্নানাদি কার্য্য প্রত্যক্ষ করে। যদি বল এ সকল কার্য্য মিথ্যা, তাহার উত্তরে বলিতেছি ঃ—যদিও স্বপ্নকালের সর্পদংশন এবং উদকস্নানাদি কার্য্য স্বপ্ন হইতে উত্থিত হইলে পর, জাগ্রতের তুলনায়, মিথ্যা বলিয়াই প্রতীয়মান হয়, তথাপি স্বপ্নদ্রষ্টা যে তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিল, তাহা সত্য, কারণ জাগ্রত হইলে পরেও সেই স্বপ্ন-প্রত্যক্ষের ফলভূত অবগতি (বা স্মৃতি) বাধিত হয় না। স্বপ্ন হইতে উত্থিত ব্যক্তি যদিও মনে করে যে স্বপ্নদৃষ্ট সর্পদংশন এবং উদক-স্নানাদি মিথ্যা, কিন্তু সে যে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহাও মিথ্যা এরূপ মনে করে না। স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্ন-প্রত্যক্ষ-জনিত অবগতি অবাধিত থাকাতে, দেহমাত্রাত্মবাদ দূষিত হইল।" (অ-২। পা-১। সূ-১৪। ব্রহ্ম-সূত্র)। জাগ্রৎ কালে যেমন জাগ্রৎকালীন দেহাদি-সম্বন্ধী অবগতি বাধিত হয় না, বা সত্য বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ স্বপ্নকালেও স্বপ্নকালীন দেহাদির অবগতি বাধিত হয় না, বা সত্য বলিয়া মনে হয়। স্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইলে পরেও সকলেই মনে করে যে স্বপ্নে সে সকল দর্শন হইয়াছিল, কেহ মনে করে না যে দর্শন হয় নাই। অবগতির অবাধিতত্ব বা সত্যত্ব স্মৃতি স্বপ্ন দৃষ্ট দেহাদি সম্বন্ধে যেরূপ, জাগ্রদ্দৃষ্ট দেহাদির ও সেইরূপ।

* স্বপ্ন বিষয়ে মাণ্ডুক্যোপনিষদের গৌড়পাদীয়কারিকায় এবং তাহার শাঙ্কর ভাষ্যে যে আলোচনা আছে তাহা বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এই কারণে স্বপ্ন-দৃষ্ট দেহাদি হইতে যেমন আত্মাকে বা 'আমাকে' পৃথক্ মনে করা হয়, জাগ্রদ্দৃষ্ট দেহাদি হইতেও আত্মা বা 'আমি' পৃথক্ বলিয়া সিদ্ধ হইতেছে। *

অনেক সময়ে স্বপ্ন-ব্যাপারকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না,—কারণ বহুদূরে যাহা ঘটিতেছে, তাহা ঘরে বসিয়া স্বপ্নে প্রত্যক্ষ হইতে শোনা যায়। দূরদেশে স্বামী পরলোক গমন করিতেছে, ঠিক্ সেই সময়ে ঘরে থাকিয়া স্ত্রী তাহা স্বপ্নে প্রত্যক্ষ করিতেছে।† আবার অনেক সময়ে স্বপ্নে ভাবি ঘটনার পূর্ব্বাভাস লাভ হয়।

সে যাহা হউক, চার্ব্বাক্ যেরূপ বলিতেছেন, "আমি স্থূল", "আমি কৃশ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আপাততঃ দেহের সহিত 'আমি' বা আত্মার সামানাধিকরণ্য বুঝায় বটে, কিন্তু স্বপ্নকালে সেই সামানাধিকরণ্য থাকে না,—কারণ তখন দেহজ্ঞান থাকে না, কিন্তু আমি-জ্ঞান থাকে। বস্তুতঃ 'আমি' শব্দের নানা অর্থ। পঞ্চদশী

---

* Compare : "We are such stuff as dreams are made on". Shakespeare.

"I dare not guess ; but in this life
Of error, ignorance, and strife,
Where nothing is, but all things seem,
And we, the shadows of a dream,—
It is a modest creed, and yet
Pleasant if one considers it,
To own that death itself must be,
Like all the rest, a mockery."

Shelley.

† "Star to star vibrates light : may soul to soul,
Strike thro' a finer element of her own ?"

Tennyson.

Compare Clairvoyance, telepathy, hypnotism &c.

বলিতেছেন "অহং" শব্দের তিনটী অর্থ,—একটি মুখ্য আর দুইটি গৌণ। অজ্ঞ সংসারী লোকেরা কূটস্থ-চৈতন্য (জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের অতীত বা তুরীয় ব্রহ্ম), আভাস-চৈতন্য বা জীব, এবং শরীর, এ তিনটি একত্র করিয়া, এবং ভ্রম বশতঃ একটাতে আর একটা আরোপ (অন্যোন্যাধ্যাস) করিয়া, 'অহং' শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইহাই মুখ্য অর্থ বলা যায়। (২) তত্ত্বজ্ঞানীরা কখন কখনও আভাস-চৈতন্য বা জীবকে পৃথক্ ভাবে 'অহং' শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করিয়া থাকেন। ইহাকে গৌণ অর্থ বলা যায়। (৩) তত্ত্বজ্ঞানী কখন কখনও কূটস্থ-চৈতন্য বা তুরীয় ব্রহ্মকে পৃথক্ ভাবে 'অহং' শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করিয়া থাকেন ("ব্রহ্মাহমস্মি" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি)। ইহাও গৌণ অর্থ।"* অজ্ঞ লোকেরা আবার অনেক সময়ে বিশেষ বিচার না করিয়া, অনাত্মা পরিবর্ত্তনশীল দেহাদি উপাধি-সমষ্টি-মাত্রের প্রতিই 'অহং' বা 'আমি' শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। 'আমি স্থূল হইয়াছি' ইত্যাদি বাক্যে 'আমি' শব্দে দেহাদি উপাধি-সমষ্টিকেই বুঝাইতেছে। অর্থাৎ 'আমি' শব্দ বাচ্য উপাধি-সমষ্টির মধ্যে স্থূলত্বরূপ উপাধির যোগ হইয়াছে। ইহা দ্বারা দেহাত্মবাদের কোন প্রমাণ হয় না। অনেক সময়ে আবার লোকে 'আমার দেহ' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, 'আমি' হইতে দেহকে পৃথক্ করিয়া থাকে।

এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে জড় চেতনের (Matter and spirit) মধ্যে এতকাল যে প্রাচীর ছিল, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি

---

* একো মুখ্যো দ্বাবমুখ্যাবিত্যর্থ স্ত্রিবিধোঽহমঃ ॥৯॥
অন্যোন্যাধ্যাস-রূপেণ কূটস্থাভাসয়োর্বপুঃ।
একীভূয় ভবেন্ মুখ্যস্তত্র মূঢ়ৈঃ প্রযুজ্যতে ॥ ১০ ॥
পৃথগাভাস-কূটস্থাবমুখ্যৌ তত্র তত্ত্ববিৎ।
পর্য্যায়েণ প্রযুঙ্ক্তেঽহং শব্দং লোকে চ বৈদিকে ॥ ১১ ॥
পরিচ্ছেদ ৭—পঞ্চদশী।

আধুনিক বিজ্ঞানাচার্য্যদিগের অনুশীলনের ফলে সেই প্রাচীর বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। প্রকাশিত (Kinetic) হউক, বা অপ্রকাশিত (Potential) হউক, যাহা যেখানে আছে,—জড়ত্বই হউক, আর চেতনত্বই হউক, তাহাই সেখানে প্রকাশ পায়, যাহা যেখানে নাই, তাহা সেখানে প্রকাশ পায় না। তিল হইতেই তৈল হয়, বালি হইতে হয় না। আধুনিক দর্শন এবং বিজ্ঞান যে মৌলিক পদার্থের আভাস প্রদান করিতেছে, তাহা জড় (Matter), এবং চেতনের (Spirit), অথবা গ্রাহ্য (Object) এবং গ্রাহকের (Subject) মিলিত আধার। অথবা চুম্বকের (magnet) উত্তর এবং দক্ষিণ কেন্দ্রের ন্যায়, জড় এবং চেতন, অথবা গ্রাহ্য এবং গ্রাহক উভয় সেই একই মৌলিক পদার্থের দুইটি কেন্দ্র মাত্র। সেই মৌলিক পদার্থই বেদান্তে ব্রহ্মনামে অভিহিত (২৮)। (Compare Hegel's "Identity of contraries"

সে যাহা হউক, আমরা চার্ব্বাকের কথারই আলোচনা করিতেছিঃ— আত্মা বা চিৎপদার্থ যদি নাই থাকে, এবং জড় মাটি-জল-বায়ু-গঠিত দেহমাত্রই যদি আত্মা বা 'আমি' হয়, তবে স্মৃতি কিরূপে সম্ভবপর? শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যে বলিতেছেন :--- "স্মৃতি প্রভৃতি ক্রিয়ার সম্ভাবনা দ্বারাও আত্মার দেহ-ব্যতিরিক্তত্ব প্রতিপন্ন হয়"—৩—৩—৫৪॥ আমরা তাহাই কিঞ্চিৎ বিশদরূপে প্রদর্শন করিতেছি। দেহের পরমাণু সকল নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অস্থি-দন্ত-কেশ-নখাদি যে সকল অবয়ব অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী, তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে কোন চৈতন্য লক্ষিত হয় না, অথবা অস্থি-দন্ত-কেশ-নখাদিতে কেহ বিশেষভাবে আমিত্ব ও আরোপ করে না। প্রোটোপ্লাজম্ (Protoplasm) বা দেহ-সার নামীয় যে জড় পদার্থ, চৈতন্যের ভৌতিক আধার বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে (Physical basis of life), এই দেহরূপ রাসায়নিক আগারেই (Chemical Laboratory) তাহা জীবন লাভ করিয়া ক্ষণকাল মাত্র তথায় অবস্থানান্তে মৃত্যুদশা-

প্রাপ্ত হইয়া, রূপান্তরিত, এবং নিয়ত শরীর হইতে বহিষ্কৃত হইতেছে। শরীর যথার্থই 'করি-কর্ণ-লোল'। দৈহিক পরমাণুসকলের গতাগতি নদীর স্রোতবেগ হইতেও দ্রুতগামী। এজন্য আজ আমার যে শরীর আছে, কাল আমার ঠিক্ সেই শরীর থাকে না। রাসায়নিক সংযোগের গুণে, দৈহিক পরমাণু সকলই ক্ষণিক চৈতন্য লাভ করিয়া, আত্মা নামের যোগ্য হয়,—চার্ব্বাকের একথা সত্য হইলে,—যে দৈহিক পরমাণু-নিচয় যে ব্যাপারের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সম্বদ্ধ, সেই ব্যাপার সম্বন্ধেই মাত্র সেই পরমাণু-নিচয়ের চৈতন্যগুণ সম্ভবপর। কিন্তু সেই পরমাণু-নিচয় সেই ব্যাপারের সহিত সম্বদ্ধ হইবার পূর্ব্বের ঘটনা সম্বন্ধে, তাহার পক্ষে চৈতন্য বা জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইবে? দশবৎসর পূর্ব্বের দৈহিক পরমাণু (Protoplasm) আজ একটীও তোমার শরীরে নাই, অথচ তুমি কিরূপে দশবৎসর পূর্ব্বের ঘটনা আজ স্মরণ করিতে সক্ষম হইতেছ? অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ কিরূপে তাহার বাল্য-জীবনের ঘটনা সকল স্মরণ করিতে সক্ষম হইতেছে? এই স্মৃতি কার্য্য কাহার? স্মৃতি কাহাকে আশ্রয় করিয়া, এই দৈনন্দিন দৈহিক বিপ্লব হইতে উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইতেছে? যে পরমাণুচয় যে ঘটনা দেখে নাই, সেই পরমাণুচয় সেই ঘটনা স্মরণ করিবে কিরূপে? যদি বল যে এক পরমাণু-সমষ্টির সহিত সম্বদ্ধ চৈতন্য-স্মৃতি, তাহার স্থলাভিষিক্ত ভিন্ন পরমাণু-সমষ্টিতে সংক্রামিত হয়, তবে জিজ্ঞাস্য এইঃ—কিরূপে তাহা সম্ভব? যদি জ্ঞান-স্মৃতি প্রভৃতি এক পরমাণু-সমষ্টি হইতে ভিন্ন পরমাণুসমষ্টিতে গমন করিতে সক্ষম হয়, তবে সেই চৈতন্য আর গুণ (Abstract quality,) রহিল না, গুণী (Concrete thing) হইল, একটি পৃথক্ বস্তু হইল, দেহ হইতে আত্মা পৃথক হইল। যদি বল যে চৈতন্য এই দেহেরই স্থান-বিশেষের গুণ, এবং যে পরমাণু সেই স্থান

অধিকার করে, সেই পরমানুই সেই চৈতন্য লাভ করে। তাহার উত্তর এই:—চৈতন্য যদি গুণ (Abstract quality) মাত্র হয়, তবে তাহা গুণীকে (Concrete thing) আশ্রয় না করিয়া নিরধিষ্ঠান-ভাবে থাকিতে, অথবা এক পরমানু হইতে অন্য পরমানুতে গমনা-গমন করিতে পারে না। দৈহিক পরমানু সকলের দৈনন্দিন বিপ্লবের মধ্যে চৈতন্য-স্মৃতি যে গুণীকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাই দেহ হইতে ভিন্ন, এবং তাহাই আত্মা। অতএব দেহের অথবা দৈহিক পরমানুর বিনাশে (Amputation et cetera) আত্মার চৈতন্যের বিনাশ হয়, মনে করা যাইতে পারে না। "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ" চার্ব্বাকের এই আশঙ্কার ও কোন ভিত্তি থাকে না।

প্রত্যক্ষ-অনুভূতি সকলের নিকটেই "জ্যেষ্ঠপ্রমা।" এখন দেখা যাউক প্রত্যক্ষ দেহাত্মবাদ বিষয়ে কি বলে? ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ-জন্য জ্ঞানের নামই 'প্রত্যক্ষ।' অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে আমি একটী বৃক্ষ দেখিতেছি। এস্থলে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজনিত জ্ঞাত বস্তু কি? আমার চক্ষু এখানে, বৃক্ষ তাহা হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে। ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ কোথায়? তুমি হয়ত বলিবে সেই বৃক্ষ হইতে আলো প্রতিভাত হইয়া আমার চক্ষুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া, আমার দর্শন-স্নায়ুর (retina) উপরে সেই বৃক্ষের ছবি অঙ্কিত করে। সেই ছবিই কি প্রত্যক্ষ? বরং বিপরীত। সেই ছবি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ত দূরের কথা, তাহার সম্বন্ধে কাহারও কোন রূপ সাক্ষাৎ জ্ঞানই নাই। সেই বৃক্ষচ্ছবি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, বৃক্ষ প্রকাণ্ড। সেই ছবির সহিত ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ হইল, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই জন্মিল না। বৃক্ষের সহিত ইন্দ্রি-য়ের সন্নিকর্ষ হইল না, অথচ বৃক্ষের জ্ঞান জন্মিল। প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় বৃক্ষ প্রত্যক্ষ নয়, বৃক্ষজ্ঞানই মাত্র প্রত্যক্ষ।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বৃহদারণ্যক ভাষ্যে তাঁহার প্রতিপক্ষ বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীর আপত্তি বর্ণন করিতেছেনঃ—"বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ ঘট বা প্রদীপাদি বাহ্য বস্তু কিছুই নাই। যে বস্তু ব্যতিরেকে অন্য বস্তুর উপলব্ধি হয় না, সেই অন্য বস্তু, সেই বস্তু-মাত্রাত্মকই দৃষ্ট হয় (যথা মৃত্তিকা এবং ঘট)। স্বপ্ন-বিজ্ঞান-গ্রাহ্য ঘট-প্রদীপাদি বস্তুর স্বপ্ন-বিজ্ঞান ব্যতিরেকে উপলব্ধি হয় না বলিয়া যেমন স্বপ্ন-দৃষ্ট ঘট-প্রদীপাদি স্বপ্ন-বিজ্ঞান মাত্রই জানা যায়, সেইরূপ জাগ্রদ্দৃষ্ট ঘট-প্রদীপাদির ও জাগ্রদ্বিজ্ঞান ব্যতিরেকে উপলব্ধি হয় না, অতএব তাহাও জাগ্রদ্বিজ্ঞানমাত্র হওয়াই যুক্তি-সঙ্গত"। পৃঃ—৭৩৮। (Compare "Esse is percipii)। শঙ্কর তাঁহার প্রতিপক্ষের এই আপত্তি সম্বন্ধে এইমাত্র বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেনঃ— "বাহ্যবস্তু যে আপনি ও একান্তই স্বীকার করেন না, তাহা নয়।" "স্বপ্নে বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত বস্ত্বন্তরের অভাব হইলেও জাগ্রৎকালে বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত বস্ত্বন্তরের সদ্ভাব দেখা যায়, এবং তদ্দ্বারাই জাগ্রৎকালে বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত বস্ত্বন্তরও সিদ্ধ হয়" ইত্যাদি। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি (২৫-৬) যে শঙ্করের মতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে আত্মা-ভিন্ন কোন বস্ত্বন্তর নাই, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জাগ্রদ্দৃষ্ট বস্তু সকল যেখানে যেরূপ দেখা যায়, সেরূপই আছে।

শঙ্কর বলিতেছেনঃ—"যেমন আদিত্য-জ্যোতি বস্তুভেদ সকল প্রকাশ করিয়া তাহাতে সংযুক্ত হয়, এবং স্বয়ং অবিভক্ত থাকিলেও হরিত-নীল-পীত-লোহিতাদি বর্ণ ভেদে, সেই সেই বস্তুর আকারে প্রকাশিত হয়, আত্মার জ্যোতি ও সেইরূপে এই নিখিল জগতের এবং ইন্দ্রিয়াদির প্রকাশকরূপে তাহাদেরই আকার ধারণ করে"। শঙ্কর বিজ্ঞানবাদী (Idealist) নহেন, কারণ তিনি ব্যবহারিক (Phenomenal) দৃষ্টিতে বাহ্য বস্তুর সত্তা স্বীকার

করেন, যদিও পরমার্থিক দৃষ্টিতে (Noumenal) এক আত্মা ভিন্ন কোন বস্তুই স্বীকার করেন না। বৌদ্ধ-বিজ্ঞান-বাদী (Idealist) আত্মারও অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এজন্য শঙ্কর তাহাদের বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদীর মতে জ্ঞানের বিচিত্রতা মাত্রই প্রত্যক্ষগম্য *। বার্কিলে (Berkeley) কি হিয়ুমের (Hume) বিজ্ঞানবাদের সহিত বৌদ্ধ মতের কতক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আমরা বলিয়া থাকি বটে যে চিনি সুমিষ্ট, গোলাপ ফুল সুন্দর সুগন্ধিযুক্ত, বরফ সুশীতল, সঙ্গীত সুললিত। কিন্তু মিষ্টত্ব, সৌন্দর্য্য, সুগন্ধ, শীতলতা ইত্যাদি জ্ঞাতারই অনুভূতি মাত্র। জ্ঞাতাই সেই অনুভবের একমাত্র আশ্রয়। প্রকৃতপক্ষে চিনিতে মিষ্টত্ব নাই, কারণ চিনি কখনও আপনাকে মিষ্ট বলিয়া অনুভব করে না। গোলাপফুলে সৌন্দর্য্য বা সুগন্ধ নাই, কারণ গোলাপ কখনও আপনাকে সুন্দর বা সুগন্ধি বলিয়া অনুভব করে না। সেইরূপ বরফে কোন শীতলতা নাই। সঙ্গীতেও কোন মাধুর্য্য নাই, কারণ তাহাদেরও অনুভব-শক্তি নাই। বস্তু থাকুক বা না থাকুক, কলকৌশল দ্বারা (Bioscope) দর্শন-স্নায়ুর উপরে অনেক সময়ে এইরূপ ক্রিয়া করা যায়, যে বস্তু নাই, অথচ বস্তুজ্ঞান জন্মিতেছে। মনোযোগের অভাবেও আবার আমরা যাহাকে বস্তুর ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ বলি, তাহা সত্বেও তজ্জনিত কোন

---

* মাধবাচার্য্য বলিতেছেন যে কাশ্মীরে শারদাপীঠে আরোহণ কালে শঙ্করের প্রতি প্রশ্ন হইয়াছিল:—বৌদ্ধদিগের বিজ্ঞান-বাদের সহিত তোমার মতের কি পার্থক্য বল, "বিজ্ঞানবাদশ্চ চ কিং বিভেদকং ভবন্মতাদ্ব্রূহি।" তদুত্তরে তিনি বলেন:—বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদী ক্ষণিকত্ব এবং বহুত্ব স্বীকার করে। বেদান্তবাদীর মত যে সম্বিৎ নিত্য এবং এক। ইহাতেই মহাপার্থক্য। "বিজ্ঞান-বাদী ক্ষণিকত্ব মেবামঙ্গীকরোতি বহুত্বমেষঃ। বেদান্তবাদী স্থিরসম্বিদেকেত্যঙ্গী-চকারেতি মহান্ বিশেষঃ।" শঙ্কর দিগ্বিজয় ১৬-৭৬॥

জ্ঞানোদয় হয় না। এই সকল কারণে মিল্ (Mill) প্রভৃতি প্রাচ্য দার্শনিকগণ বহু অনুশীলনের পর চার্ব্বাকের ভূত-চতুষ্টয়কে "অনুভবের স্থায়ী সম্ভাবনা" মাত্র সংজ্ঞা (Permanent possibilities of sensation) প্রদান করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। অধুনাতন বৈজ্ঞানিকেরা আরও অগ্রসর হইতেছেন। তাহারা ভৌতিক পদার্থকে শক্তির কেন্দ্র (Centers of energy) মাত্র বলিতেছেন। শক্তি বলিতে আমাদের পুরুষকার ভিন্ন অন্য কোন শক্তিরই ধারণা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। চার্ব্বাকের ভূত-চতুষ্টয় এইরূপে এক বিশ্বপুরুষের পুরুষকারের প্রকাশ মাত্র। দেশ এবং কালকেও তাহারা অন্তঃকরণ-বৃত্তি (forms of thought) বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন,—দেশ (space) অর্থে সহভাবিত্ব-বুদ্ধি (Notion of co-existence), এবং কাল অর্থে পারম্পর্য্য-বুদ্ধি (Notion of sequence)। এইরূপে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়াও আমরা পরিণামে আত্মাতেই উপনীত হইতেছি। চার্ব্বাকের "ভূমিবার্য্যনিলানলঃ" পরিণামে আত্মারই উপাধি হইয়া দাড়াইতেছে। আত্মা বা চৈতন্য আর তবে কিরূপে তাহাদের ধর্ম্মবিশেষ হইবে ?

এখন পাঠকের মনে প্রশ্ন হইতে পারে যে আমাদের গৃহাদি দৃশ্য বস্তু যদি দর্শকের বিজ্ঞানমাত্র হয়, তবে আমরা যখন বিদেশে যাই, যদি আমাদের গৃহের নিকটে দর্শক কেহ না থাকে, তখন কি আমাদের গৃহ নাই ? তাহার উত্তর বার্কিলে (Berkeley) দিতেছেন :—সেই বিশ্বাত্মা ঈশ্বর আছেন, তাঁহার জ্ঞানেতে তোমার গৃহ থাকিলেই তোমার গৃহ আছে। যদি ঈশ্বর, কি দেবতাবিশেষ, কি কোন প্রেতাত্মাও না মান, তখন কিরূপ হইবে ? গৃহ অর্থই দর্শন-ব্যাপারের বিষয়-বিশেষ। দর্শক না থাকিলে দর্শন নাই, দর্শন না থাকিলে দৃশ্য,—তোমার

গৃহ—ও নাই। দর্শক নাই, অথচ দৃশ্য গৃহ আছে, এরূপ কথা আকাশ-কুসুমের সুগন্ধির ন্যায় বিরুদ্ধ। তবে পূর্ব্ব-দর্শনের স্মৃতি আমাদিগের থাকে। যতক্ষণ গৃহ নাই বলিয়া না জানিয়াছি ততক্ষণ,—কেহ দেখুক আর না দেখুক,—পূর্ব্ব-স্মৃতি-বশতঃ গৃহ আছে বলিয়াই আমাদের ধারণা থাকিবে। সেই ধারণা হয়ত মিথ্যা। হয়ত ইতিমধ্যে আগুন লাগিয়া আমার গৃহ ভষ্মসাৎ হইয়া গিয়াছে, অথচ আমার ধারণা যে গৃহ আছে। প্রকৃত-পক্ষে গৃহ থাকার অর্থ মিলের (Mill) মতে এই, যে দর্শক কেহ উপস্থিত থাকিলে গৃহ দেখিতে পাইবে। জ্ঞাতা থাকিলে জ্ঞান, জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞেয়। এইরূপে আত্মাই জড়-জগতের ও ভিত্তিভূমি হইতেছে। প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে যে কথা, অনুমান, উপমান, অথবা শাব্দ,—সকল প্রকার প্রমাণ সম্বন্ধেই সেই এক কথা। যাহা কিছু প্রত্যক্ষ বা অনুমানাদি-সিদ্ধ, ব্যবহারিক বা সাপেক্ষ (Relative) রূপে সকলই সত্য হইলেও, পারমার্থিক (Absolute) রূপে সকলই চিদাত্মার উপাধি মাত্র;—এবং চিদাত্মার সত্তা সাপেক্ষ। শঙ্কর বলিতেছেন, পরব্রহ্ম "পৃথিব্যাদেরাকাশান্তস্য সত্যস্য সত্যং" পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত যাবৎ সত্য পদার্থের ও সত্য।

কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন যে ভূ-তত্ত্ববিৎ ভূগর্ভস্থ স্তর সকল পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মানুষের জন্মের লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেও জড়-জগৎ ছিল,—অতএব জড়-জগৎ কিরূপে আত্মার উপাধিমাত্র হইবে? তাহার উত্তর এই:—মানুষেতেই আত্মার আরম্ভ,—কেহ বলে না। প্রত্যক্ষজাত জড় বস্তু যদি আত্মার উপাধিই হইল, অনুমান-গম্য,—ভূবিদ্যারই হউক আর যে বিদ্যারই হউক,—জড় বস্তু অন্য কিছুই হইতে পারে না। "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।" জড়-বস্তু প্রত্যক্ষই কর, আর অনুমানই কর, আজ কালের সম্বন্ধেই কর, আর লক্ষ বৎসর

পূর্ব্বের কি পরের সম্বন্ধেই কর, অনুমানকারীকে সেই সঙ্গেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই অনুমানের পূর্ব্ববর্ত্তীরূপে জ্ঞাতা বা আত্মার ও কল্পনা করিতে হইবে। ঈশ্বরই হউক, অথবা জীবই হউক,—যদি কেহ জানিবার থাকিত, তবে এইরূপ দেখিতে পাইত,—ইহার বেশী ভূ-তত্ত্ববিদের বলিবার অধিকার নাই। স্বপ্নকালীন দৃষ্ট জড় বস্তুর ন্যায়, জাগ্রৎকালীন দৃষ্ট জড় বস্তুও পরমার্থতঃ চিদাত্মার উপাধি ভিন্ন অন্য কিছু মনে করিবার কারণ নাই। জ্ঞাতা বা আত্মাতেই জগতের উৎপত্তি, জ্ঞাতাতেই স্থিতি, জ্ঞাতাতেই তাহার লয়। শঙ্করের মতে জ্ঞেয় ব্রহ্মাণ্ড পরমার্থতঃ এক ভূমা জ্ঞাতাতেই পর্য্যবসান। শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যে বলিতেছেন :—"আত্মত্ব হেতুই আত্মার নিরাকরণ-শঙ্কা হইতে পারে না। আত্মা কাহারও আগন্তুক নয়, কারণ স্বয়ংসিদ্ধ। আত্মা কখনও আত্ম-সম্বন্ধী প্রমাণান্তর দ্বারা সিদ্ধ হয় না। অপ্রমাণিত কোন বস্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিতে হইলেই আত্মাকে পূর্ব্ববর্ত্তীরূপে গ্রহণ করা হয়। আকাশাদি কোন বস্তুই প্রমাণ-নিরপেক্ষ স্বয়ং-সিদ্ধ নয়। কিন্তু আত্মা প্রমাণাদি-ব্যবহারের নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং তাহার আশ্রয়ভূত,—অতএব প্রমাণ ব্যবহারের পূর্ব্বেই স্বয়ংসিদ্ধ। এরূপ বস্তুর নিরাকরণ সম্ভব হয় না। আগন্তুক বস্তুই নিরাকৃত হয়, স্বরূপ কখনও নিরাকৃত হয় না, কারণ যে নিরাকরণ করিবে, আত্মা তাহারই স্বরূপ। অগ্নির উষ্ণতা কখনও অগ্নিদ্বারা নষ্ট হয় না। (সেইরূপ, আমা দ্বারা 'আমির' ও নিরাকরণ সম্ভব হয় না)। আমিই এখন বর্ত্তমান বস্তু জানিতেছি, আমিই অতীত অথবা অতীততর বস্তু জানিয়াছিলাম, আমিই অনাগত এবং অনাগততর বস্তু জানিব। অতীত, অনাগত, এবং বর্ত্তমান,—কাল-ভেদে জ্ঞাতব্য বস্তুর অন্যথাভাব (পরিবর্ত্তন) হয়। জ্ঞাতার কোন অন্যথাভাব হয় না। আত্মা সদা-বর্ত্তমান-স্বভাব। বর্ত্তমান-স্বভাবত্ব হেতু

আত্মার অন্যথা-স্বভাবত্ব কল্পনা করা যায় না।" (ব্রহ্ম-সূত্র-ভাষ্য অ-২। পা-৩। সূ-৭॥)

চার্ব্বাক্ জ্ঞাতা বা আত্মাকে বিস্মৃত হইয়া, তাহার ভূত-চতুষ্টয় লইয়া প্রসিদ্ধ "দশম ন্যায়" ভ্রমেরই অভিনয় করিয়াছেন মাত্র। কোথায় চার্ব্বাক্ আত্মাকে দেহের ধর্ম্মবিশেষ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, আর কোথায় শঙ্কর আসিয়া স্রোত ফিরাইয়া দিয়া, এই বহির্জগৎকেই এক পরমাত্মার মধ্যে প্রকটিত জ্ঞানের বিচিত্রতা মাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। দেহাত্মবাদই আধুনিক সভ্য জগতের মহাব্যাধি, দেহাত্মবাদই সয়তানের চিরন্তন দুর্গ। "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণংকৃত্বা ঘৃতংপিবেৎ"—সভ্যতার ইহাই মূলমন্ত্র। সেই দেহাত্মবাদ খণ্ডন করিয়া, সয়তানের কেল্লা অধিকার করিয়া, শঙ্কর নিশ্চয়ই সমস্ত মানবজাতীর বিশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শঙ্করের অপরাপর দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

(২৭) আত্মানাত্ম-বিবেক।

(ক) কার্য্য-করণ-সঙ্ঘাত।

শঙ্করাচার্য্য যে কেবল দেহাত্মবাদ খণ্ডন করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন তাহা নয়। তিনি ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধ্যাদির ও আত্মত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে দেহেন্দ্রিয়, মনবুদ্ধি,—সকলই কার্য্য বা বৃত্তি (functions), অথবা করণ বা যন্ত্র (organs) মাত্র। এ সকলের মিলিত নাম কার্য্যকরণসঙ্ঘাত বা পিণ্ড। আত্মা বা 'আমির', সহিত এ সকল সমবায়-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ যেমন গুণ-গুণী, বা ক্রিয়া এবং ক্রিয়াবান্, আত্মা হইতে ভিন্ন ও বলা যায় না, অভিন্নও বলা যায় না,—ভেদাভেদ সম্বন্ধ (Different but not separable)। আত্মা গ্রাহক, এ সকল গ্রাহ্য। আত্মা চৈতন্য-জ্যোতিঃ-স্বরূপ, সকলের অবভাসক, এ সকল অবভাস্য, প্রদীপ সম্বন্ধে ঘটাদির ন্যায়। আত্মা এ সকলের নিত্য আশ্রয়, এ সকল অনিত্য, আত্মার আশ্রিত ব্যাপার অথবা উপাধিমাত্র। অধুনাতন দার্শনিকগণ মৌলিক মনোবৃত্তি সকলকে তিন ভাগে বিশ্লেষণ করিয়াছেন:—বিষয়বিজ্ঞান (Cognition), ভাব বা আবেগ (Feeling or Emotion), এবং ক্রিয়া (Conation)। আমাদের শাস্ত্রে সকলই মন বা অন্তঃকরণের বৃত্তি,—লঘুত্ব গুরুত্ব অনুসারে অথবা প্রকার ভেদে মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞান, চিত্ত, অহঙ্কার, ইত্যাদি নানা নামে বিভক্ত। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার

সূত্রভাষ্যে বলিতেছেনঃ—"অন্তঃকরণই নানা স্থানে মন, বুদ্ধি বিজ্ঞান, চিত্ত ইত্যাদি বিবিধ নামে উক্ত হইয়াছে। কখনও বা এই সকলের বৃত্তি-বিভাগ ও করা হয়ঃ—যথা, সংশয়াদি বৃত্তি-যুক্ত মন, নিশ্চয়াদি বৃত্তি-যুক্ত বুদ্ধি। যাহার সাবধানতা বা অনবধানতা অনুসারে বস্তুর উপলব্ধি এবং অনুপলব্ধি জন্মে, তাহারও নাম মন (Attention)। শ্রুতি বলিতেছেঃ—অন্যমনস্ক ছিলাম, তাই দেখি নাই, অন্যমনস্ক ছিলাম, তাই শুনি নাই। কামাদি ও মনেরই বৃত্তি।" ব্র-সূ-২-৩-৩২। পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের প্রত্যক্ষ (Sensation), প্রত্যক্ষানুভূতি (Perception), প্রত্যয় (Concept), স্মৃতি (Memory), কল্পনা (Imagination), ন্যায় (Reason), সকলই আমাদের শাস্ত্রে মনের কার্য্য। কখনও বা মনকে এবং বুদ্ধি বিজ্ঞানকে পৃথক্ করা হয়; "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"—এজন্যে সংশয়াত্মক মনকে অনেক স্থলে বিনাশের দ্বার, এবং নিশ্চয়াত্মক বিজ্ঞানকে মুক্তির দ্বার বলা হইয়া থাকে। দেহেন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিতে অহং-বোধের নাম অহঙ্কার। মন যখন স্বীয় বিষয়ের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে, তখন তাহাকে চিত্ত বলা যায়। বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চ, আকাশাদি পঞ্চ, বুদ্ধ্যাদি, অবিদ্যা, কাম, এবং কর্ম্ম,—এই পুর্য্যষ্টকের মিলিত নাম শরীর। পঞ্চীকৃত বা মিশ্র ভূত সকল হইতে উৎপন্ন স্থূল শরীর, এবং অপঞ্চীকৃত বা অমিশ্র ভূত সকল হইতে উৎপন্ন সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর। তাহাদের মতে সূক্ষ্মশরীর স্বপ্নকালে স্থূল-শরীর হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করে। দেহেন্দ্রিয়মন-বুদ্ধ্যাত্মক কার্য্যকরণ-পিণ্ডে আত্মত্বাভিমান, তাহাদের মতে অন্যোন্যাধ্যাস-জনিত (False identification from continuous association) (বিবেক চূড়ামণি)। বস্তুতঃ বেদান্তের দ্রষ্টা বা ঋষিগণ দার্শনিক ছিলেন না, এবং বিংশ শতাব্দির দার্শনিকের দৃষ্টিতে তাহাদের বিচার করিতে হইবে না। তাহারা ব্রহ্মবাদী এবং ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু,

সেরূপ দৃষ্টিতেই তাঁহাদের কথারও বিচার করিতে হইবে। যে প্রণালী-মতে আলোচনা করিলে ব্রহ্ম বা আত্মানুভূতির পথ সহজ হয়, দার্শনিকের চক্ষে তাহাতে দোষ থাকিলেও, তাঁহারা সেই প্রণালীই অবলম্বন করিয়াছেন। দার্শনিকের চক্ষে উপমা এবং কবিত্বের পথ বিপ্রতিপত্তি-জনক, লোকের ধারণার পক্ষে সে পথই সহজ,—এজন্য তাঁহাদের আলোচনাতে, উপমা এবং কবিত্বের পথই প্রশস্ত মনে করিয়া, তাঁহারা সর্ব্বদা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা নানা প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা দেহেন্দ্রিয়-মনাদির বৃত্তি-ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেনঃ—"আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, অধ্যবসায়-লক্ষণ বুদ্ধিকে সারথি (রথ-স্বামী), মনকে অশ্ব-সংযমন রজ্জু (রাশ), ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব, এবং রূপরসাদি বিষয় সকলকে অশ্বগণের গম্য মার্গের ন্যায় জানিবে।" শঙ্কর বলিতেছেন ঃ—"মনের যোগ (Attention) থাকিলেই ইন্দ্রিয়গণ কার্য্যক্ষম হয়, এজন্য মনকে অশ্বের রাশ বলা হইয়াছে।" কঠ-১-৩-৩,৪ ॥ আত্মা দেহেন্দ্রিয়-সঙ্ঘাত হইতে ব্যতিরিক্ত,—ইহা দেখাইবার জন্য কঠোপনিষদ্ বলিতেছে ঃ—"ইন্দ্রিয়ানি পরাক্" বা ইন্দ্রিয় সকল বহির্মুখ, বাহ্য বিষয়ই মাত্র উপলব্ধি করে। আত্মা প্রত্যক্‌রূপ বা অন্তর্মুখ,—সকলকে আপনার অন্তরস্থ করে। 'আত্মা' শব্দের ধত্বর্থ ব্যাপক। ইন্দ্রিয়াদি-গম্য বিষয় সকল আত্মাই গ্রহণ করে, আত্মাই ভোগ করে, এবং আত্মা দ্বারা সে সমস্ত ব্যাপ্ত হয়। ইহাতেই আত্মা-নামের সার্থকতা। শঙ্কর,—কঠ-২-১-১ ॥

(খ) পঞ্চকোষরূপে দেহেন্দ্রিয়াদির কল্পনা।

আত্মার সহিত দেহেন্দ্রিয়মনাদির সম্বন্ধ লোকের নিকটে সহজ-বোধ্য করিবার জন্য ঋষি শঙ্করাদির বীজকোষের উপমা (analogy)

গ্রহণ করিয়া স্থূলত্ব-সূক্ষ্মত্বের তারতম্যানুসারে পুরুষের মধ্যে উত্তরোত্তর পাঁচটি কোষ (zones) কল্পনা করিয়াছেন। ইহাকে কবি-কল্পনা মনে না করিয়া, দার্শনিক তত্ত্ব মনে করিলে, আমরা ভ্রমে পতিত হইব, কারণ বস্তুতঃ এই সকল মানস কোষ-পঞ্চকের পরস্পরের মধ্যে কোন সীমান্তঃ রেখা সম্ভবপর নয়, বরং সকলই একাকার। যাহা হউক দৃষ্টান্তদ্বারা আমরা পঞ্চকোষের কল্পনাটি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। একটা রক্ত জবাফুল হাতে লইয়া পরীক্ষা করিলে, আমরা দেখিতে পাই প্রথমে একটা সবুজ বহিরাবরণ (Calyx), তাহার ভিতরে একটা লাল পুষ্পদলের আবরণ (Corolla), তাহার ভিতরে পরাগের সূত্রগুলি (Filaments) নিম্নভাগে মিলিত হইয়া একটা আবরণ, তাহার পর বীজ-কোষের আবরণ (Pistil), তাহার ভিতরে কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের (Carpels) আবরণ, তাহার ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ অতি গোপনে রক্ষিত। এই উপমার অনুযায়ী পুরুষের মধ্যেও উত্তরোত্তর সূক্ষ্মতর পাঁচটী কোষ (zones) কল্পনা করা হইতেছে:—যথা, (১) বহিরাবরণ স্থানীয় অন্নময় কোষ (স্থূল শরীর), (২) প্রাণময় কোষ বা শ্বাস-বায়ু দ্বারা রক্ষিত শারীরিক জীবন (Muscular and Vital energy), (৩) মনোময় কোষ (Thought, desire, perplexity, misery), (৪), বিজ্ঞানময় কোষ বা জীব (Egotism, high thinking, energetic action), এবং (৫) আনন্দময় কোষ (Pleasure, happiness and Beatitude),—যাহার ভিতরে গোপনে রক্ষিত বীজের ন্যায় আত্মা বা ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশমান। বেদান্তসার প্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থে এই পঞ্চকোষ-বিভাগ বেদান্ত-শাস্ত্রের একটী মৌলিক দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু উপনিষদে সেরূপ নয়। পঞ্চকোষের কল্পনার মূল তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে দৃষ্ট হয় (ব্রহ্মবল্লী, ১-৬ অনুবাক)।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে:—"সেই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি সকল, ওষধি সকল হইতে অন্ন, অন্ন হইতে (এই শরীরধারী) পুরুষ,—সেই এই পুরুষ অন্নরসময় বা অন্নরসেরই বিকার-স্বরূপ। "ইহার উপরে শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন:—"এস্থলে বিদ্যা দ্বারা 'এই পুরুষই অন্তরতম ব্রহ্ম, এই প্রত্যয় উৎপাদন করাই অভিপ্রেত। কিন্তু বাহ্য-আকার-বিশেষ-যুক্ত অনাত্ম-বস্তুতেই সাধারণ লোকের আত্মা-ভিমান-বুদ্ধি নিবদ্ধ। কোন বাহ্য অবলম্বন-বিশেষ আশ্রয় না করিয়া, সেই লোকবুদ্ধিকে সহসা অন্তরতম প্রত্যগাত্মার গ্রহণে সমর্থ করা, বা বাহ্য-অবলম্বন-শূন্য করা অসাধ্য। ইহা জানিয়া উপনিষদ্ শাখা-চন্দ্র-নিদর্শনের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছেন।" কাহাকেও দ্বিতীয়ার চন্দ্র দেখাইতে হইলে যেমন প্রথমে সেই চন্দ্রের এবং দ্রষ্টার সহিত সমসূত্রবর্ত্তী কোন স্থূল বৃক্ষশাখার উপরে দর্শকের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হয়, "উপনিষদ্‌ও সেইরূপ করিয়াই লোক-বুদ্ধিকে অন্তরে প্রবেশ করাইতেছেন, 'সেই পুরুষই এই অন্নরসময় কোষ' এবং এই শির (মস্তক)ই সেই অন্নরসময় পুরুষের শির। প্রাণময়াদিকোষ মস্তকাদি-শূন্য। পাছে তাহাদের মস্তকাদি দেখা যায় না বলিয়া লোকে মনে করে, অন্নময়েরও মস্তকাদি নাই,—এজন্য ইহা বলা হইয়াছে। এই দক্ষিণ বাহু তাহার দক্ষিণ পক্ষ, বাম বাহু তাহার উত্তর পক্ষ। দেহ-মধ্য-ভাগ তাহার অঙ্গ সকলের সম্বন্ধে আত্মা। নাভির নিম্নস্থ ভাগ তাহার পুচ্ছ বা প্রতিষ্ঠা (আশ্রয় ভূমি)। এইরূপে অন্নময়ের শির-পক্ষ প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়া, শিল্পী যেমন মাটীর ছাঁচে (Mould) ঢালিয়া গলিত তাম্রাদি-প্রতিমা নির্ম্মাণ করে, ঋষি সেইরূপ পরবর্ত্তী প্রাণাদিময়েরও শিরঃ-পক্ষাদিযুক্ত রূপ কল্পনা করিতেছেন।"

"তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ।"—ইহার উপরে শঙ্কর বলিতেছেন।—"অন্নময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত আত্মা সকলের অভ্যন্তরতম ব্রহ্মকে বিদ্যাদ্বারা প্রত্যগাত্মা বা প্রতিশরীরস্থ অন্তরতম জীবাত্মারূপে দেখাইবার ইচ্ছায়, শাস্ত্র অবিদ্যাকৃত পঞ্চকোষ রূপ আবরণের অপনয়নদ্বারা,—অনেক তুষ-যুক্ত কোদ্রব বা কোদো (Paspalum Scrobiculatum) শস্যের ন্যায় বিতুষীকরণ দ্বারা, যেন তদন্তর্গত তণ্ডুল বাহির করিতেছেন ঃ— পূর্ব্বোক্ত অন্নরসময় পিণ্ড হইতে ব্যতিরিক্ত, তাহারই অভ্যন্তরস্থ প্রাণময়ই (প্রাণ-বিকার বা বায়ু-বহুল) আত্মা। বস্তুতঃ তাহাও পিণ্ডেরই ন্যায়,—মিথ্যা আত্মারূপে পরিকল্পিত। এই প্রাণময় দ্বারা সেই অন্নরসময় আত্মা পূর্ণ,—দৃতি বা কর্ম্মকারের ভস্ত্রা (Bellows) যেমন বায়ু দ্বারা পূর্ণ। মনুষ্য-পশুগণ সকলেই প্রাণক্রিয়াদ্বারাই চেষ্টাশীল। অতএব পরিচ্ছিন্ন অন্নময় আত্মা দ্বারাই যে প্রাণীগণ আত্মাযুক্ত, তাহা নয়। তবে কি? তদন্তবস্থিত, অথচ সাধারণ সর্ব্বপিণ্ডব্যাপী প্রাণময় দ্বারাই মনুষ্যগণ আত্মাযুক্ত। এইরূপে মনোময়াদি কোষ পূর্ব্বের পূর্ব্বের ব্যাপী, উত্তরোত্তর সূক্ষ্মতর"। (আত্মা শব্দের ধাত্বর্থ ও ব্যাপীত্ব)।—(এখানে আর শস্যাদির বীজ কোষের উপমা চলে না,—কারণ অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম, বহিস্থ স্থূলের ব্যাপী, বলা হইতেছে)। "আনন্দময়ে তাহাদের শেষ। এই সকল কোশ অবিদ্যাকৃত আকাশাদি ভূত হইতে আরব্ধ। এই সকল কোশদ্বারাই সকল প্রাণী আত্মাযুক্ত। পরমার্থতঃ প্রাণীগণ,—আকাশাদির ও কারণ, স্বাভাবিক, নিত্য, অবিকৃত, সর্ব্বগত, পঞ্চ-কোশের অতীত, সত্যজ্ঞানানন্তস্বরূপ সর্ব্বাত্মা দ্বারাই আত্মাযুক্ত। পরমার্থতঃ সেই সর্ব্বাত্মাই সকলের আত্মা, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। প্রাণই যেহেতু প্রাণীগণের জীবন, এবং প্রাণাপগমে মরণ প্রসিদ্ধ, অতএব পূর্ব্বোক্ত অন্নময় সম্বন্ধে, এই প্রাণময়ই শারীর (অন্নময়

শরীরে অবস্থিত, অতএব শারীর) আত্মা। এই প্রাণময় হইতে ভিন্ন, ইহা হইতে অন্তরতর আত্মা মনোময়। 'মন' শব্দে সঙ্কল্পাত্মাত্মক অন্তঃকরণ বুঝায়,—তৎ-ময়—মনোময়, যেমন পূর্ব্বোক্ত অন্নময়। ইহাই প্রাণময়ের অন্তরস্থ আত্মা। যজুরাদি মন্ত্র তাহার শির,—যেহেতু মনোবৃত্তিদ্বারাই মন্ত্রাদির আবৃত্তি সাধিত হয়। প্রাণময়ের সম্বন্ধে এই মনোময়ই শারীর (প্রাণময় শরীরে অবস্থিত) আত্মা। এই মনোময় হইতেও অন্তরস্থ অন্য আত্মা বিজ্ঞানময়। মনোময় এবং বিজ্ঞানময়ই বেদেরও আত্মা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বেদার্থ-বিষয়ক নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির নাম বিজ্ঞান। তাহাই অন্তঃকরণের অধ্যবসায়াত্মক ধর্ম্ম,—অধ্যবসায়ময়, অতএব বিজ্ঞানময় বলা যায়। প্রমাণভূত নিশ্চিত বিজ্ঞানদ্বারা নিষ্পন্ন আত্মার নাম বিজ্ঞানময়। প্রমাণ-বিজ্ঞান-পূর্ব্বকই যজ্ঞে প্রবৃত্তি জন্মে। কর্ত্তব্য বিষয়ে যাহার নিশ্চিত-বিজ্ঞান জন্মিয়াছে,—কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে তাহারই অন্তরে তৎপ্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। সকল কর্ম্মের প্রথমই শ্রদ্ধা, অতএব বলা হইতেছে, শ্রদ্ধাই বিজ্ঞানময়ের শির। ঋত (কর্ম্ম ফল) এবং সত্য তাহার বাহুদ্বয়। যোগ বা চিত্ত সমাধান বিজ্ঞানময়ের আত্মা স্থানীয়। 'মহ' বা প্রথমজাত মহত্তত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভ তাহার পুচ্ছ, এবং প্রতিষ্ঠার ভূমি,—যেমন বৃক্ষলতা সম্বন্ধে পৃথিবী। বিজ্ঞানই যজ্ঞানুষ্ঠান করে, যেহেতু বিজ্ঞানবান্ই শ্রদ্ধাদি-পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত মনোময় সম্বন্ধে, এই বিজ্ঞানময়ই শারীর (মনোময় শরীরে স্থিত) আত্মা।"

"এই বিজ্ঞানময় হইতে ভিন্ন, তাহা হইতেও অন্তরতর আত্মা আনন্দময়। এই বিজ্ঞানময়, তদ্দ্বারা পূর্ণ।" ইহার উপরে শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন:—"আনন্দময় বলাতে কার্য্যাত্মারই প্রতীতি হয়। বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয়। অধিকরণের তাৎপর্য্য-দ্বারাও তাহাই বোধ হয়। অন্নাদিময় ভৌতিক কার্য্যাত্মা সকলই

এস্থলে আলোচ্য। সেই আলোচনারই অন্তর্গত "আনন্দময়।" ময়ট্ প্রত্যয় ও বিকারার্থেই দেখা যায়। অন্নময়েরই ন্যায়। অতএব আনন্দময়কে ও কার্য্যাত্মা বলিয়াই প্রতীতি হওয়া উচিত। "সংক্রমন-ক্রিয়াদ্বারা ও তাহাই বোধ হয়। কারণ পরে বলা হইবে "স য এবম্বিৎ এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি"—যেব্যক্তি অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করে, সে এই (অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং) আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রামিত হয়। অনাত্মস্বরূপ কার্য্যাত্মা সকলেতেই সংক্রমন বা গমন সম্ভব হয়। সংক্রমণ ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে আনন্দময় আত্মার শ্রুতিতে উল্লেখ, অন্নাদিময় আত্মাতে উপ-সংক্রমনের ন্যায়। প্রকৃত আত্মার নিজের মধ্যে নিজের উপ-সংক্রমণ বা গমন হইতে পারে না। তাহা আলোচ্য বিষয়েরও বিরুদ্ধ, এবং অসম্ভব। আত্মার নিজের মধ্যে নিজের উপসংক্রমণ বা গমন সম্ভব নয়। কারণ আত্মার আপনার হইতে আপনার ভেদাভাব, এবং ব্রহ্মই আত্মা। উপসংক্রমণ কর্ত্তা সেই আত্মা হইলে, তাহার শির আদি কল্পনা অসঙ্গত। আকাশাদির কারণ স্বরূপ, অকার্য্য-পতিত, বা কার্য্য জগতের অতীত, সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-লক্ষণ ব্রহ্মের শির আদি অবয়বের রূপ-কল্পনা অসঙ্গত। শ্রুতি তাঁহাকে অদৃশ্য নেতি নেতি বা বিশেষ-রহিত বলিতেছে। অতএব এস্থলে আনন্দময় ও কার্য্য-পতিত বা কার্য্যাত্মা, পরমাত্মা নয়। বিদ্যাকর্ম্মের ফলই আনন্দ, তাহারই বিকার আনন্দময়। তাহাই যজ্ঞাদির হেতুভূত, বিজ্ঞানময়ের ও অভ্যন্তরস্থ। ভোক্তার প্রয়োজন সাধনই জ্ঞানকর্ম্মের ফল। অতএব আনন্দময় পূর্ব্বোক্ত সকলের অন্তরতম। বিদ্যাকর্ম্মের উদ্দেশ্য প্রিয়াদি ফল-লাভ। বিদ্যাকর্ম্ম প্রিয়াদি ফলযুক্ত। অতএব ফলরূপ প্রিয়াদির সহিত তাহার সন্নিকর্ষহেতু, আনন্দময়ের পক্ষে বিজ্ঞানময়ের অভ্যন্তরস্থ সঙ্গত। আনন্দময় প্রিয়াদিবাসনা-নিষ্পন্ন, বিজ্ঞানময়ের আশ্রয়ভূত, স্বপ্নে এরূপ

উপলব্ধি হয়। (সুষুপ্তি কালে বিজ্ঞানময়ের লয় হয়, কিন্তু সুখে নিদ্রিত ছিলাম, সুষুপ্তি সম্বন্ধেও এরূপ সুখের স্মৃতি হয়)। ইষ্ট পুত্রাদি-দর্শন জন্য প্রিয়ই আনন্দময়ের শির—প্রাধান্য হেতু শির স্থানীয়। মোদ বা প্রিয়াদি-লাভ-জন্য হর্ষ তাহার দক্ষিণ পক্ষ বা বাহু, প্রমোদ বা প্রকৃষ্ট হর্ষ তাহার উত্তর পক্ষ বা বাহু। "আনন্দ তাহার আত্মা। ব্রহ্ম তাঁহার পুচ্ছ এবং অধিষ্ঠান ভূমি"। আনন্দ সুখের সহিত সমানজাতীয়, অতএব আনন্দকে প্রিয়াদি-সুখাবয়ব সকলের আত্মা বলা যায়, কারণ আনন্দ সুখাদিতে নিয়ত সম্বন্ধ (অনুস্যূত)। এজন্য আনন্দ পর-ব্রহ্ম স্বরূপ। পুত্রমিত্রাদি-বিষয়-বিশেষ-রূপ উপাধিযুক্ত অন্তঃকরণ-বৃত্তি-বিশেষে, শুভ-কর্ম্ম-দ্বারা লব্ধ সেই পরব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হইলে, অন্তঃকরণ তমঃদ্বারা অপ্রচ্ছন্ন হইলে, এবং (সত্ত্বদ্বারা) প্রসন্ন হইলে, তাহাতে পরব্রহ্মের অভিব্যক্তি হয়। পূর্ব্বোক্ত সুখও বিষয় সুখ বলিয়াই লোক-প্রসিদ্ধ। সেই সুখাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তি-বিশেষের প্রত্যুপস্থাপক শুভ-কর্ম্মের অনবস্থিতত্ব বা অনিশ্চিতত্ব হেতু, সেই সুখেরও ক্ষণিকত্ব। তপস্যা বা চিত্ত সমাধান, এবং তমোঘ্নবিদ্যাদ্বারা, ব্রহ্মচর্য্য, এবং শ্রদ্ধাদ্বারা যখন সেই অন্তঃকরণ নির্ম্মলত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন সেই একাগ্র প্রসন্ন অন্তঃকরণে সেই আনন্দ, যেখানে যতদূর সম্ভব, সেখানে ততদূর, উৎকর্ষ লাভ করে। এজন্য বলা হইবে,—"তিনি রসস্বরূপ, সেই রস-স্বরূপকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়। তিনিই আনন্দ দান করেন। প্রাণীগণ এই আনন্দের কণামাত্র লাভ করিয়া জীবন ধারণ করে।" এইরূপে বাসনার তৃপ্তিজনিত উৎকর্ষাপেক্ষা, উত্তরোত্তর আনন্দের শতগুণ শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ বলা হইবে। এইরূপে পরমার্থ-ব্রহ্ম-বিজ্ঞান দ্বারা উৎকৃষ্যমান, আনন্দময় আত্মার ব্রহ্মই শ্রেষ্ঠ স্বরূপ, যাহাকে সত্যজ্ঞানানন্তস্বরূপ বলা যায়, যাহাকে লাভ করিবার উদ্দেশে অন্নাদিময় কোষপঞ্চক উপন্যস্ত বা বর্ণিত হইয়াছে। যাহা তাহা-

দের সকল অপেক্ষা অন্তরতম, যাহা দ্বারা সেই সকলই আত্মাযুক্ত, সেই ব্রহ্মই সকলের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়-ভূমি। তাহাতেই অবিদ্যাকল্পিত সমস্ত দ্বৈতভাবের শেষ। সেই অদ্বৈত ব্রহ্মই আনন্দময়ের প্রতিষ্ঠা, একত্বেই আনন্দময়ের ও অবসান। এই আনন্দময়ই পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানময়ের শারীর (বা বিজ্ঞানময় শরীরে অবস্থিত) আত্মা।" শঙ্করের পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে কর্ত্তারূপী জীবই বিজ্ঞানময়, এবং ভোক্তারূপী জীব আনন্দময় কোশ। শঙ্করের কথার তাৎপর্য্য এই যে প্রকৃষ্ট জ্ঞান কর্ম্মদ্বারা চিত্ত নির্ম্মল এবং সুসমাহিত হইলে, শেষ কোশে অর্থাৎ আনন্দময় কোশে আনন্দময় বা আনন্দ-স্বরূপ পর-ব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়, এজন্য এই শেষ কোশকেও আনন্দময় কোশ বলা যায়। পরব্রহ্মই উক্ত কোশ-পঞ্চকের সারভূত অন্তরস্থ তণ্ডুল-স্থানীয় আত্মা।

(গ)। ব্রহ্ম-সূত্রে "আনন্দময়"।

শঙ্করের মতে শরীরধারী পুরুষের এই কোশ-পঞ্চক কোদো শস্যের তুষ পরম্পরার (glumes) ন্যায়। (শঙ্কর মান্দ্রাজি সাধু, এজন্য কোদো শস্য (millet) তাঁহার নিকটে সুপরিচিত)। কোদো শস্যের সারভূত তণ্ডুল, শেষ তুষদ্বয় মধ্যে অবস্থিত। সেইরূপ এই কোশ-পঞ্চকের অন্তরতম আনন্দময় কোশের অভ্যন্তরে, তাহার সারভূত তণ্ডুল-স্থানীয় আনন্দ-স্বরূপ সত্য-জ্ঞান-অনন্ত ব্রহ্ম অবস্থিত। ব্রহ্মানন্দ লাভে উল্লাসিত হয় বলিয়া, অথবা একাগ্রমনে সেই অন্তরতম কোশে অনুসন্ধান করিলে, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অন্তরে প্রকাশিত হয় বলিয়া, এই কল্পিত শেষ কোশেরও নাম আনন্দময়। মর্দ্দনদ্বারা যেরূপ শস্যের আবরণ-কোশ সকল তণ্ডুল হইতে পৃথক্ করা যায়, পুরুষের এই কল্পিত পঞ্চকোশ সেরূপ নয়, কারণ ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সীমান্ত রেখাই নাই,—একটির সহিত অন্যটি যেন মিলিয়া রহিয়াছে, অথবা যেন সকলে একত্র ঘনী-

ভূত পিণ্ডাকার বা সঙ্ঘাতরূপে আছে। বস্তুতঃ এই পঞ্চকোশ-ভেদ (Zones) দেহেন্দ্রিয়-মনাদির বৃত্তি ভেদেরই রূপক কল্পনা মাত্র। লোকবুদ্ধির স্থূলত্ব-সূক্ষ্মত্ব ভেদ অনুসারে প্রত্যেকটি কোশই আত্মা বলিয়া কল্পিত হয়। কিন্তু এ সকল কার্য্যাত্মামাত্র। অন্তরতম শেষ কোশে প্রকাশমান ব্রহ্মই তণ্ডুল-স্থানীয় পরমাত্মা। পরমাত্মার প্রাধান্যহেতু সেই শেষ কোশকেও আনন্দময় বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম-সূত্রে ব্যাস সূত্র করিতেছেন :—"আনন্দময়ো অভ্যাসাৎ" (১—১—১২।) 'আনন্দময় আত্মাই ব্রহ্ম, কারণ তাহাই শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে'। ইহার উপরে শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেনঃ—"তৈত্তিরীয়কে ক্রমান্বয়ে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, এবং বিজ্ঞানময়ের উল্লেখ করিয়া বলা হইতেছেঃ—"এই বিজ্ঞানময় হইতে ভিন্ন, তাহারই অভ্যন্তরস্থ আত্মা আনন্দময়।" "এখন সংশয় হইতেছেঃ—এস্থলে আনন্দময় শব্দে কি পরব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইতেছে, যাহাকে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' বলা হয়, অথবা আনন্দময় আত্মাও অন্নাদিময়ের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ। কি মনে হয়? আনন্দময় আত্মা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ, অন্নাদিময়ের ন্যায় অমুখ্য আত্মা হইবে। কেন? কারণ আনন্দময় ও অন্নময়াদি অমুখ্য আত্মা সকলের প্রবাহে পতিত হইয়াছে। (অর্থাৎ অন্নাদিময়ের সঙ্গে একত্রে পরম্পরানুসারে আনন্দময়ের উল্লেখ করা হইয়াছে)। তাহা সত্ত্বেও সর্ব্বান্তরত্বহেতু আনন্দময়কে মুখ্য আত্মাই মনে করা যাইত,—কিন্তু তাহা হইতে পারে না, যেহেতু তাহার প্রিয়াদি-অবয়ব-যুক্তত্ব, এবং শারীরত্ব শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। যদি আনন্দময় মুখ্য আত্মা হইত, তবে প্রিয়াদি অবয়বের সহিত তাহার সংস্পর্শ উক্ত হইত না। কিন্তু এস্থলে বলা হইয়াছে, "প্রিয়ই তাহার শির।" আর আনন্দময়ের শারীরত্ব ও উক্ত হইয়াছেঃ—"এই আনন্দময় বিজ্ঞানময়ের, শারীর আত্মা।" "যখন তাহাকে শারীর বা শরীর-সম্বন্ধী বলা হইতেছে, তখন

প্রিয়াপ্রিয়-সংস্পর্শ তাহার সম্বন্ধে বারণ করা অসাধ্য। অতএব এই আনন্দময় আত্মা ও সংসারীই। এরূপ অনুমানের বিরুদ্ধে আমরা বলিতেছিঃ—"আনন্দময় আত্মা পরমাত্মাই হওয়া উচিত। কেন? অভ্যাস হেতু, অর্থাৎ আনন্দ শব্দ পুনঃ পুনঃ পরমাত্মার প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে। আনন্দময়কে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছেঃ "রসো বৈ সঃ" "তিনি রস-স্বরূপ, ইত্যাদি। শ্রুত্যন্তরে উক্ত হইয়াছেঃ—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।" "ব্রহ্মের প্রতি আনন্দ শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ দ্বারা আনন্দময় আত্মাই ব্রহ্ম জানা যায়। আর যে বলা হয়, অন্নময়াদি অমুখ্য আত্মার প্রবাহে পতিত, অতএব আনন্দময় ও অমুখ্য আত্মা, সে দোষ হয় না। যেহেতু আনন্দময়কে সর্ব্বান্তর বলা হইয়াছে। মুখ্য আত্মার উপদেশ করাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। লোক-বুদ্ধি অনুসরণ করিয়া অনাত্মভূত এই অন্নময় দেহ, যাহা অতিমূঢ়দিগের নিকটে আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার আত্মত্ব স্বীকার করিয়া, তাহারই অনুকরণে "মূষা-নিষিক্ত দ্রুত তাম্রাদি প্রতিমার ন্যায়"—অর্থাৎ মাটির ছাঁচে ঢালাই করা গলিত ধাতু-মূর্ত্তির ন্যায়, তাহার অন্তরস্থ, আবার অন্তরস্থের অন্তরস্থ, এই ক্রমানুসারে পূর্ব্বের পূর্ব্বের সমানরূপ কল্পনা করিয়া, উত্তর উত্তর অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া উল্লেখ করিয়া, শ্রুতি স্থূলবুদ্ধি লোকের পক্ষে সহজবোধ্য করিয়া, সর্ব্বান্তরস্থ মুখ্য আনন্দময় আত্মার উপদেশ করিয়াছেন। এরূপ ব্যাখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সঙ্গত। অরুন্ধতী তারা দেখাইতে হইলে, অমুখ্য বহু তারা একটির পর আর একটী অমুখ্য অরুন্ধতী বলিয়া দেখাইতে হয়। সর্ব্বশেষে যে তারাটি প্রদর্শিত হয়, তাহাই মুখ্য অরুন্ধতী। এস্থলেও সেইরূপ আনন্দময় আত্মার সর্ব্বান্তরত্ব হেতু মুখ্য আত্মত্ব। আর যে বলিতেছ, মুখ্য আত্মার সম্বন্ধে প্রিয়াদি-শিরোবত্ত্ব কল্পনা অসঙ্গত,—তাহার উত্তর এইঃ—যে সকল কার্য্যাত্মা অন্তরতম নয়, তাহাদেরই অনুকরণে আনন্দময় আত্মারও উপাধি-জনিত শির আদি কল্পনা। প্রিয়াদি-শিরোবত্ত্ব

সেই মুখ্য আত্মা আনন্দময়ের পক্ষে স্বাভাবিকী নয়, অতএব অদোষ। পূর্ব্বপূর্ব্ব অমুখ্য আত্মাসকল অন্নময়াদি শরীর-পরম্পরাযুক্ত প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়াই, তদনুকরণে আনন্দময় আত্মার ও শারীরত্ব কল্পনা। সংসারী আত্মার ন্যায় আনন্দময়ের সাক্ষাৎ শারীরত্ব বলা উদ্দেশ্য নয়। অতএব 'আনন্দময়ঃ আত্মা পরমাত্মাই।" পাঠক দেখিবেন এস্থলে আনন্দময় কোশের কোন উল্লেখ নাই।

(ঘ)। বিবেক-চূড়ামণিতে পঞ্চকোষ বিভাগ।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার নামীয় বিবেক-চূড়ামণি গ্রন্থে ও পঞ্চকোশের বিচার করিয়া আত্মার ব্যতিরিক্তত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেনঃ—"সরোবরের জল যেমন স্বশক্তি-সমুৎপন্ন শৈবালরাজি-দ্বারা আবৃত থাকিলে দেখা যায় না, আত্মা ও সেইরূপ স্বশক্তি-সমুৎপন্ন অন্নাদিময় পঞ্চকোশদ্বারা আবৃত থাকাতে প্রকাশিত হয় না। শৈবাল দূরীকৃত হইলে সেই জলের ন্যায়, এই পঞ্চকোশ-রূপ আবর্জ্জনামুক্ত হইলে,—শুদ্ধ, স্বয়ং-জ্যোতিঃস্বরূপ প্রত্যগাত্মা ও প্রকাশিত হয়। সেই অসঙ্গ, অক্রিয়, প্রত্যগাত্মাকে,—মুঞ্জঘাস হইতে তাহার ইষিকা বা পুষ্পদণ্ডের ন্যায়,—এই দৃশ্য বর্গ হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতে হয়। অন্ন হইতে উৎপন্ন, অন্নদ্বারা পুষ্ট, অস্থিমাংস চর্ম্মাদিযুক্ত এই দেহই অন্নময় কোশ। ইহা বহু-অবয়ব-যুক্ত, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, ঘটাদির ন্যায় দৃশ্য এবং জড়। ইহা জ্ঞাতা বা আত্মা নয়। পাণিপাদাদিযুক্ত দেহ আত্মা হইতে পারে না, কারণ দৈহিক অঙ্গচ্ছেদেও (Amputation) আত্মা থাকে, এবং নষ্ট অঙ্গ সম্বন্ধী শক্তির ও নাশ হয় না। আত্মা শরীরাদির নিয়ামক, নিয়ম্য নয়। মূঢ়েরা মনে করে এই দেহই 'আমি', পণ্ডিতেরা মনে করেন দেহ এবং জীবের মিলিত নাম 'আমি', বিবেক-বিজ্ঞানী মহাজনেরা সর্ব্বদা ব্রহ্মকেই প্রকৃত 'আমি' মনে করেন। এই অন্নময় কোশের অন্তরস্থ, ইহারই আত্মা বা নিয়ামকরূপে প্রকাশিত, হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সঞ্চালক

হস্তপদাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়যুক্ত প্রাণের (Vitality) নাম প্রাণময় কোশ। তাহা হইতে শক্তি লাভ করিয়া, এবং তাহা দ্বারা পূর্ণ হইয়া, এই অন্নময় কোশ সর্ব্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। (Compare the nervous system with its motor and sensory nerves)। এই প্রাণময় কোশ বায়ুবিকার মাত্র (sustained by respiration), এবং বায়ুর ন্যায় অন্তরে বাহিরে গমনাগমন করে। প্রাণময় কোশের নিজের কোন ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান নাই, অথবা আত্মপর বিচার-শক্তি নাই। ইহা সর্ব্বদা পরতন্ত্র,—বা পরার্থক (অর্থাৎ আত্মার অধীন)। অতএব প্রাণময় কোশ আত্মা নয়। আবার এই প্রাণময়ের অন্তরস্থ চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং মনের মিলিত নাম মনোময় কোশ। ইহাই 'আমি', 'আমার' ইত্যাদি বিকল্পনার কারণ। লোকের ভিন্ন ভিন্ন নামাদিভেদ দ্বারা এই মনোময় কোশই লক্ষিত হয়। প্রাণময় হইতে এই মনোময় বলীয়ান্, এবং প্রাণময়কে পূর্ণ করিয়া ইহা প্রকাশিত। মনোময়ের অঙ্গীভূত চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক এই সংসাররূপ যজ্ঞের পাঁচটী হোতা স্বরূপ, রূপ-রসাদি বিষয় সকল তাহার ঘৃত স্থানীয়, এবং বাসনারাশি সেই যজ্ঞের ইন্ধন স্থানীয়। এ সকল দ্বারা বর্দ্ধিত, বিজ্ঞান-বিরহিত, এই মনোময় অগ্নি বিশ্ব-সংসার দগ্ধ করিতেছে। (বিজ্ঞান-রহিত) মনই সংসার বন্ধনের হেতুভূত অবিদ্যা স্বরূপ, তাহা হইতে পৃথক্ কোন অবিদ্যা নাই। মনই স্বপ্নকালে ভোগ্য বিষয় না থাকিলেও, স্বীয় শক্তি বলে ভোক্তৃভোগ্যাদি সমস্ত সৃজন করে। জাগ্রৎকালেও মনই সমস্ত প্রকাশ করে। মনের কার্য্য সম্বন্ধে জাগ্রৎ অথবা স্বপ্নে কোন বিশেষ নাই। সুষুপ্তি কালে যখন মন বিলীন হয়, তখন বিষয়-জাত কিছুই থাকে না।* কিন্তু এই মনোময় কোশ ও আত্মা নয়, কারণ তাহা আদ্যন্তবান্, পরিণামধর্ম্মী, দুঃখাত্মক, এবং জ্ঞেয় মাত্র (object)।

জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা (subject) কখনও জ্ঞেয় বা দৃষ্টির বিষয় (object) হইতে পারে না। মনোময়ের অন্তরস্থ বিজ্ঞানময়। বুদ্ধি, বুদ্ধি-বৃত্তি, এবং চক্ষুরাদি বুদ্ধীন্দ্রিয়—এই তিনের মিলিত নাম বিজ্ঞানময় কোশ। চক্ষুরাদি এ স্থলে মনোময় এবং বিজ্ঞানময় উভয় কোশের মধ্যে সাধারণ বলিয়া বর্ণিত হইতেছে। (নিশ্চয়তা এবং) কর্ত্তৃত্বই ইহার লক্ষণ, এবং ইহাই লোকের সংসার গতির কারণ। চিৎপ্রতিবিম্ব-জনিত শক্তিযোগে বিজ্ঞান নামক প্রকৃতির বিকার, "আমিই জ্ঞানবান্ এবং ক্রিয়াবান্"—এই বোধ হেতু, দেহেন্দ্রিয়াদিতে অজস্র ঘোর আমিত্ব অভিমান করিয়া থাকে। এই অহং স্বভাবই জীব,—তাহাই কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি সর্ব্ব ব্যবহারের আস্পদ। জাগ্রদাদি অবস্থা এবং সুখ দুঃখাদি ভোগ এই জীবেরই। পরমাত্মার অতি নিকট হওয়াতে, এই বিজ্ঞানময় কোশের প্রকাশ অত্যধিক। বিজ্ঞান-কোশরূপ উপাধিতে আমিত্ব বোধই সংসার গতির কারণ। এই বিজ্ঞানময়ই প্রাণ-মধ্যে এবং হৃদয়ে জ্যোতিরূপে প্রকাশিত। এই বিজ্ঞানোপাধি-যোগে, কূটস্থ আত্মা কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি লাভ করে। বুদ্ধির সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাস-দোষে কূটস্থ আত্মাও মিথ্যা পরিচ্ছিন্নের ন্যায় দেখায়, এবং সর্ব্বাত্মক হইয়াও মৃত্তিকা হইতে মৃণ্ময় ঘটাদি বস্তু-বিশেষের পার্থক্যের ন্যায়, আপনাকে আপনা হইতে পৃথক্‌রূপে কল্পনা করে।" (১৫—১৯২) শঙ্কর আবার বলিতেছেন "উক্ত বিজ্ঞান-ময় কোশও বিকারাত্মক, জড়, পরিচ্ছিন্ন, ব্যভিচারী (পরিবর্ত্তনশীল), এবং অনিত্য দৃশ্য মাত্র (object), অতএব তাহা পরমাত্মা নয়। এই বিজ্ঞানময়ের অন্তরস্থ, তামস-বৃত্তি-যুক্ত, প্রিয়াদিগুণক, ইষ্ট লাভের প্রকাশ মাত্র আনন্দ-প্রতিবিম্বযুক্ত, আনন্দময় কোশ। পুণ্যের অনুভবে তাহার অভিব্যক্তি। এজন্য কৃতিমান সাধুগণ স্বয়ং আনন্দ-রূপ হইয়া বিনা যত্নে সুখী হয়েন। সুষুপ্তি কালে, এই আনন্দময়

কোশের বিশেষ প্রকাশ। ইষ্ট দর্শন হইলে স্বপ্নে এবং জাগরিত কালেও তাহার কথঞ্চিৎ প্রকাশ। কিন্তু এই আনন্দময় কোশও সোপাধিক, প্রকৃতির বিকার, সুকৃত ক্রিয়ার কার্য্য বা ফল, এবং বিকার-সংঘাতের অন্তর্গত, অতএব তাহাও আত্মা নয়। এইরূপে যুক্তি এবং শ্রুতিদ্বারা পঞ্চকোশের আত্মত্ব নিষিদ্ধ হইলে, সেই নিষেধের সীমাভূত চিৎ-স্বরূপ সাক্ষীই অবশিষ্ট থাকে, যাহাকে স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ কূটস্থ আত্মা বলা যায়। সেই কূটস্থ আত্মা পঞ্চকোশ হইতে ভিন্ন, জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী, নির্বিকার, নিরঞ্জন, এবং সদানন্দ স্বরূপ। ধীরগণ তাঁহাকেই স্বীয় আত্মা বলিয়া জানেন"* ২১৪—২২০।

(ঙ) স্থূল, সূক্ষ্ম, এবং কারণ শরীর।

উল্লিখিত পঞ্চকোশ বিভাগের অনুকরণে শরীরত্রয়ের ও বিভাগ দৃষ্ট হয়ঃ—(১) পঞ্চীকৃত বা মিশ্র অর্থাৎ স্থূল পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন এই স্থূল শরীর কর্ম্মফল ভোগের আয়তনস্বরূপ। জাগ্রৎকালে বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা স্থূল শরীরেই স্থূল বাহ্য পদার্থ সকলের অনুভূতি হয়। "গৃহবৎ গৃহমেধিনঃ"—গৃহস্থের গৃহের ন্যায়,—এই স্থূল শরীর জীবের বাসগৃহ স্বরূপ। জন্ম, জরা, মরণ, এবং স্থূলত্বাদি এই স্থূল শরীরের ধর্ম্ম। বর্ণাশ্রমাদি নিয়ম, নানাপ্রকার রোগ, মান, অপমান, ইত্যাদি স্থূল শরীরেরই অবস্থা ভেদ। (২) অপঞ্চীকৃত বা অমিশ্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর। বাগাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, শ্রবণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণাপানাদি পঞ্চ প্রাণ, আকাশাদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, বুদ্ধ্যাদি, অবিদ্যা, কাম, এবং কর্ম্ম, এ সমস্তের মিলিত নাম সূক্ষ্ম শরীর। অজ্ঞানবশতঃ বাসনার অধীন হইয়া, এই সূক্ষ্ম শরীরই কর্ম্মফল সকল ভোগ করে।

---

* আধুনিক মনোবিজ্ঞানের প্রদর্শিত মনোবৃত্তি সকলের সহিত প্রাচীনদিগের প্রদর্শিত মন-বুদ্ধ্যাদির সামঞ্জস্য প্রদর্শন করা কঠিনঃ—ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ (Sensation),

স্বপ্নকালে স্থূল শরীর হইতে পৃথক্‌রূপে, এই সূক্ষ্ম শরীরের অনুভূতি হয়।(৩) আবার সুষুপ্তিকালে স্থূল অথবা সূক্ষ্ম উভয় শরীর সম্বন্ধেই আমাদের কোন জ্ঞান থাকে না। অথচ সেই সুষুপ্তিরূপ বীজাবস্থা হইতে বীজাঙ্কুরের ন্যায়, স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয় শরীরই নির্গত হয়। সুষুপ্তিরূপ এই বীজাবস্থার নাম কারণ-শরীর। "সুখমহমস্বাপ্‌সং"—'আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম,' গাঢ় নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলে, সকলেরই এইরূপ স্মৃতি হয়। স্মৃতি পূর্ব্বানুভূতি-মূলক। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সুষুপ্তিকালে ঐ সুখানুভূতি বর্ত্তমান ছিল। জাগ্রৎ কালে তাহারই স্মরণ হয়। কূটস্থ আত্মা উক্ত স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ শরীরত্রয়ের অতীত,—অথচ তাহাদের সাধারণ এবং নিত্য আশ্রয়। এজন্য কূটস্থ আত্মাকে তুরীয় (চতুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ) আত্মা বলা যায়। কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন যে, পূর্ব্বোক্ত কোশ-পঞ্চক, অথবা শরীরত্রয় বিভাগের উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা এই মাত্রই বলিতে পারি, যে পত্রাদি হইতে পৃথক্‌ করিয়া মুঞ্জ-ঘাসের পুষ্পদণ্ডের ব্যতিরিক্তত্ব প্রদর্শনের ন্যায়, দেহমনাদি হইতে পৃথক্‌ করিয়া আত্মার ব্যতিরিক্তত্ব প্রদর্শনই উদ্দেশ্য,—যেন দেহাদিতে অনাসক্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ঐহিক অথবা পারত্রিক সুখ-বাসনা-জনিত সর্ব্বপ্রকার বিক্ষেপমুক্ত হইয়া পরমেশ্বরে "প্রণিধান" অর্থাৎ ভক্তি-পূর্ব্বক পরমেশ্বরের সেবা, অথবা তুরীয় আত্মার ধ্যান-ধারণা দ্বারা, সেই পরমেশ্বরে অথবা তুরীয় আত্মাতে সমাধি বা চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিতে পারে।*

প্রত্যক্ষানুভূতি (Perception), স্মৃতি (Memory), কল্পনা (Imagination), ভাবাবেশ (Emotion), বাসনা (Desire), পুরুষকার (Will), মনোযোগ (Attention),—প্রাচীনদিগের মতে এ সকলই মনবুদ্ধ্যাদির অন্তর্গত। এ সকলের মধ্যে যাহা কিছু সংশয়াত্মক, তাহাই প্রাচীনদিগের মতে মনের বৃত্তি, এবং যাহা কিছু নিশ্চয়াত্মক, তাহাই তাহাদের মতে বুদ্ধির বৃত্তি। এই মাত্রই বলা যায়।

* পাতঞ্জল দর্শনে ধারণা, ধ্যান, এবং সমাধি—অষ্টাঙ্গ যোগের এই তিনটি অন্তরঙ্গ—এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে:—(১) ধারণা "দেশবন্ধশ্চিত্তস্য" অর্থাৎ বিষয়ান্তর

(চ)। বৃহদারণ্যক ভাষ্যে আত্মার ব্যতিরিক্তত্ব বিচার।

বৃহদারণ্যক ভাষ্যে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সম্বাদের ব্যাখ্যা উপলক্ষে, শঙ্করাচার্য্য এই দেহেন্দ্রিয়-মন বুদ্ধ্যাত্মক কার্য্যকরণ-পিণ্ডের সম্বন্ধে যে অতি সূক্ষ্ম পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বিচার করিয়াছেন,—তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চকোষ বিভাগ, অথবা শরীরত্রয় বিভাগের কোন উল্লেখ না করিয়া, কেবল মাত্র দার্শনিক যুক্তি অবলম্বন দ্বারা আত্মার ব্যতিরিক্তত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা সেই বিচারের কতক অংশ অনুবাদ করিয়া পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। জনক প্রশ্ন করিতেছেন :—"হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্য অস্তমিত হইলে, চন্দ্র অস্তমিত হইলে, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, বাক্য শান্ত হইলে, এই পুরুষ কোন্ জ্যোতিকে আশ্রয় করে?" যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন :—"আত্মাই তাহার জ্যোতি, সেই আত্ম-জ্যোতিতে সে অবস্থান করে, চলে, কর্ম্ম করে, এবং ইতস্ততঃ গমনাগমন করে।"*

ইহার উপরে শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন :—"জাগ্রৎ কালে চক্ষুরাদি বহির্মুখ-করণ সকল আদিত্য-জ্যোতি দ্বারা অনুগৃহীত

পরিহার পূর্ব্বক, নাভিচক্রে, হৃদয়পদ্মে নাসাগ্রে, অথবা অন্য কোন বাহ্য বিষয়ে চিত্তের স্থিরীকরণ। (২) ধ্যান "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানং।" অর্থাৎ সেই স্থিরচিত্তে প্রত্যয় বা চিন্তার একতানতার নাম ধ্যান। ধ্যেয় বিষয়ের চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তার পরিহার দ্বারা নিরন্তর সেই ধ্যেয় বিষয়েরই চিন্তা প্রবাহের উৎপত্তির নাম ধ্যান। (৩) সমাধি—"তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ,"—অর্থাৎ সেই ধ্যানই গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে, যখন সেই ধ্যেয় বস্তু চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে যেন চিন্তা প্রবাহও আপন স্বরূপত্ব বিস্মৃত হইয়া, স্বরূপ-শূন্যতা প্রাপ্ত হয়, ইহারই নাম সমাধি। বিভূতিপাদ ১, ২, ৩। ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে পাতঞ্জল বলিতেছেন :—"সমাধি সিদ্ধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ,"—ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা অর্থাৎ ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরের আরাধনা অথবা ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ দ্বারা সমাধি লাভ হয়। সাধনপাদ—৪৫।

* "অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিং-জ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যাত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতীত্যাত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তেপল্যয়তে কর্ম্মকুরুতে বিপল্যেতীতি।" ৬-ব্রা১-অ৪-বৃহদারণ্যক।

হইলেই, এই পুরুষের অর্থাৎ জীবের জাগ্রদ্বিষয় সম্বন্ধে সদ্ব্যবহারাদি স্ফুটতর হয়। ইহা দ্বারা দেখা যায় জাগ্রৎকালে, স্বীয় অবয়ব-সঙ্ঘাত হইতে ব্যতিরিক্ত জ্যোতি দ্বারাই এই পুরুষের জ্যোতিঃ-কার্য্য সিদ্ধ হয়। ইহা হইতে অনুমান করা যায়,—যে সমস্ত বাহ্য-জ্যোতি যখন প্রত্যস্তমিত হয়,—যেমন স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিকালে, এবং ঐরূপ অবস্থা ঘটিলে, জাগ্রৎকালেও,—তখনও স্বীয় অবয়ব-সঙ্ঘাত হইতে ব্যতিরিক্ত কোন প্রকার জ্যোতি দ্বারাই তাহার জ্যোতিঃ-কার্য্য সিদ্ধ হয়। স্বপ্নকালে স্বীয় দেহাদি অবয়ব-সঙ্ঘাত হইতে ব্যতিরিক্ত জ্যোতিদ্বারা জ্যোতিঃকার্য্য-সিদ্ধি হইতেও দেখা যায়,—যেমন স্বপ্নে দেহ অচেতন থাকিলেও স্বপ্নকালীন বন্ধু-সঙ্গম-বিয়োগ-দর্শন, বা দেশান্তর গমনাগমনাদি প্রত্যক্ষ হয়। আর সুষুপ্তি হইতে উত্থানান্তেও 'সুখে আমি নিদ্রিত ছিলাম, কিছুরই জ্ঞান ছিল না,'—এইরূপ স্মৃতি হয়। অতএব দেখা যায় দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন, আদিত্যাদি বাহ্য জ্যোতি হইতেও ভিন্ন, কোন জ্যোতিঃ আছে। তবে সেই জ্যোতি কি? আত্মাই তখন (অর্থাৎ স্বপ্নাদিকালে) সেই পুরুষের জ্যোতি হয়। আদিত্যাদির ব্যতিরিক্তত্বের দৃষ্টান্ত হইতে অনুমিত হয় যে আত্মাও কার্য্য-করণরূপ স্বকীয় অবয়ব-সঙ্ঘাত হইতে ব্যতিরিক্ত,—আদিত্যাদি বাহ্য জ্যোতি যেমন দেহাদি হইতে ব্যতিরিক্ত। আত্মা কার্য্য-করণ সকলের অবভাসক (প্রকাশক), স্বয়ং অন্য কোন ব্যতিরিক্ত জ্যোতি দ্বারা অনবভাস্যমান, ইহাই বলা হইতেছে। সেই আত্মজ্যোতি অন্তরস্থ। পারিশেষ্য দ্বারা অর্থাৎ সমস্ত চলিয়া গেলেও আত্মা পরিশিষ্ট থাকে, অতএব জানা যায়, যে আত্ম-জ্যোতি কার্য্যকরণ হইতে ব্যতিরিক্ত। কার্য্য-করণ-সংঙ্ঘাতের অনুগ্রাহক বাহ্য আদিত্যাদি জ্যোতি যে কার্য্য-করণ হইতে ব্যতিরিক্ত, তাহা চক্ষুরাদি করণ দ্বারাই উপলভ্যমান দৃষ্ট হয়। অপরদিকে যদিও আদিত্যাদি জ্যোতি এবং বাক্যাদি উপরত হইলে, চক্ষুরাদি দ্বারা চক্ষুরাদি হইতে ব্যতিরিক্ত অন্য কোন জ্যোতির উপলব্ধি হয় না, তাহা হইলেও চক্ষুরাদি হইতে

ব্যতিরিক্ত সেই আত্ম-জ্যোতির কার্য্য তখনও দেখা যায়,—যে হেতু বাহ্য জ্যোতি উপরত হইলে, সেই পুরুষ আত্ম-জ্যোতিতেই অবস্থান করে,চলে,কর্ম্ম করে,এবং ইতস্ততঃ গমনাগমন করে। ইহা দ্বারা নিশ্চয় প্রতিপন্ন হইতেছে যে সেই আত্ম-জ্যোতি অন্তরস্থ, অভৌতিক, এবং আদিত্যাদি হইতে ভিন্ন। এজন্যই সেই জ্যোতি চক্ষুরাদির অগম্য।"

অনন্তর শঙ্কর প্রতিপক্ষের আপত্তি বর্ণন করিতেছেন:— "সমান জাতীয় দ্বারাই সমানজাতীয়ের উপকার দৃষ্ট হয়, অতএব 'সেই জ্যোতিঃ অন্তরস্থ এবং আদিত্যাদি ভৌতিক জ্যোতি হইতে অন্য প্রকার,'—একথা বলা ঠিক্ নয়। কেন? উপক্রিয়মান কার্য্যকরণ-সঙ্ঘাত ভৌতিক। তাহার সমানজাতীয় আদিত্যাদি-সদৃশ ভৌতিক পদার্থ দ্বারাই সেই ভৌতিক কার্য্যকরণ সঙ্ঘাতের উপকার হইতে দেখা যায়। দৃষ্টের অনুরূপই অনুমান করিতে হয়। কার্য্য-করণ হইতে ব্যতিরিক্ত, কার্য্য-করণের উপকারক, জ্যোতি বিষয়ে আদিত্যাদির তুল্য, অথচ আদিত্যাদি হইতে ভিন্ন-জাতীয়,—অর্থাৎ অন্তরস্থ, যদি সেরূপ কোন জ্যোতি থাকে, তবে ভৌতিক কার্য্য-করণ-সঙ্ঘাতের উপকারকত্ব হেতু, তাহাকেও কার্য্য-করণের সমান জাতীয়, অর্থাৎ আদিত্যাদি-জ্যোতির ন্যায় ভৌতিকই অনুমাণ করিতে হয়। আর যদি অন্তরস্থত্ব, এবং অপ্রত্যক্ষত্ব হেতু চক্ষুরাদি জ্যোতি হইতে সেই জ্যোতির বৈলক্ষণ্য বা ভিন্ন জাতীয়ত্ব অনুমান করা হয়, সে অনুমান অনৈকান্তিক (অর্থাৎ নিশ্চয়তা-শূন্য), কারণ চক্ষুরাদি জ্যোতি ও অন্তরস্থ এবং অপ্রত্যক্ষ—(চক্ষু কখনও নিজেকে নিজে দেখে না)। অতএব তুমি যে বলিতেছ:—'দেহাদি হইতে বৈলক্ষণ্যযুক্ত আত্ম-জ্যোতি সিদ্ধ হইতেছে'—এরূপ বলা তোমার মনোরথ মাত্র। বরং যে হেতু কার্য্য-করণ সংঘাত থাকিলেই মাত্র সেই জ্যোতিও থাকে, অতএব সেই জ্যোতি কার্য্য-করণ-সংঘাতেরই ধর্ম্ম,

এরূপই অনুমান করিতে হয়। সামান্যতঃ (generally) যাহা সত্য দেখা যায়, তাহার সহিত তোমার অনুমানের ব্যভিচারিত্ব (disagreement) হেতু, তোমার অনুমান প্রমাণ-যোগ্য নয়। সামান্যতঃ দৃষ্টের বলেই তুমি প্রমাণ করিতেছ, যে আদিত্যাদির ন্যায় সেই জ্যোতি কার্য্যকরণ হইতে ব্যতিরিক্ত। প্রত্যক্ষ দৃষ্টকে অনুমান দ্বারা বাধিত করা যায় না। প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে এই কার্য্য-করণ-সংঘাতই দেখে, শোনে, মনন করে, এবং জানে। যদি কার্য্য-করণ-সংঘাতের উপকারক কোন অন্তর্জ্যোতি থাকে, তবে তাহাও আদিত্যাদিরই ন্যায়, আত্মা নয়, আদিত্যাদিতুল্য অন্য কোন ভৌতিক জ্যোতি হইবে। এই কার্য্য-করণ সঙ্ঘাতই দর্শনাদি ক্রিয়া করে বলিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, অতএব এই কার্য্যকরণ সংঘাতই আত্মা হইবে। অন্য কিছু আত্মা নয়। কারণ প্রত্যক্ষের সহিত বিরোধ হইলে, অনুমান প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে না। যদি বল এই দেহাদি-পিণ্ড দর্শন ক্রিয়ার কর্ত্তা বা আত্মা হইলে, তাহা অবিকল পূর্ব্বরূপ থাকিলেও কেন তাহাতে দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব কখনও থাকে, এবং কখনও বা থাকে না ? ইহাতে কোন দোষ হয় না। কারণ দেহাদিতে দর্শনাদি-ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব সময়ভেদে দৃষ্ট না হইলেও, যখন তাহা দৃষ্ট হয়, তখন তাহা অস্বীকার করা সঙ্গত হইবে না, যেমন খদ্যোতের প্রকাশাপ্রকাশকত্ব উভয়ই দৃষ্ট হয় বলিয়া, খদ্যোতের দৃশ্যমান প্রকাশকত্বের অন্য ব্যতিরিক্ত কারণান্তর অনুমান করা যায় না। এরূপ করিলে যে কোন সামান্য (Generalisation) দৃষ্টে সকলই সর্ব্বত্র অনুমান করা যায়। তাহা করা কাহারো অভিপ্রেত নয়। আর পদার্থ মাত্রেরই যে স্বভাব-বিশেষ না আছে এমন নয়,—যেমন অগ্নির উষ্ণ-স্বভাবতা নিমিত্তান্তর-জনিত নয়, অথবা জলের শীতলতা প্রাণীগণের পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মাদির অপেক্ষা করে না। এরূপ হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরও

নিমিত্তান্তরাপেক্ষত্ব প্রসঙ্গ হউক। তাহা নয়, কারণ তাহা হইলে অনবস্থাদোষ (Fallacy of endless regress) দাঁড়ায়। তাহা কেহ ইচ্ছা করে না।" (২৬—'দেহাত্মবাদ খণ্ডন' দ্রষ্টব্য)।

এইরূপে অতি বিশদভাবে প্রতিপক্ষের আপত্তি বর্ণন করিয়া, শঙ্কর তাহা খণ্ডন করিতেছেন:—"তাহা নয়,—কারণ স্বপ্নেতে এবং স্মৃতিতে পূর্ব্ব-দৃষ্টের দর্শন এবং স্মরণ হইয়া থাকে।" একথাই বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছেন:—"স্বভাববাদী বলেন দর্শনাদি ক্রিয়া দেহেরই কার্য্য, দেহ-ব্যতিরিক্ত অন্য কাহারও নয়। যদি তাহাই হইত, যদি দর্শন-ক্রিয়া দেহেরই কার্য্য হইত, তবে সেই দেহ—যাহাকে দর্শন ক্রিয়ার কর্ত্তা কল্পনা করা হইতেছে,—সেই দেহ জাগ্রৎকালে সচেতন থাকিতে, যে বস্তু যেরূপ দর্শন করিয়াছিল, স্বপ্ন কালে যখন সেই দর্শক দেহ অচেতন থাকে, তখন পূর্ব্ব-দর্শকের অভাব অর্থাৎ অচেতনত্ব হেতু, সেই বস্তুর সেইরূপ দর্শন লাভ হইত না। চক্ষু নষ্ট হইলে পরে, অন্ধ হইয়াও লোকে যখন স্বপ্ন দর্শন করে, তখন চক্ষু থাকিবার সময়ে পূর্ব্বে যে বস্তু যেরূপ দেখিয়াছিল, অন্ধ হইলে পরেও স্বপ্নে সেই বস্তু সেই রূপই দর্শন করে, অন্ধ-ব্যক্তি শাকদ্বীপাদি-সম্বন্ধী অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু মাত্র দেখে না। এতদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে:—যে ব্যক্তি চক্ষু নষ্ট হইলে পরেও স্বপ্নে পূর্ব্ব-দৃষ্ট বস্তু দেখে, সেই চক্ষু থাকিতে (অর্থাৎ অন্ধ হইবার পূর্ব্বে) তাহা দেখিয়াছিল, চক্ষু বা দেহ দেখে নাই। যদি দেহ বা চক্ষুই দ্রষ্টা হইত, তবে যে চক্ষু তাহা দেখিয়াছিল, সেই চক্ষু উৎপাটিত হইলে পর, সেই উদ্ধৃত-চক্ষু অন্ধ আর স্বপ্নে সেই পূর্ব্ব দৃষ্ট বস্তু দেখিত না। লোকে এইরূপ প্রসিদ্ধিও আছে:—'পূর্ব্বে আমি হিমালয়ের শৃঙ্গ দেখিয়াছিলাম (ইহাতে অনুমান হয়, শঙ্কর হিমালয়ে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু আনন্দগিরি নামীয় গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই), অদ্য স্বপ্নে তাহা দেখিলাম, উদ্ধৃত-চক্ষু অন্ধদিগেরও এইরূপ অনুভব হয়। অতএব চক্ষু উদ্ধৃত

হইলে পর স্বপ্নে যে পূর্ব্ব-দৃষ্ট বস্তু পূর্ব্ববৎ দর্শন করে, চক্ষু অনুদ্ভূত অবস্থায়ও সেই দ্রষ্টা। চক্ষু বা দেহ দ্রষ্টা নয়, জানা গেল। আবার স্মৃতি সম্বন্ধে ও সেইরূপ দেখা যায়ঃ—যে দ্রষ্টা সেই স্মর্ত্তা। দ্রষ্টা এবং স্মর্ত্তা এক। এ জন্যই দ্রষ্টা চক্ষু দ্বারা পূর্ব্বে যে বস্তু যেরূপ দেখিয়াছিল, চক্ষু নিমীলিত করিয়া ও, স্মৃতি পটে সে পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তু পূর্ব্ববৎ দর্শন করে। চক্ষু নিমীলিত করিয়া যে দ্রষ্টা স্মৃতিপটে পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর রূপ পূর্ব্ববৎ দর্শন করে, সেই দ্রষ্টাই চক্ষু দ্বারা তাহা পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছিল। চক্ষু দ্রষ্টা নয় ইহাই জানা যায়। আর মৃত্যুর পর, অবিকল পূর্ব্বরূপ থাকিলেও, দেহ রূপাদি দর্শনে অক্ষম হয়। দেহ দ্রষ্টা হইলে, মৃত্যুর পরেও দেহে দর্শনাদি ক্রিয়া-শক্তি থাকিত। অতএব যাহার অপায় হইলে, দেহে দর্শনাদি ক্রিয়া-শক্তি থাকে না, এবং যাহা থাকিলে দেহে দর্শনাদি ক্রিয়া-শক্তি থাকে, তাহাই দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা। দেহ দর্শনাদির কর্ত্তা নয়, জানা যায়। পুনরায় এতদ্দারাও দেখা যায় চক্ষুরাদি দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা নয়। যাহা আমি দেখিয়াছিলাম, তাহা আমিই স্পর্শ করিতেছি,—অর্থাৎ যে দ্রষ্টা, সেই স্প্রষ্টা। দর্শন এবং স্পর্শনের ভিন্ন-কর্ত্তৃকত্ব সম্ভব হইলে, আমাদের এরূপ একত্ব অনুভব হইত না। যদি বল তবে মনই কর্ত্তা,—তাহাও নয়, কারণ মনও গ্রাহ্য বিষয় (অথবা বৃত্তি) মাত্র, রূপাদিরই তুল্য। মনও দর্শনাদির ন্যায় কার্য্য মাত্র, অতএব মনেরও দ্রষ্টৃত্বাদি কল্পনা অসঙ্গত। যে দ্রষ্টা, সেই স্প্রষ্টা, সেই মন্তা, (অর্থাৎ দর্শন, স্পর্শন, এবং মননাদি কার্য্য, এবং চক্ষু, ত্বক্, এবং মনাদি করণ,—এই সমস্ত হইতে ব্যতিরিক্ত এক আত্মাই সকলের কর্ত্তা)। অতএব সিদ্ধ হইতেছে, সেই আত্ম-জ্যোতি অন্তরস্থ, এবং আদিত্যাদি বাহ্য জ্যোতির ন্যায় দেহেন্দ্রিয়মনাদি হইতে ব্যতিরিক্ত।”

“আবার যে বলা হইয়াছে ‘সমান জাতীয় বা ভৌতিক আদিত্যাদি

দ্বারাই কার্য্যকরণ-সংঘাতের উপক্রিয়মানত্ব দৃষ্ট হয়, অতএব সেই অন্তরস্থ জ্যোতি ও কার্য্যকরণাদির সমান জাতীয়, অর্থাৎ ভৌতিক অনুমান করাই সঙ্গত,'—তাহা সত্য নয়। উপকার্য্য এবং উপকারক ভাবের মধ্যে সেরূপ কোন নিয়ম দেখা যায় না। সমান জাতীয় পার্থিব ইন্ধনাদি দ্বারা যেমন অগ্নি-প্রজ্বলনের উপকার হয়, সেইরূপ ভিন্নজাতীয় জল দ্বারাও বৈদ্যুতাগ্নি এবং জঠরাগ্নি প্রজ্বলনের উপকার হইতে দেখা যায়। অতএব উপকার্য্য এবং উপকারক ভাব সম্বন্ধে সমানজাতীয়-অসমানজাতীয় কোনরূপ নিয়ম নাই। কখনও সমানজাতীয় মনুষ্যাদি দ্বারা মনুষ্যাদির উপকার হয়। কখনও বা স্থাবর বা পশ্বাদি ভিন্নজাতীয়দ্বারা উপকার হয়।" আত্মজ্যোতি যে কার্য্য-করণ সংঘাতের ধর্ম্ম নয়, এবং কার্য্যকরণ হইতে ব্যতিরিক্ত, তাহা প্রতিপাদন জন্য শঙ্কর পূর্ব্বে যে সকল যুক্তি বিন্যাস করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার পুনরাবৃত্তি করিতেছেনঃ—"সেই জ্যোতি কার্য্যকরণ সংঘাতেরই ধর্ম্ম, এই যে বলা হয়, তাহা হইতে পারে না, কারণ তাহাতে অনুমান বিরোধ,—'আদিত্যাদি জ্যোতির ন্যায় সেই জ্যোতি ও কার্য্য-করণ সংঘাত হইতে ব্যতিরিক্ত'—এই অনুমানের সহিত বিরোধ। 'আত্ম-জ্যোতির কার্য্য-করণ-ধর্ম্মত্ব' প্রতিপক্ষের প্রতিপাদ্য (প্রতিজ্ঞা)। কিন্তু যেহেতু মৃত্যুর পর আত্মজ্যোতির অদর্শন হয়, অতএব দেহ-রূপ কার্য্যকরণ-পিণ্ডের সহিত আত্ম-জ্যোতির তদ্ভাবভাবিত্ব অসিদ্ধ। স্বপ্ন এবং স্মৃতি হেতু দ্রষ্টা দেহ হইতে ভিন্ন বস্তু (অর্থান্তর-ভূত) প্রতি-পন্ন হইতেছে। আর যে খদ্যোতাদির কাদাচিৎক প্রকাশাপ্রকাশকত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক্ নয়, কারণ পক্ষাদি অবয়বের সঙ্কোচ এবং বিকাশই তাহাদের সেই প্রকাশাপ্রকাশকত্বের নিমিত্তভূত হেতু। অতএব দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ব্যতিরিক্ত অন্তরস্থ আত্ম-জ্যোতি আছে" ॥

———

(চ) বৃহদারণ্যক ভাষ্যে বুদ্ধ্যাদির সহিত আত্মার সম্বন্ধ বিচার।

পরের মন্ত্রে আবার জনক প্রশ্ন করিতেছেনঃ—"কোন্‌টী আত্মা"? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিতেছেনঃ—'প্রাণ সকলের (Vital functions and organs) মধ্যে এই যে বিজ্ঞানময় হৃদি-স্থিত অন্তর্জ্যোতিঃ-স্বরূপ পুরুষ।"* ৭॥

ইহার উপরে শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেনঃ—"যদিও আত্মার ব্যতিরিক্তত্বাদি সিদ্ধ হইল, তথাপি আদিত্যাদির অনুগ্রাহকত্ব (অর্থাৎ আদিত্য চক্ষুর অনুগ্রাহক এবং চক্ষুর ন্যায় ভৌতিক জাতীয়) দৃষ্টে সমানজাতীয়েরই অনুগ্রাহকত্ব সম্ভব, এরূপ ভ্রান্তি হেতু,—বুঝিতে পারা যাইতেছে না, যে কি আত্মা বুদ্ধ্যাদি করণ সকলেরই সমানজাতীয়, এবং তাহাদেরই অন্যতম, অথবা সে সকল হইতে ব্যতিরিক্ত। এজন্যই প্রশ্ন হইতেছেঃ—'কোন্‌টি আত্মা'? (আত্মা-অনাত্মার) বিচার সূক্ষ্ম এবং দুর্বিজ্ঞেয়, এজন্য ভ্রান্তি সম্ভবপর। অথবা শরীরমনাদি হইতে আত্মার ব্যতিরিক্তত্ব সিদ্ধ হইলেও, বিচার দ্বারা সাক্ষাৎভাবে আত্মার ব্যতিরিক্তত্বের অনুপলব্ধি হেতু, আপাততঃ মনে হয় যেন ইন্দ্রিয়মনাদি করণ গ্রাম—সকলই বিজ্ঞান-যুক্ত। অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছেঃ—"কোন্‌টি আত্মা"? দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনের মধ্যে কোন্‌টি সম্বন্ধে তুমি-"যে জ্যোতি দ্বারা অবস্থান করে" ইত্যাদি বলিতেছ,—অর্থাৎ কোন্‌টিকে তুমি আত্মা নামে অভিহিত করিতেছ? অথবা উক্ত শ্রুতি বাক্যের এরূপ অর্থও হইতে পারেঃ—"তোমার অভিপ্রেত সেই আত্মা কি বিজ্ঞান-ময়? এই সমস্ত প্রাণই (Vitality) যেন বিজ্ঞানময় বোধ হয়, ইহাদিগের মধ্যে কোন্‌টি আত্মা?" ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইলে যেমন বলা হয়,—ইহারা সকলেই তেজস্বী বোধ হয়। ইহাদের মধ্যে কে ষড়ঙ্গবিৎ?" প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাতে "কোন্‌টি আত্মা"? এই মাত্রই

* "কতম আত্মেতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ।

প্রশ্ন বাক্য, এবং "এই যে বিজ্ঞানময়" ইত্যাদি তাহার প্রতি-বচন। শেষোক্ত ব্যাখ্যাতে—"প্রাণ সকলের মধ্যে কোন্‌টি এই বিজ্ঞানময় আত্মা", এই পর্য্যন্তই প্রশ্ন বাক্য। অথবা "কোন্‌টি সেই আত্মা বা প্রাণ সকলের মধ্যে হৃদিস্থিত অন্তর্জ্যোতিঃ-স্বরূপ বিজ্ঞানময় পুরুষ" এই সমস্তই প্রশ্ন বাক্য হইতে পারে। বুদ্ধি-বিজ্ঞানরূপ উপাধির সহিত আত্মার সম্বন্ধের অবিবেক হেতু, আত্মাকে বিজ্ঞানময় বা বিজ্ঞান-বহুল বলা হইতেছে, কারণ বুদ্ধি-বিজ্ঞান-সংযুক্তরূপেই আত্মার উপলব্ধি হয়, যেমন আদিত্য এবং চন্দ্র সংযুক্তরূপেই রাহুর উপলব্ধি। বুদ্ধিকে সর্ব্ব বস্তু উপলব্ধির যন্ত্র স্বরূপ—"সর্ব্বার্থকরণং" বলা যায়,—যেমন অন্ধকারে সম্মুখস্থিত প্রদীপ। এজন্য উক্ত হইয়াছে, মন দ্বারাই দেখে, মনদ্বারাই শোনে।" (এস্থলে মন-বুদ্ধি এক মনে করা হইতেছে)। অন্ধকারে সম্মুখস্থ প্রদীপালোক-বিশিষ্ট বস্তুর ন্যায়, বুদ্ধি-বিজ্ঞান দ্বারা আলোক-বিশিষ্ট হইলেই সমস্ত বিষয়জাতের উপলব্ধি হয়। অপর সকল করণ (ইন্দ্রিয়াদি) বুদ্ধিরই দ্বার মাত্র। এজন্যই 'বিজ্ঞানময়' এই বিশেষণ দ্বারা (আত্মাকে) বুদ্ধি-বিজ্ঞানরূপ বিশেষণযুক্ত করা হইতেছে। "বিজ্ঞান" শব্দে এস্থলে কেহ কেহ 'পরমাত্মবিজ্ঞপ্তি-বিকার' বা 'পরমাত্মার জ্ঞান-স্বরূপের প্রকাশভেদ, এরূপ ও অর্থ করেন। কিন্তু পরে 'এই ধী' এরূপ পাঠ আছে। "হৃদ্যন্তর্" বা হৃদয় মধ্যে, এই কথা দ্বারাও 'বিজ্ঞানময়' শব্দের বিজ্ঞান-প্রায়ত্ব বা বিজ্ঞান-বাহুল্য অর্থই নিশ্চিত। প্রাণ (animal vitality) হইতে আত্মার ব্যতিরিক্তত্ব প্রদর্শনার্থ—"প্রাণেষু" এই সপ্তমী প্রয়োগ। যাহার মধ্যে যে থাকে, সে তাহা হইতে ভিন্ন, যেমন 'পাষাণের মধ্যে বৃক্ষ।' 'প্রাণেষু' বলাতে পাছে ভ্রম হয়, যে বুদ্ধি ও প্রাণ-জাতীয়, এজন্য বলা হইতেছে, 'হৃদ্যন্তর্' বা হৃদয় মধ্যে। হৃৎ শব্দ দ্বারা পুণ্ডরীকাকার মাংসপিণ্ডকে লক্ষ্য করে, তথায় অবস্থিত, এজন্য বুদ্ধিকেই 'হৃৎ'

বলা হইতেছে। বুদ্ধি হইতে (আত্মার) ব্যতিরিক্তত্ব প্রদর্শনার্থ 'অন্তর্'—বা (বুদ্ধি) 'মধ্যে' বলা হইতেছে। অবভাসাত্মকত্ব বা সকলের প্রকাশকত্ব হেতু আত্মাকে 'জ্যোতি' বলা হইতেছে।

আদিত্যাদি দ্বারা প্রকাশিত ঘটাদির ন্যায়,—সেই প্রকাশ-স্বভাব আত্ম-জ্যোতির প্রভাবেই, এই দেহাদি কার্য্যকরণ পিণ্ড চেতনাবানের ন্যায় অবস্থান করে, চলে, কর্ম্ম করে। অথবা মরকতমণির ন্যায়। পরীক্ষার জন্য ক্ষীরাদি দ্রব্যে প্রক্ষিপ্ত মরকতমণি যেরূপ ক্ষীরাদিকেও আপনার ছায়ার ন্যায় করে, সেইরূপ বুদ্ধ্যাদি হইতে সূক্ষ্মতমত্ব, এবং সর্ব্বান্তরতমত্বহেতু, সেই হৃদন্তঃস্থ আত্ম-জ্যোতিও বুদ্ধ্যাদি সমস্ত কার্য্য-করণসংঘাতকে সূক্ষ্মত্ব-স্থূলত্বের পারম্পর্য্যানুসারে একত্রে সেই আত্ম-জ্যোতির ছায়াযুক্ত করে। অতি স্বচ্ছত্ব এবং আত্মার নিকট-তমত্বহেতু, বুদ্ধি সেই আত্ম-চৈতন্য-জ্যোতির প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ হয়। এজন্য বিবেকবান্‌দিগেরও সর্ব্বাগ্রে বুদ্ধিতেই আত্মত্বাভিমান বুদ্ধি হয়। বুদ্ধি হইতে মনের আনন্তর্য্য হেতু, বুদ্ধি-সম্পর্ক-জন্য মনও সেই চৈতন্যের ছায়াস্বরূপ হয়। তৎপর মনের সহিত সংযোগ হেতু ইন্দ্রিয়াদিও সেই চৈতন্যের ছায়াস্বরূপ হয়। তদনন্তর ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্ক হেতু শরীর ও চৈতন্যের ছায়া লাভ করে। এইরূপে সেই আত্ম-চৈতন্য জ্যোতি পারম্পর্য্যানুসারে সমস্ত কার্য্য-করণসংঘাতকে তাহার চৈতন্য-জ্যোতি দ্বারা অবভাসিত করে। এজন্যই এই কার্য্যকরণসংঘাতে এবং তদীয় বৃত্তি সমূহে সর্ব্বদা লোকের আত্মত্বাভিমান বুদ্ধি জন্মে। লোকের যাহাতে আত্মানাত্ম-বিবেক লাভ হয়, সেজন্য গীতাতে ভগবান্ বলিতেছেন :—"এই সূর্য্য যেমন একাকী এই লোক সকল প্রকাশ করে, হে ভারত, ক্ষেত্রী বা আত্মাও সেইরূপ এই সমস্ত ক্ষেত্র বা বিষয়জাত প্রকাশ করে। এই কারণে সেই হৃদ্যান্তঃস্থ জ্যোতিকে পুরুষ বলা যায়,—আকাশবৎ সর্ব্বগতত্ব হেতু পূর্ণ,—অতএব পুরুষ।"

(ছ)। বৃহদারণ্যক ভাষ্যে আত্মার স্বয়ং-জ্যোতিষ্ট্ব এবং বুদ্ধ্যাদির সহিত সমানাকারতা।

আত্মার স্বপ্রকাশত্ব বা স্বয়ং-জ্যোতিষ্ট্ব সম্বন্ধে শঙ্কর তাঁহার উক্ত ভাষ্যে বলিতেছেন :—"আত্মা সকলের অবভাসক, এবং স্বয়ং অন্যের অনবভাস্য। এ জন্যই আত্মার স্বয়ং-জ্যোতিষ্ট্ব নিরতিশয় বা পূর্ণ। 'কোন্‌টী আত্মা' বলিয়া যাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছ, সেই পুরুষ স্বয়ংই জ্যোতিঃ-স্বভাব। করণ সকলের অনুগ্রাহক আদিত্যাদি বাহ্যজ্যোতি সকল প্রত্যস্তমিত হইলে, আত্মা বা হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ-স্বরূপ পুরুষ স্বয়ংই বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা করণ সকলের অনুগ্রাহক হইয়া থাকে, বলা হইয়াছে। আদিত্যাদি বাহ্যজ্যোতি পরতন্ত্র, অর্থাৎ আত্মচৈতন্য সাপেক্ষ, আত্ম-চৈতন্যের অভাবে স্বকার্য্য সাধনে অক্ষম। এজন্য আদিত্যাদি বাহ্য অনুগ্রাহক থাকিলেও, যদি তখন কার্য্য-করণসংঘাত আত্মচৈতন্য রহিত হয়, তখন তাহা স্বকার্য্য সাধনে অসমর্থ হয়। কিন্তু আত্মার জ্যোতি আদিত্যাদির ন্যায় পরতন্ত্র নয়। আত্মা নিজেই নিজের প্রয়োজন সাধনে সক্ষম। আত্ম-জ্যোতির অভাব হইলে, কার্য্য-করণসংঘাত ব্যবহারের অযোগ্য হয়। আত্মজ্যোতির অনুগ্রহেই সর্ব্বদা সর্ব্ব সম্ব্যবহার সম্ভব। শ্রুত্যন্তরে উক্ত হইয়াছে—"এই যে হৃদয়, মনও তাহাই, প্রজ্ঞানস্বরূপ"—ইত্যাদি। প্রাণীগণের সর্ব্ব সম্ব্যবহার আত্মত্ব-অভিমানযুক্ত। মরকতমণির দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মত্ব অভিমানের হেতু উক্ত হইয়াছে। প্রাণীগণের এইরূপ আত্মত্বাভিমান থাকিলেও সেই আত্মজ্যোতি স্বয়ং ইন্দ্রিয়াদির অগোচর। জাগ্রৎকালে বাহ্যাভ্যন্তরীণ কার্য্যকরণ-শৃঙ্খলেতে বুদ্ধ্যাদির ব্যাকুলত্ব হেতু, বুদ্ধ্যাদি ও সেই আত্মজ্যোতির গ্রহণে অসমর্থ। এজন্য, মুঞ্জঘাস (Saccharum Sara) হইতে তাহার ইষীকার বা পুষ্পদণ্ডের (Inflorescence) ন্যায় পৃথক্ করিয়া আত্মজ্যোতি প্রদর্শন করিবার

উদ্দেশ্যে, উপনিষদ্ তাহা স্বপ্নে প্রদর্শন করিতে যত্নবান্ হইতেছেন:—"সেই স্বয়ং-জ্যোতিঃ-স্বরূপ আত্মা সকলের সহিত সমানাকার হইয়া (অর্থাৎ সর্ব্বাকারে) উভয় লোকে সঞ্চরণ করে।"*—কি সূত্রে সমানাকার বা একরূপত্ব? বুদ্ধি সূত্রে। বুদ্ধি অবভাস্য, সেই আত্মজ্যোতি তাহার অবভাসক। যেহেতু হৃৎশব্দবাচ্য বুদ্ধিই আত্মার নিকটতম, এবং বুদ্ধিতেই আত্মার ক্রিয়ারম্ভ, অতএব বুদ্ধি দ্বারাই আত্মার সমানাকারতা। তাহা কিরূপ? অশ্ব হইতে মহিষের বিবেকের ন্যায় বুদ্ধি হইতে ভিন্নরূপে আত্মার অনুপলব্ধি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়,—যেমন আলোক সম্বন্ধে অবভাস্য ঘটাদি এবং অবভাসক আলোকের পৃথক্‌ভাবে অনুপলব্ধি লোক-প্রসিদ্ধ। আলোকের বিশুদ্ধত্ব হেতু আলোক তাহার অবভাস্য ঘটাদির সদৃশাকারে প্রকাশিত হয়। আলোক যখন রক্তবর্ণ বস্তু প্রকাশ করে, তখন রক্ত সদৃশ হয়। অথবা যখন হরিত, নীল বা লোহিত বস্তু প্রকাশ করে, আলোক তখন নীলাদি সদৃশ হয়†। আত্মজ্যোতিও সেইরূপ বুদ্ধিকে আলোকিত করিয়া, বুদ্ধির সহিত সমানাকার হইয়া, বুদ্ধিদ্বারা সমস্ত বিষয়জাত (ক্ষেত্র) প্রকাশ করে। মরকত মণির দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বলা হইয়াছে। এ জন্যই বলা হইয়াছে—"সমানঃ সন্"—বুদ্ধির সর্ব্ব সমানতা দ্বারা আত্মা সর্ব্বময় এবং সর্ব্বাকার হয়। আত্মাকে কোন বস্তু বিশেষ হইতে প্রবিভক্ত করিয়া মুঞ্জঘাস (S. Sara) হইতে তাহার ইষীকার (Inflorescence) ন্যায়,—পৃথক্‌ভাবে আত্মজ্যোতিরূপে প্রদর্শন করিতে না পারা যাইবার ইহাই কারণ। আত্ম-জ্যোতির ধর্ম্ম নাম-রূপেতে, এবং নাম রূপের ধর্ম্ম আত্ম-জ্যোতিতে,—এই অন্যোন্যাধ্যাস দ্বারা সকল ব্যাপার

* "সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব।"

† Note how correctly the ancients anticipated the relation between colourless or white light, and the seven colours,—red, orange, yellow, green, indigo, blue, and violet.

আত্মাতে অধ্যারোপ করিয়া, লোক সকল মোহ-প্রাপ্ত হয়, এবং 'এই সেই আত্মা', 'সেই আত্মা এই নয়', 'আত্মার ধর্ম্ম এইরূপ', 'আত্মার ধর্ম্ম এইরূপ নয়', 'আত্মা কর্ত্তা', 'আত্মা কর্ত্তা নয়', 'আত্মা শুদ্ধ', 'আত্মা শুদ্ধ নয়', 'আত্মা বদ্ধ', 'আত্মা মুক্ত', 'আত্মা স্থির থাকে', 'আত্মা গমনাগমন করে', 'আত্মা অস্তি', 'আত্মা নাস্তি'—ইত্যাদি নানা প্রকার বিরুদ্ধ কল্পনা লোকে করিয়া থাকে। এই সকল কারণে বলা হইতেছে ঃ—'সকলের সহিত সমানাকার হইয়া আত্মা উভয় লোকে সঞ্চরণ করে।' উভয় লোক বলিতে প্রাপ্ত এবং প্রাপ্তব্য, অথবা ইহ এবং পরলোক গৃহীত হইতেছে। এক দেহেন্দ্রিয়-সংঘাত পরিত্যাগের পর অন্য দেহেন্দ্রিয়-সঙ্ঘাতের গ্রহণ—পুনঃ পুনঃ এইরূপ শৃঙ্খলবন্ধের ন্যায় শত অবস্থার ভিতর দিয়া আত্মা একের পর অন্যেতে সঞ্চরণ করে। বুদ্ধির সহিত সাদৃশ্যই আত্মার উভয় লোক সঞ্চরণের হেতু। আত্মা স্বতঃ কোনরূপ ভেদযুক্ত নয়। বুদ্ধ্যাদির সমানাকার হওয়াতেই আত্মা বুদ্ধি-যোগে পর্য্যায়ক্রমে উভয় লোকে সঞ্চরণ করে। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির পর্য্যায়েও তাহাই প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। উপনিষদ্‌ও তাহাই দেখাইতেছে ঃ—"ধ্যায়তীব"—যেন ধ্যান বা চিন্তা করিতেছে, অর্থাৎ ধ্যান-ব্যাপারবতী বুদ্ধিকে তৎস্থিত আত্ম-চৈতন্য-জ্যোতিদ্বারা আলোকিত করিয়া, বুদ্ধি-সদৃশ হইয়া আত্মাও যেন ধ্যান করিতেছে, এরূপ দেখায়। ঘটাদি সম্বন্ধে আলোকের ন্যায়। এজন্যই লোকের ভ্রম জন্মে,—যেন আত্মাই চিন্তা করিতেছে। পরমার্থতঃ আত্মা ধ্যান করিতেছে, এরূপ নয়। আবার বুদ্ধ্যাদি করণ বা প্রাণাদি বায়ু চঞ্চল হইলে, বুদ্ধ্যাদির অবভাসকত্ব হেতু আত্মাও তৎসদৃশ দেখায়,—যেন আত্মাও চঞ্চল—"লেলায়তীব"। কিন্তু পরমার্থতঃ সেই আত্মজ্যোতি চলনধর্ম্মশীল নয়।"

"বুদ্ধ্যাদির সহিত সমানত্ব ভ্রান্তিই যে আত্মার উভয় লোক সঞ্চরণের হেতু, আত্মা যে স্বতঃ সেরূপ নয়,—ইহা কিরূপে জানা যায়?

ইহাই প্রদর্শনজন্য প্রমাণ উপদিষ্ট হইতেছে ঃ—"যেহেতু, সেই আত্মা স্বপ্নরূপে যখন যে বুদ্ধির সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সেই বুদ্ধি তখন যে যে আকার ধারণ করে, আত্মাও যেন সেই সঙ্গে সেই সেই আকার ধারণ করে। এজন্য বলা হইতেছে ঃ—বুদ্ধি যখন স্বপ্নবৃত্তি লাভ করে, সেই সঙ্গে আত্মাও স্বপ্নবৃত্তি লাভ করে। আবার বুদ্ধি যখন জাগরিত-বৃত্তি গ্রহণ করে, আত্মা ও তাহাই করে। এই হেতু বলা হইয়াছে "স্বপ্নো ভূত্বা"* বা যখন স্বপ্নবৃত্তিকে অবভাসিত করে, তখন স্বপ্নবৃত্তির আকার গ্রহণ করিয়া, এই জাগরিত ব্যব-হারাত্মক বা কার্য্য-করণ-সংঘাতাত্মক, অথবা লৌকিক এবং শাস্ত্রীয় ব্যবহারাত্মক,—এই লোক অতিক্রম করিয়া গমন করে। তদ্দ্বারা আত্মা যে এই কার্য্যকরণ-সংঘাত হইতে বিবিক্ত বা পৃথগ্-ভূত তাহাই প্রতিপন্ন হয়। আত্মা তখন স্বীয় আত্মজ্যোতির্দ্বারা স্বপ্নাত্মিকা বুদ্ধিবৃত্তিকে আলোকিত করিয়া অবস্থান করে। যেহেতু এইরূপ হয়, অতএব সেই আত্মা বিশুদ্ধ এবং স্বয়ং-জ্যোতিঃস্বভাব। অতএব সেই আত্মা কর্ত্তৃ-ক্রিয়া-কারক, এবং ক্রিয়া-ফলাদি লৌকিক ভেদ-শূন্য। প্রকৃত পক্ষে ধী-সাদৃশ্যই আত্মার উভয়লোক সঞ্চারাদি সদ্ব্যবহার-ভ্রান্তির হেতু। কার্য্যকরণ-সংঘাতকে "মৃত্যোঃ রূপাণি" বলা হইতেছে। মৃত্যু বলিতে 'সকাম কর্ম্ম' (অর্থাৎ ঐহিক বা পারত্রিক ফল কামনা করিয়া যাহা অনুষ্ঠিত হয়), অথবা 'অবিদ্যাকে' লক্ষ্য করে। মৃত্যুর স্বকীয় অন্য কোন প্রকার রূপ নাই। এই কার্য্য-করণ-সংঘাতই তাহার রূপ, কারণ এই কার্য্য-করণ-সঙ্ঘাতই ক্রিয়া বা সকাম কর্ম্মের, এবং ক্রিয়া-ফলের আশ্রয় ভূত। এজন্যই বলা হইতেছে স্বপ্নে মৃত্যুর রূপ, অর্থাৎ এই জাগরিত ব্যবহারাত্মক লোক, অতিক্রম করে।"

---

* "সহি স্বপ্নোভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি মৃত্যো রূপাণি।" ৭॥

(জ)। বুদ্ধদেব এবং বৌদ্ধদার্শনিকগণ।

অধুনাতন পণ্ডিতগণের অনুশীলনের ফলে, বুদ্ধ সম্বন্ধে আমরা অনেক নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিতেছি। যে বৌদ্ধকে পৌরাণিকগণ 'হৈতুক' 'পাষণ্ড' দিগের দেবতা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, আজ আমরা সেই বুদ্ধকে যথার্থ ই "এসিয়ার প্রদীপ" কেন,—জগতের প্রদীপ বলিয়া জানিতে পারিতেছি। বুদ্ধদেব দার্শনিক ছিলেন না। তাঁহাকেও ঋষি বা দ্রষ্টা বলা যাইতে পারে, কিন্তু কেবল মাত্র দ্রষ্টা বলিলেও তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়, কারণ তিনি মহা-প্রেমিক এবং কর্ম্মপথের পথিক ছিলেন। যাঁহারা জ্ঞান দৃষ্টিতে মাত্র দেখিয়াছিলেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," বা "বাসুদেবঃ সর্ব্ব-মিতি," "সকলই এক অদ্বিতীয় আত্মার প্রকাশ",—কিন্তু কার্য্য-কালে —("শ্বযোনিং বা শূকর-যোনিং বা চণ্ডাল-যোনিং বা," "শুনি চৈব শ্বপাকেচ")—যাঁহারা শূকর-কুকুরের সঙ্গে এক পর্য্যায়ে চণ্ডালের উল্লেখ করিতে লজ্জিত হন নাই,—বুদ্ধদেবকে তাহাদের সমশ্রেণীর সিদ্ধ-পুরুষ বলিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হয়। "রাগ-দ্বেষ-মোহের বন্ধন হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বপ্রেম লাভের আকাঙ্ক্ষা, কোন ও জীবের অকল্যাণ না করিবার আকাঙ্ক্ষা, অন্যায় অত্যাচার নিবারণের আকাঙ্ক্ষা, এবং স্বীয় অন্তরের বিশুদ্ধি সাধনের আকাঙ্ক্ষা"—বুদ্ধের মতে ইহাই যথার্থ পুরুষার্থ।* বুদ্ধ জীবন্মুক্তির ঋষি, জীবনমুক্তির প্রকৃত তত্ত্ব তিনি দর্শন করিয়া-ছিলেন। সুধু দর্শন করিয়াছিলেন তাহা নয়, তিনি স্বয়ং সেই জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় আচণ্ডাল বিশ্বমানবের নিকটে সেই তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন, এবং হস্তধারণ করিয়া বিশ্বমানবকে সেই পথে লইয়া চলিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং

* (১) See "the Dialogues of the Buddha" etc. by Rhys Davids.

বিশ্বপ্রেমের অতুল জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া, বিশ্বমানবের হৃদয়ে সেই প্রেমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। "মাতা যেমন তাহার একটি মাত্র সন্তানের রক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেন, সেইরূপে সর্ব্বজীবে প্রেম সাধনা করিবে," "সকলের প্রতি প্রেম, পরের দুঃখে দুঃখ, পরের সুখে সুখ, এবং নিজের সুখ-দুঃখে সমত্বই ব্রহ্ম-বিহার"—এই সকলই তাঁহার অমূল্য উপদেশ।

অপরদিকে যে সকল বাক্য লইয়া বিবাদ করিয়া লোক-সমাজ বিদ্বেষানলে দগ্ধ হয়, বুদ্ধ আপনাকে সে সকল বাক্যজাল হইতে দূরে রাখিতেন। চিত্ত সমাহিত করিয়া দেখ কি আছে, বৃথা 'পরমাত্মা' 'ঈশ্বর' ইত্যাদি বাক্য লইয়া বিরোধ করিওনা। এই অভিপ্রায়েই বোধ হয় তিনি 'পরমাত্মা' 'ঈশ্বর' ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করেন নাই। যিনি বাক্য-মনের অগোচর—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—সেই ঈশ্বর বা পরমাত্মা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব নীরব,—স্বীকার-অস্বীকার কিছুই করেন নাই। কিন্তু দেহেন্দ্রিয়-বুদ্ধি-মন হইতে ভিন্ন, পৃথক্ পৃথক্ জীবাত্মা বা 'আমির' অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করিয়াছেন:—কারণ তিনি দেখিয়াছিলেন, উপনিষদের ঋষিগণ যেমন দেখিয়াছিলেন, অথবা মুসলমান সুফিগণ* যেমন দেখিয়াছিলেন—*(২) অথবা খ্রীষ্টশিষ্য ঋষি পল ("Know ye not, ye are the temple of the Lord") যেমন দেখিয়াছিলেন, যে ব্যক্তিগত পৃথক্ পৃথক্ আমিত্ব-ভ্রান্তিই সমস্ত অজ্ঞানতার এবং রাগ-দ্বেষ-মোহের মূল। তিনি দেখিয়াছিলেন যে জীবন্ত বিশ্বপ্রেমের প্রভাবে সেই পৃথক্ ব্যক্তিগত আমিত্ব-ভ্রান্তি দূর হইলেই মুক্তি বা নির্ব্বাণের দ্বার উন্মুক্ত হয়। তাহার মতে জীবিতকালেই সেই মুক্তি বা (রাগদ্বেষমোহের) নির্ব্বাণ লাভ করিতে হয়।

---

* (২) "না তোমার অস্তিত্ব বলার অধিকার, না অনস্তিত্ব বলার অধিকার।" স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র সেনের তাপস মালা, ৩-৭৪॥

কালক্রমে বুদ্ধ-প্রদর্শিত সেই জীবন্ত সাধনালব্ধ বিশ্বপ্রেমের আদর্শ ম্লান হইলে পর, আত্মার এবং বিশ্বের অস্তিত্ব লইয়া বৌদ্ধদিগের মধ্যে ঘোর মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছিল। তখনই বৌদ্ধ দার্শনিকদিগেরও অভ্যুদয় হয়। বুদ্ধদেব দেহেন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধ্যাদির অতীত ব্যক্তিগত পৃথক্ পৃথক্ "আমির" বা জীবাত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন *। কিন্তু তিনি বিনাশবাদী বা শূন্যবাদী ছিলেন না। তাঁহার মত যে যাহারা দেহ থাকিতে জীবন্মুক্তি লাভ না করে, মৃত্যুর পর তাহারা স্ব স্ব কর্ম্ম বা অতৃপ্ত বাসনানুসারে দেহান্তর গ্রহণ করে। ইহাতে দেখা যায় যদিও তিনি ব্যক্তিগত জীবাত্মার ভেদ অস্বীকার করিতেন, তথাপি তিনি লোকান্তরে পর্য্যন্ত ব্যক্তিভেদ (Personal identity) স্বীকার করিতেন। তিনি যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্ম এবং কৃচ্ছ্রাদিসাধন নিরর্থক মনে করিতেন। লৌকিক সুকৃত-দুষ্কৃতেরই মাত্র পারলৌকিক ফল, তিনি স্বীকার করিতেন। ঈশ্বর বা পরমাত্মা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব নীরব। তাঁহার সাধনা জীবন্ত,—বস্তুগত,—বাক্যগত ছিল না। তিনি নামীর প্রয়াসী, নামের প্রয়াসী ছিলেন না। ধ্যান এবং চিত্ত সমাধানই তাঁহার, এবং তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী শিষ্যদিগের বিশেষ সাধনা ছিল। তাঁহারা কাঁহার ধ্যান করিতেন, কাঁহার মধ্যে চিত্ত-সমাহিত করিতেন? বুদ্ধের বহুকাল পরবর্ত্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বুদ্ধের এই জীবন প্রহেলিকা ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া পরমাত্মা সম্বন্ধে তাঁহার নীরবতাকেই "নাস্তিতা" মনে করিলেন। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ জীবাত্মা-পরমাত্মা উভয়ই অস্বীকার করিয়া সংশয়বাদের চরম সীমায় উপস্থিত হইলেন, —বিখ্যাত মিলিন্দ-নাগসেনের কথোপকথন তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

---

* "The belief in personal or individual souls may have been treated by Buddha as a relic of animism prevailing among primitive man."

তখন জীবন্ত বিশ্বপ্রেমের বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্ত প্রায়। তাহার পরিবর্ত্তে 'হৈতুক' 'পাষাণ্ড'(৩)* নামে অভিহিত নীরস তর্ক-প্রিয় বৌদ্ধদার্শনিক-দিগের সংশয়বাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের মত সম্বন্ধে মাধবাচার্য্য তাঁহার কৃত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বলিতে-ছেন:— "(১) মাধ্যমিক, (২) যোগাচার, (৩) সৌত্রান্তিক, এবং (৪) বৈভাষিক,—এই সকল নামে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগণ যথাক্রমে (১) সর্ব্বশূন্যবাদ, (২) বাহ্যশূন্যবাদ, (৩) বাহ্য বস্তুর অনুমেয়ত্ব, এবং (৪) বাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ-সিদ্ধত্ব মত আশ্রয় করেন"। তিনি বলেন "সুগতই বৌদ্ধদিগের দেবতা, এবং বিশ্বসংসার তাহাদের মতে ক্ষণ-ভঙ্গুর"। তিনি আবার বলিতেছেন:—"বৌদ্ধগণ বৈভাষিকাদি চারিটী প্রস্থান বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তন্মধ্যে (১) বৈভাষিকগণ বাহ্যবস্তু এবং তৎবিষয়ক জ্ঞান উভয়ই স্বীকার করেন, (২) সৌত্রান্তিকগণ প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য বাহ্যবস্তু স্বীকার করেন না, (৩) যোগাচারগণ বুদ্ধির সহিত আকারের যোগই মাত্র স্বীকার করেন, এবং (৪) মাধ্যমিকগণের মতে কেবল মাত্র সংবিৎ বা জ্ঞানই আপনার মধ্যে আপনি বর্ত্তমান" †। উক্ত সম্প্রদায় চতুষ্টয়

* (৩) "তদগৃহীত-বিসৃষ্টেষু পাষণ্ডেষু মতির্নৃনাং ধর্ম্মইত্যুপধর্ম্মেষু নগ্নরক্ত-পটাদিষু"—'ইন্দ্রের পরিত্যক্ত নগ্ন (জৈন), রক্তপট (বৌদ্ধ) প্রভৃতি পাষণ্ড-দিগের উপধর্ম্মে লোকের ধর্ম্মবুদ্ধি" স্কন্ধ ৪—অ ১৯-১৮।

শ্রীমদ্ভাগবত।

† "তে চ মাধ্যমিক-যোগাচার-সৌত্রান্তিক-বৈভাষিক-সংজ্ঞাভিঃ প্রসিদ্ধা বৌদ্ধা যথাক্রমং সর্ব্বশূন্যত্ব-বাহ্যশূন্যত্ব-বাহ্যার্থানুমেয়ত্ব-বাহ্যার্থপ্রত্যক্ষত্ববাদানাতিষ্ঠন্তে"।

"বৌদ্ধানাং সুগতো দেবো বিশ্বঞ্চ ক্ষণভঙ্গুরং"॥

"চতুঃপ্রস্থানিকা বৌদ্ধাঃ খ্যাতা বৈভাষিকাদয়ঃ।

অর্থো জ্ঞানান্বিতো বৈভাষিকেণ বহুমন্যতে।

সৌত্রান্তিকেন প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্যোঽর্থো ন বহির্মতঃ॥

ভিন্ন আরও নানাপ্রকার বৌদ্ধ দার্শনিক মত প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আজ ও অতি সংকীর্ণ। মূল বৌদ্ধগ্রন্থসকল সাধারণে বহুল পরিমাণে প্রচলিত না হওয়া পর্য্যন্ত, বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ জ্ঞান লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। অধুনা বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিতেছি, তাহা তাহাদের প্রতিপক্ষ পৌরাণিক অথবা দার্শনিকদিগের বর্ণনা হইতেই সংগৃহিত। এরূপ অবস্থায় যে বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের প্রতি অবিচার হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি!

শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয় কালে বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। তাহাদেরই সঙ্গে শঙ্করকে সময়ে সময়ে বিচার করিতে হইয়াছিল। এজন্য শঙ্কর তাঁহার বৃহদারণ্যকভাষ্যে বৌদ্ধ দার্শনিক মত খণ্ডন করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন। 'সর্ব্বশূন্যবাদ', 'ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ' 'বাহ্যার্থ বাদ' 'ক্ষণ-ভঙ্গ বাদ' —শঙ্কর একে একে এই সমস্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি প্রথমে মনবুদ্ধ্যাদি হইতে স্বতন্ত্র অন্তরতম আত্ম-জ্যোতির অস্তিত্ব বিষয়ে বৌদ্ধদিগের আপত্তি বর্ণন করিতেছেন:—"কিন্তু বুদ্ধির সমানাকার, অথচ বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র, এবং বুদ্ধির অবভাসক কিছুই নাই। প্রত্যক্ষ অথবা অনুমানদ্বারা বুদ্ধি-ব্যতিরিক্ত কোন আত্ম-জ্যোতির উপলব্ধি হয় না। বুদ্ধি যখন কোন বস্তু-বিশেষের আকার গ্রহণ করে, তখনই সেই বস্তুর উপলব্ধি হয়। কিন্তু তৎকালে বুদ্ধির সমানাকার অন্য একটি দ্বিতীয় বুদ্ধির উপলব্ধি কখনও হয় না। ঘট এবং আলোক উভয়ই প্রত্যক্ষ।—অবভাস্য ঘট এবং অবভাসক আলোকের স্বতন্ত্রত্ব প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ,—যদি ও বিচার

আকারসহিতা বুদ্ধির্যোগাচারস্য সম্মতা।
কেবলাং সংবিদং স্বস্থাং মন্যতে মধ্যমাঃ পুনঃ॥
সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, বৌদ্ধ দর্শন॥

দ্বারা ঘট হইতে আলোককে পৃথক্ করা যায় না। ঘট এবং আলোকের পরস্পর সাদৃশ্য অনুমান করা যাইতে পারে, কারণ ঘট হইতে পৃথক্‌রূপে আলোকের অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়। ঘট এবং আলোকের ন্যায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট ভিন্নবস্তুদ্বয়েরই পরস্পর সাদৃশ্য সম্ভব। কিন্তু ঘট এবং আলোকের ভিন্নত্ব সম্বন্ধে যেরূপ, এস্থলে সেরূপ বুদ্ধি হইতে ভিন্ন কোন বস্তু অথবা বুদ্ধির অবভাসকরূপে বুদ্ধি হইতে ভিন্ন কোন জ্যোতি প্রত্যক্ষ, অথবা অনুমানদ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। অতএব এস্থলে বুদ্ধির নিজেরই চিৎস্বরূপাবভাসকত্ব, বা গ্রাহক-চৈতন্য-স্বরূপত্ব-স্বীকার করিতে হয়। বুদ্ধি নিজেই নিজের আকারে, এবং ঘটাদি বিষয়ের আকারে প্রকাশিত হয়। প্রত্যক্ষ অথবা অনুমান দ্বারা বুদ্ধির অবভাসক, অথচ বুদ্ধি হইতে ব্যতিরিক্ত কোনরূপ জ্যোতির অস্তিত্ব প্রতিপাদন করা যায় না। আবার যদিও দৃষ্টান্ত স্বরূপে পূর্ব্বে স্বীকার করা হইয়াছে যে ঘটাদি অবভাস্য তাহার অবভাসক আলোক হইতে ভিন্ন বস্তু, এবং তাহারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইলে বলা যায় যে ঘটের সহিত আলোকের সাদৃশ্য আছে,—তাহাও কেবল তর্কস্থলেই মাত্র আমরা স্বীকার করিতেছি। বস্তুতঃ সে স্থলেও ঘটাদি অবভাস্য, এবং আলোক—তাহার অবভাসক, ভিন্ন বস্তু নয়। পরমার্থতঃ সেস্থলে প্রতিমূহুর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন একটির পর একটি আলোক-যুক্ত নূতন ঘট উৎপন্ন হয় (ক্ষণভঙ্গবাদ)। অথবা কেবল মাত্র বিজ্ঞানই আলোকযুক্ত ঘটাদি বাহ্য বিষয়ের আকারে প্রকাশিত হয় (বিজ্ঞানবাদ)। এরূপ স্বীকার করিলে, যেহেতু সমস্তই বিজ্ঞানাত্মকমাত্র হয়, অতএব তাহার কোন বাহ্য দৃষ্টান্তই সম্ভব হয় না। এইরূপে (বৌদ্ধগণ) সেই বিজ্ঞানের গ্রাহ্যাকার এবং গ্রাহকাকার (Object and subject) রূপ মলিনতা কল্পনা করিয়া, পুনরায় (সাধনাদ্বারা) তাহার বিশুদ্ধি ও কল্পনা করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধদিগের কাহারো কাহারো মত যে গ্রাহ্য এবং গ্রাহকরূপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইলে, সেই বিজ্ঞানই স্বচ্ছীভূত হইয়া ক্ষণিকরূপে অবস্থান করে। কেহ বা সেই স্বচ্ছ বিজ্ঞানের ও নির্ব্বাণ ইচ্ছা করেন। কাহারও কাহারও মতে সেই বিজ্ঞানই সাধনা-দ্বারা গ্রাহ্য-গ্রাহকাংশ-বিনির্ম্মুক্ত হইলে শূন্যরূপ হয়। মাধ্যমিকেরা বলেন যে, সেই বিজ্ঞানই ঘটাদি বাহ্যবস্তুর সমানাকার হয়। বুদ্ধি বিজ্ঞানের অবভাসক, বুদ্ধ্যাদি হইতে ব্যতিরিক্ত, পূর্ব্বোক্ত আত্ম-চৈতন্য-জ্যোতির অস্তিত্ব অস্বীকার দ্বারা বৈদিকমার্গের প্রতিপক্ষ হওয়াই বৌদ্ধদিগের এই সমস্ত কল্পনার উদ্দেশ্য। বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের মধ্যে যাহাদের মতে বাহ্যবস্তুই মাত্র আছে, তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর দেওয়া যাইতেছে।"*

---

(২৮) বাহ্যার্থের ব্যতিরিক্ত-চৈতন্য-গ্রাহ্যত্ব, অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর জ্ঞাতা বাহ্যবস্তু হইতে ভিন্ন।

বৌদ্ধগণ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বাহ্যবস্তু মাত্রই আছে। তাহা হইতে পৃথক্, বাহ্য বস্তুর কোন গ্রাহক বা জ্ঞাতা নাই, শঙ্কর তাহাদিগকে বলিতেছেন—"তাহা নয়, কারণ ঘটাদি বাহ্যবস্তু নিজে নিজের অনবভাসক, অর্থাৎ আপনি আপনাকে প্রকাশ করিতে অক্ষম। অন্ধকারে অবস্থিত ঘটাদি কখনও আপনাদ্বারা আপনি প্রকাশিত হয় না। সে সকল নিয়তই প্রদীপাদির আলোক-সংযোগ দ্বারা প্রকাশমান দৃষ্ট হয়। ঘট এবং আলোক পরস্পরের সহিত যুক্ত হইলেও তাহাদের পরস্পরের ভিন্নত্ব দৃষ্ট হয়। রজ্জুর সহিত ঘটের পুনঃপুনঃ সংশ্লেষ-বিশ্লেষের ন্যায়, ঘটের সহিত আলোকের পুনঃপুনঃ সংশ্লেষ এবং বিশ্লেষ দৃষ্টে, তাহাদেরও পরস্পর ভেদ প্রতিপন্ন হয়। সেই ভেদ দৃষ্টেই বলা

---

* "তত্র যেষাং বাহ্যোর্থোঽস্তি তান্ প্রত্যাচাতে।"

হয়, ঘটাদির অবভাসক,—আলোক, ঘট হইতে স্বতন্ত্র। ঘট আপনা-দ্বারা আপনি প্রকাশিত হয় না। (তবে প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন যে) যদিও ঘট আপনাকে আপনি প্রকাশিত করিতে অক্ষম, তথাপি প্রদীপ আপনাকে আপনি প্রকাশিত করে, ইহা প্রত্যক্ষ, যেহেতু ঘটাদির ন্যায় প্রদীপের দর্শনার্থ লোকে আলোকান্তর গ্রহণ করে না। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, প্রদীপ আপনাকে আপনি প্রকাশ করে। (এ কথার উত্তরে বলা যাইতেছে) তাহা নয়। (আত্ম-চৈতন্যদ্বারা) প্রকাশ্যত্ব বিষয়ে ঘট এবং প্রদীপের মধ্যে কোন বিশেষ বা পার্থক্য নাই। যদিও প্রদীপ স্বয়ং-প্রকাশ-স্বভাব হওয়াতে ঘটাদি অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে, তথাপি প্রদীপ ও পূর্ব্বোক্ত ব্যতিরিক্ত-চৈতন্য বভাস্যত্বের নিয়ম লঙ্ঘন করে না। এ সম্বন্ধে প্রদীপ ও ঘটাদিরই তুল্য। যেহেতু এইরূপই (নিয়ম), অতএব ব্যতিরিক্ত-চৈতন্যাবভাস্যত্ব অবশ্যম্ভাবী (necessary and universal)। তবে ঘট এবং প্রদীপের মধ্যে এই মাত্র বিশেষ, যে ঘট আত্মচৈতন্যের অবভাস্য হইলেও তাহা হইতে ভিন্ন প্রদীপাদি আলোকান্তরের অপেক্ষা করে, কিন্তু প্রদীপ সেরূপ আলোকান্তরের অপেক্ষা করে না। অতএব প্রদীপ অন্যাবভাস্য, অর্থাৎ আত্মচৈতন্যাবভাস্য হইলেও প্রদীপ আপনাকে আপনি অবভাসিত করে। এজন্য প্রদীপকে স্বতঃ-অবভাস্য বলা যায় বটে, কিন্তু ব্যতিরিক্ত-চৈতন্যাবভাস্যত্ব বিষয়ে ঘট এবং প্রদীপ,—এই উভয়ের মধ্যে কোন বিশেষ নাই। ঘটের চৈতন্যাবভাস্যত্ব যেরূপ, প্রদীপের চৈতন্যাবভাস্যত্ব ও সম্পূর্ণ সেই-রূপ। সচরাচর যে বলা হয়, প্রদীপ আপনাকে এবং ঘটকে উভয়কে অবভাসিত করে, তাহা বলা ঠিক নয়। কেন? (প্রদীপ) যখন আপনাকে অবভাসিত না করে, তখন কিরূপ হয়? তখন (গ্রাহক চৈতন্যের অভাবে) প্রদীপের স্বতঃ-অবভাস্যত্ব, এবং ঘটের পরতঃ-অবভাস্যত্বে কোন বিশেষ দৃষ্ট হয় না। তখন (প্রদীপ ও ঘটাদির

ন্যায়) অবভাস্য মাত্রই থাকে। ঘট এবং প্রদীপ উভয়ের অবভাসক গ্রাহক-চৈতন্য যখন নিকটে থাকে, এবং যখন তাহা নিকটে না থাকে, তাহাতেই পার্থক্য দৃষ্ট হয়। প্রদীপের আপনার সম্বন্ধে আপনার সন্নিধি বা অসন্নিধি হইতে পারে না। গ্রাহক-চৈতন্য সম্বন্ধে যখন প্রদীপাদির স্বতঃ-অবভাস্যত্বের, এবং ঘটাদির পরতঃ-অবভাস্যত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, তখন প্রদীপ আপনাকে আপনি প্রকাশ করে, একথা মিথ্যাই বলা হয়। ব্যতিরিক্ত-চৈতন্য-গ্রাহ্যত্ব বিষয়ে ঘটাদির সহিত প্রদীপের কোন পার্থক্য নাই"। এইরূপে, আমরা দেখিতে পাই ব্যতিরিক্ত গ্রাহক-চৈতন্যের সত্তা প্রতিপন্ন করিয়া শঙ্কর বৌদ্ধদিগের 'বাহ্যার্থবাদ' খণ্ডন করিতেছেন। ব্রহ্ম-সূত্র-ভাষ্যে শঙ্কর আরো বিস্তারিতরূপে বৌদ্ধদিগের বাহ্যার্থবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। বাহ্যার্থবাদীরা বাহ্যবস্তু ভিন্ন আর কিছুই স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে বাহ্যবস্তুও ক্ষণিক, আকাশস্থ মেঘের ন্যায় নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। তাহারা কোন চেতন ভোক্তা বা জীব, অথবা জগতের কোন চৈতন্যময় প্রশাসিতা বা ঈশ্বর স্বীকার করেন না। বাহ্যার্থবাদীরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত:—(১) সৌত্রান্তিক, তাহাদের মতে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব অনুমান-সিদ্ধ বা পরোক্ষ, এবং (২) বৈভাষিক, তাহাদের মতে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বা অপরোক্ষ। ব্রহ্ম-সূত্র-ভাষ্য ২-২-১৮ হইতে ২৬ সূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য। গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে এ স্থলে তাহার উল্লেখ করা গেল না।

---

(২৯) বিজ্ঞানের ব্যতিরিক্ত-চৈতন্য-গ্রাহ্যত্ব, অর্থাৎ গ্রাহক বা জ্ঞাতা বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন।

অনন্তর শঙ্কর বৌদ্ধদিগের বিজ্ঞান-বাদখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইতেছেন:—"বিজ্ঞান সম্বন্ধে বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, যে বিজ্ঞান আপনিই আপনার গ্রাহ্য বা অবভাস্য (Object), এবং আপনিই আপনার গ্রাহক বা অবভাসক (Subject)। প্রদীপের

দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে গৃহিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ বিজ্ঞানের ও ব্যতিরিক্ত-চৈতন্য-গ্রাহ্যত্ব বাহ্যবস্তুরই তুল্য।” শঙ্কর দেখাইতেছেন :—“বিজ্ঞান যদি ব্যতিরিক্ত-চৈতন্য-গ্রাহ্য না হয়, এবং বিজ্ঞান যদি আপনি আপনার গ্রাহ্য, এবং আপনি আপনার গ্রাহক উভয়ই হয়, তবে বিজ্ঞানই দ্বিবিধ হইল :—গ্রাহ্য বিজ্ঞান, এবং গ্রাহক বিজ্ঞান। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতেছেঃ—বুদ্ধি-বিজ্ঞান কি তবে গ্রাহ্য-বিজ্ঞানেরই গ্রাহ্য (object to the object-intellect), অথবা গ্রাহক-বিজ্ঞানের গ্রাহ্য (object to the subject-intellect)? এই সন্দিহ্যমান বিষয়ে অন্যত্র যে ন্যায় অবলম্বিত হয়, তাহাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। দৃষ্টের বিপরীত কল্পনা হইতে পারে না, অর্থাৎ বিজ্ঞানও গ্রাহক-বিজ্ঞানেরই গ্রাহ্য, এবং প্রদীপাদি বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে যেমন গ্রাহক বা জ্ঞাতা (subject) গ্রাহ্য বা জ্ঞেয় (object) প্রদীপাদি হইতে ব্যতিরিক্ত, বিজ্ঞান সম্বন্ধে ও সেই রূপই বিজ্ঞানের গ্রাহক বিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্ত হইবে। তাহা হইলেই চৈতন্য-গ্রাহ্যত্ব হেতু,—প্রকাশ-স্বভাব স্বত্বেও, প্রদীপের ন্যায় বিজ্ঞানেরও ব্যতিরিক্ত-চৈতন্য গ্রাহ্যত্ব অনুমান করাই যুক্তি-সঙ্গত। বিজ্ঞানের অনন্য-গ্রাহ্যত্ব, অথবা বিজ্ঞান আপনিই আপনার গ্রাহক (Subject), এরূপ কল্পনা অসঙ্গত। সেই অন্য বা ব্যতিরিক্ত-চৈতন্য যাহা বিজ্ঞানের ও গ্রাহক (Subject), তাহাই আত্মা, তাহাই অন্তরস্থ জ্যোতিঃ —বিজ্ঞান হইতে ও অন্তরতম। যদি বল তাহা হইলে অনবস্থা দোষ হয়,—যথা বিজ্ঞানের গ্রাহকান্তর অপেক্ষা, আবার সেই গ্রাহকের গ্রাহকান্তরাপেক্ষা, তাহার আবার গ্রাহকান্তরাপেক্ষা,—এইরূপে গ্রাহকান্তরের অনন্ত শৃঙ্খল,—তাহা নয়*। গ্রাহ্য-বস্তুর পক্ষে গ্রাহক হওয়া অসম্ভব।” বিজ্ঞানাদিও গ্রাহ্য বস্তু। অতএব বিজ্ঞানাদির পক্ষেও

* Exactly the same objection has been taken by H. Spencer in his article on the 'Substance of the Soul unknowable, in his Psychology. On this argument he bases his agnosticism.

আপনার সম্বন্ধে আপনার গ্রাহকত্ব অসম্ভব। "বিজ্ঞানের গ্রাহকের বস্তন্তরত্ব অথবা ব্যতিরিক্তত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানের গ্রাহ্যত্ব অথবা অগ্রাহ্যত্বই ন্যায়তঃ উক্ত একমাত্র লিঙ্গ। অর্থাৎ যাহা যাহা গ্রাহ্য, তাহাই ব্যতিরিক্ত গ্রাহকের গ্রাহ্য,—যেমন ঘটাদি। (Whatever is an object, is an object to a subject other than itself)। ইহাই গ্রাহ্য হইতে গ্রাহকের ব্যতিরিক্তত্ব অনুমানের হেতু। সেই গ্রাহকান্তরের একান্ত গ্রাহকতা, অর্থাৎ সেই গ্রাহকান্তর যে কেবল গ্রাহকই, গ্রাহ্য নয়, অথবা সেই গ্রাহকান্তরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ও দ্বিতীয়ের অভাব হেতু, কখনও কোন অনুমাপক লিঙ্গ সম্ভব হয় না।" অনুমাপকলিঙ্গের কোন স্থান নাই,—কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আত্মা বা গ্রাহক-চৈতন্য স্বয়ং-সিদ্ধ চৈতন্য-জ্যোতিঃস্বরূপ। "অতএব সেরূপ কোন অনবস্থার স্থান নাই*। আবার যদি বল যে বিজ্ঞানের ব্যতিরিক্ত-গ্রাহ্যত্ব অর্থাৎ বিজ্ঞানের গ্রাহক সেই বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন, ইহা স্বীকার করিলে, করণান্তরের (অন্য তৎসম্বন্ধী ইন্দ্রিয়াদি যন্ত্রের) ও অপেক্ষা করে, অতএব করণ সম্বন্ধেও অনবস্থা,—তাহা নয়। কারণ সর্ব্বত্র এরূপ কোন নিয়ম নাই যে, যেখানেই এক বস্তু দ্বারা অন্য বস্তু গৃহীত হয়, সেখানেই গ্রাহ্য এবং গ্রাহক উভয় হইতে ব্যতিরিক্ত করণান্তর ও থাকে। এ সম্বন্ধে বৈচিত্র্যই দৃষ্ট হয়। কিরূপ? যথা, ঘট হইতে পৃথক্ আত্ম-চৈতন্যদ্বারা ঘট গৃহীত হইলেও, গ্রাহ্য ঘট এবং গ্রাহক চক্ষুরাদিমান্ পুরুষ হইতে পৃথক্, আলোকাদি করণ বা সাহায্যকারী থাকে। প্রদীপাদির আলোক, ঘটের ও অংশ নয়, চক্ষুর ও অংশ নয়। কিন্তু প্রদীপ,

* টীকাকার আনন্দগিরি বলিতেছেন :—"কূটস্থবোধস্ত বিজ্ঞান সাক্ষিণোঽবিষয়ত্বান্নানবস্থা,—কূটস্থ বোধ স্বরূপ বিজ্ঞান সাক্ষীর অবিষয়ত্ব হেতু, অনবস্থা দোষ হয় না। The subject is self-conscious or self-known (স্বপ্রকাশ), and not known as an object (বিষয়) by an act of perception.

ঘটাদির ন্যায় পুরুষের চক্ষু-গ্রাহ্য হইলেও, চক্ষু এবং প্রদীপ উভয় হইতে ব্যতিরিক্ত, যাহা আলোকান্তর-স্থানীয় কোন করণান্তরের অপেক্ষা করে না। অতএব করণান্তর সম্বন্ধে এরূপ কোন নিয়ম প্রমাণ করা যায় না, যে যেখানেই ব্যতিরিক্ত-গ্রাহ্যত্ব থাকিবে, অর্থাৎ গ্রাহ্য হইতে গ্রাহক ভিন্ন হইবে, সেখানেই করণান্তরও থাকিবে। অতএব বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্ত গ্রাহকের (Subject) গ্রাহ্য (object) হওয়াতে, করণান্তর সম্বন্ধে অনবস্থা, অথবা গ্রাহক সম্বন্ধে অনবস্থা কখনও প্রমাণ করা যায় না। ইহা দ্বারা বিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্ত অন্তরস্থ আত্ম-জ্যোতি সিদ্ধ হইতেছে (জীবানন্দ পৃঃ-৭৩৫ আদি)।

অনন্তর শঙ্কর বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীদিগের অন্য রূপ আপত্তির উল্লেখ করিতেছেন:—"কিন্তু বিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্ত ঘটাদি বা প্রদীপাদি কোন বাহ্য বস্তুই নাই (*Esse* is *Percipii*)। যে বস্তু হইতে ব্যতিরিক্ত বা স্বতন্ত্রভাবে যে বস্তুর উপলব্ধি হয় না, সেই শেষোক্ত বস্তু প্রথমোক্ত বস্তুমাত্রাত্মকই দৃষ্ট হয়। যথা, স্বপ্ন-বিজ্ঞান-গ্রাহ্য ঘট-পটাদি বস্তুর স্বপ্ন-বিজ্ঞান হইতে পৃথক্‌রূপে উপলব্ধি হয় না, অতএব স্বপ্ন-দৃষ্ট ঘট-পটাদির স্বপ্ন-বিজ্ঞান-মাত্রতাই জানা যায়। সেইরূপ জাগরিত কালেও জাগ্রদ্বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ রূপে ঘট-প্রদীপাদির উপলব্ধি হয় না, অতএব জাগ্রদ্দৃষ্ট ঘট-প্রদীপাদির ও জাগ্রদ্বিজ্ঞানমাত্রতা হওয়াই যুক্তি-সঙ্গত। অতএব ঘট-প্রদীপাদি বাহ্যবস্তু কিছুই নাই, সকলই বিজ্ঞান মাত্র। সকলই যখন বিজ্ঞানমাত্র হইল, তখন এই যে বলা হয়ঃ—বিজ্ঞানের ব্যতিরিক্তাবভাস্যত্বহেতু বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ তাহার অবভাসক (Subject) অন্তরস্থ আত্ম-জ্যোতি আছে,—ঘটাদি সম্বন্ধে যেরূপ,—একথা মিথ্যা। কারণ সকলই যখন বিজ্ঞানমাত্র হইতেছে,—তখন গ্রাহ্য হইতে গ্রাহক স্বতন্ত্র, এরূপ অনুমানের ভিত্তি-স্বরূপ দৃষ্টান্তেরই অভাব।

এইরূপে প্রতিপক্ষের আপত্তি বর্ণন করিয়া, শঙ্কর তাহা খণ্ডন করিতেছেন:—"তাহা নয়। যতদূর আমরা সকলে স্বীকার করিয়া থাকি, ততদূর স্বীকার করিতেই হইবে। বাহ্য বস্তু যে আপনিও একান্তই স্বীকার করেন না, তাহা নয়। 'আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করিনা' যদি বলেন, তাহা নয়। 'বিজ্ঞান,' 'ঘট' 'প্রদীপ' এ সকল শব্দার্থের পৃথক্ত্ব হেতু বাহ্যবস্তু যতদূর স্বীকার করা বুঝায়, অন্ততঃ তত দূর, বিজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র ঘটাদি বস্ত্বন্তর আপনাকেও স্বীকার করিতে হইতেছে। বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন কোন বস্ত্বন্তর যদি আপনি স্বীকার না করেন, তবে 'বিজ্ঞান' 'ঘট' 'পট' এবম্প্রকার শব্দ সকল একার্থক হওয়াতে পর্য্যায়-শব্দত্ব (synonyms) প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ সাধন এবং সাধ্য বা সাধন-ফল যদি এক এবং বিজ্ঞানমাত্র হয়, তবে সাধ্য এবং সাধনের ভেদোপদেশাত্মক বৌদ্ধাদি শাস্ত্রও অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। অথবা সেই শাস্ত্রাদির কর্ত্তা বুদ্ধাদির অজ্ঞানতা প্রতিপন্ন হয়। আর এক কথা এই:—বিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্তরূপে বাদী, প্রতিবাদী, বাদ, এবং বাদ-দোষ ইত্যাদির সত্তা স্বীকার করা হয়। যেহেতু বাদী, প্রতিবাদী, প্রতিবাদীর বাদ, এবং বাদ-দোষ,—এ সকলই স্বীয় বিজ্ঞানমাত্র, এরূপ কেহই স্বীকার করে না। কারণ প্রতিবাদী-প্রভৃতির মত খণ্ডন করিতে হয়। কেহ মনে করে না যে নিজের বিজ্ঞানকেই নিজে খণ্ডন করিতে হয়, অথবা আপনাকে কেহ অন্যের আত্মা বা 'আমি' মনে করে না। সেরূপ হইলে সর্ব্বিসম্ব্যবহার লোপের সম্ভাবনা হইত। আর প্রতিবাদ্যাদিকে লোকে স্বীয় আত্মা বা 'আমি' বলিয়া উপলব্ধি করে, এরূপও কেহ স্বীকার করে না। বরং প্রতিবাদ্যাদিও ব্যতিরিক্ত-গ্রাহ্য, অর্থাৎ প্রতিবাদ্যাদি তাহাদের হইতে ভিন্ন গ্রাহকের (subject) গ্রাহ্য (object), এরূপই সকলে স্বীকার করে। অতএব প্রতিবাদ্যাদির ন্যায়, জাগ্রদ্বিষয়ত্ব (objectivity) হেতু, জাগ্রদ্বস্তু সমস্তই ব্যতিরিক্ত-গ্রাহ্য। দৃষ্টান্তও সুলভ, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির

সন্তানাদি যেমন পরস্পর ভিন্ন, অথবা ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধ-বিজ্ঞান যেমন পরস্পর ভিন্ন। ইহাতেই দেখা যায় বিজ্ঞানবাদী ও বিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্ত অন্তরস্থ আত্ম-চৈতন্য-জ্যোতির সত্তা অস্বীকার করিতে পারেনা। স্বপ্নে বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত বস্তুর অভাব, অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু বিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্ত নয়, অতএব জাগ্রদ্দৃষ্ট বস্তু ও বিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্ত নয়, এরূপ যদি বল তাহা নয়। স্বপ্নে বিজ্ঞান-ব্যতিরেকের, অর্থাৎ বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ বাহ্য বস্তুর অভাব হইলেও জাগ্রৎকালে বিজ্ঞান-ব্যতিরেকের, অর্থাৎ বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ বাহ্যবস্তুর সদ্ভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তদ্দ্বারাই সেই বাহ্য বস্তু যে বিজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র, তাহা সিদ্ধ হয়।" "আপনিও স্বপ্নগত ঘটাদি বিজ্ঞানের ভূতভাবত্ব, অর্থাৎ যাহা জাগ্রৎকালে আছে বলিয়া জানা গিয়াছিল,তাহাই স্বপ্নে দৃষ্ট হয়, স্বীকার করেন। তাহা স্বীকার করিয়াও, জাগ্রদ্বিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্ত বা পৃথক্ ঘটাদির অভাব বলিতেছেন"। অনন্তর শঙ্কর অতি সংক্ষেপে শূন্য-বাদী বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতেছেন:—'আবার বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত ঘটাদি ভাবাত্মক হউক, আর অভাবাত্মক বা শূন্যাত্মক হউক, ঘটাদি-বিজ্ঞান যে ভাবাত্মক তাহা স্বীকার করিতে হইতেছে। তাহা বারণ করা যায়না, যে হেতু তাহা বারণ করার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। এতদ্দ্বারা সর্ব্বশূন্যতা মতের উত্তর দেওয়া হইল। এই সঙ্গে গ্রাহক আত্মা যে বুদ্ধি-বিজ্ঞানের গ্রাহ্য অথবা অহঙ্কার-স্বরূপমাত্র, মীমাংসকদিগের এইমত ও যে খণ্ডিত হইয়াছে, তাহার ও উল্লেখ করিতেছেন:—"ইহাতেই 'আমি' এই অনুভূতি (বা অহঙ্কারদ্বারাই) গ্রাহকাত্মার গ্রাহ্যতা (objectivity) সিদ্ধ হয়, আত্মা-সম্বন্ধে মীমাংসকদিগের এই মতেরও প্রত্যুত্তর দেওয়া হইল,—যে হেতু গ্রাহ্য এবং গ্রাহক (object and subject) এই উভয়ের একত্ব নিরস্ত হইয়াছে"। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ২-২-২৭ হইতে ৩২ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর আরো বিস্তারিতরূপে বৌদ্ধদিগের ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

(৩০) বৌদ্ধদিগের ক্ষণভঙ্গবাদ খণ্ডন।

অনন্তর শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদিগের ক্ষণভঙ্গবাদ খণ্ডন করিতেছেন:— "আর যে বলা হয় আলোক-যুক্ত ভিন্ন ভিন্ন ঘট (প্রতিক্ষণে) উৎপন্ন হয়, একথা অসৎ। কারণ ক্ষণান্তরে ও 'এই ঘটই সেই পূর্ব্বের ঘট' এরূপ প্রত্যভিজ্ঞান (Recognition of identity) জন্মে। যদি বল যে এই প্রত্যভিজ্ঞান সাদৃশ্যজনিত (similarity), যেমন ছিন্ন কেশ-নখাদির পুনরুত্থান হইলে, মনে হইয়া থাকে,— তাহা নয়। আর কৃত্ত-কেশ-নখের পুনরুত্থানও ক্ষণিক নয়। অতএব কৃত্ত-কেশ-নখাদির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেও ক্ষণিকত্ব অসিদ্ধ হয়। আর কৃত্ত-পুনরুত্থিত-কেশ-নখাদির একত্ব জাতিগত একত্ব। কৃত্ত-কেশ-নখাদি পুনরুত্থিত হইলে, জাতিগত (generic) একত্ব হেতু, সেই পুনরুত্থিত কেশ-নখাদিতে কেশ-নখত্ব প্রত্যয় হয়। এজন্য সেই প্রত্যয় ভ্রান্ত নয়। দৃশ্যমান কৃত্তোত্থিত কেশ-নখাদিতে ব্যক্তি-নিমিত্ত (individuality), অর্থাৎ এই পুনরুত্থিত কেশ-নখই সেই কেশনখ যাহা পূর্ব্বে কৃত্ত বা কাটা হইয়াছিল, এরূপ প্রত্যয় হয় না। কেশ-নখ ছেদনের দীর্ঘকাল পরে কোন ব্যক্তির দর্শন লাভ হইলে, এবং পুনরুত্থিত বালাদি পূর্ব্বের তুল্য-পরিমাণ দীর্ঘ হইলে, তাহাতে তৎকালীন-বালাদি-তুল্যত্ব (similarity) প্রত্যয়ও হয় বটে, কিন্তু এই বালাদিই পূর্ব্বের বালাদি এরূপ (Identity) প্রত্যয় কখনও হয় না। ঘটাদি সম্বন্ধে 'এই ঘটই সেই পূর্ব্বের ঘট' (Identity), এরূপ প্রত্যয় হয়। অতএব কৃত্ত-বালাদির দৃষ্টান্ত ঘটাদির তুল্য নয়, কারণ ঘটাদি-বস্তু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় যে "সেই পূর্ব্বের ঘটই এই ঘট (Identity)"। এইরূপে প্রত্যক্ষের সহিত বিরোধ হেতু ঘটাদির ক্ষণিকত্বের, এবং ক্ষণভেদে ঘটাদির ভিন্নত্বের কল্পনা যুক্তি-সঙ্গত নয়। যেহেতু অনুমাপক লিঙ্গপরামর্শে ভ্রম হইলে, অনুমানে ভ্রম হইতে পারে, অতএব প্রত্যক্ষদ্বারা অবাধিত বিষয়েই অনুমান করিতে হয়। আর

ক্ষণভঙ্গবাদীর মতেও "এইঘটই সেইঘট" এরূপ তাদাত্ম্যের (Identity) উপলব্ধি, সাদৃশ্য-প্রত্যয়-জন্য (similarity) ভ্রম হইতে পারেনা, কারণ জ্ঞানের ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে, সাদৃশ্য-প্রত্যয়ও অসম্ভব। যখন কেহ এক বস্তু দেখিয়া পরে অন্য বস্তু দর্শন করে, তখনই তাহার সাদৃশ্য-প্রত্যয় জন্মে। কিন্তু ক্ষণিক-বাদীর মতে একই বস্তুদর্শী বস্তু-স্তর-দর্শনের জন্য ক্ষণান্তর পর্য্যন্ত অবস্থান করেনা। আর বিজ্ঞানের ক্ষণিকত্ব স্বীকার করাতে একবার মাত্র বস্তু-দর্শনেই সেই বিজ্ঞানেরও ক্ষয় হওয়া সঙ্গত। সাদৃশ্য-প্রত্যয় বলিলে 'তাহার সহিত ইহা সদৃশ' এরূপ বুঝায়। "তেনেতি"—'তাহার সহিত' বলাতে পূর্ব্বদৃষ্টের স্মরণ বুঝায়। 'ইদমিতি' 'ইহা' বলাতে বর্ত্তমান প্রত্যয় বুঝায়। 'তেনেতি' 'তাহার সহিত' বলাতে পূর্ব্বদৃষ্টকে স্মরণ করিয়া, যাবৎ 'ইদং' 'ইহা' অর্থাৎ বর্ত্তমান ক্ষণকাল পর্য্যন্ত, সেই স্মৃতির অবস্থিতি বুঝায়, তদ্দারাও ক্ষণবাদের খণ্ডন হইতেছে॥ অথবা 'তেন' বলিতে উপক্ষীণ স্মার্ত্ত প্রত্যয়, আর 'ইদম্' বলিতে অন্য বার্ত্তমানিক প্রত্যয় বুঝায়। 'ক্ষীয়তে'—'ক্ষয়' হয়। যদি বল পূর্ব্বদৃষ্ট প্রত্যয়ের ক্ষয় হয়, তবে 'তাহার সহিত ইহা সদৃশ' এরূপ সাদৃশ্য-প্রত্যয় হইতে পারে না। কারণ একাধিক বস্তু-দর্শন হইলেও পূর্ব্বদৃষ্ট 'একের' ক্ষয়জন্য অভাব হেতু—'তাহার সহিত ইহা সদৃশ'—এরূপ সাদৃশ্য প্রত্যয় অসম্ভব। তাহার উল্লেখ ও করা অসম্ভব। দ্রষ্টব্যের দর্শন মাত্রই যদি দৃষ্ট-বিষয়ক বিজ্ঞানের উপলয় হইল, তবে 'ইহা দেখিয়াছি' 'উহা দেখিয়াছিলাম'—এরূপ উল্লেখ অসম্ভব,—যেহেতু ক্ষণবাদীর মতে যে ব্যক্তি দেখিয়াছে, সে ব্যক্তি উল্লেখের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অবস্থান করে না। অতএব ক্ষণবাদ খণ্ডন ব্যবস্থিত রহিল। যে ব্যক্তি 'সেইটী' এবং 'এইটী' উভয়টী দেখেনাই, তাহার পক্ষে তাহাদের সাদৃশ্য প্রত্যয়, এবং তাহার উল্লেখ, জাত্যন্ধের রূপ-বিশেষের সাদৃশ্য-

প্রত্যয়, এবং তাহার উল্লেখের ন্যায় উপহাস-যোগ্য হয়। সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধাদির শাস্ত্র প্রণয়নাদি কার্য্য সকলই তবে অন্ধপরম্পরার ন্যায় হইয়া দাঁড়ায়। তাহা কাহারও অভিপ্রেত নয়। আবার ক্ষণবাদ স্বীকার করাতে অকৃতের অভ্যাগম, এবং কৃতের বিনাশরূপ দোষদ্বয় আরও প্রসিদ্ধতর। যদি বল যে 'পূর্ব্ব' এবং 'পর' একত্রে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া প্রত্যয় জন্মে, এবং সেই কারণেই 'তাহার সহিত ইহা সদৃশ'—ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্ব-দৃষ্টের উল্লেখ সম্ভব হয়। তাহা হইতে পারে না। তাহার কারণ বর্ত্তমান প্রত্যয়ের এবং অতীত প্রত্যয়ের ভিন্ন-কালত্ব। ভিন্ন-কালত্ব হেতু বর্ত্তমান প্রত্যয় এক শৃঙ্খলাবয়ব-স্থানীয়, এবং অতীত প্রত্যয় অপর শৃঙ্খলাবয়ব-স্থানীয়। এই উভয় প্রত্যয় পরস্পর ভিন্ন-কাল-সম্বন্ধী। যদি বল পূর্ব্ব-কথিত শৃঙ্খলা-প্রত্যয় উভয় প্রত্যয়ের বিষয়কে স্পর্শ করে, তবে একই বিজ্ঞানের পূর্ব্ব এবং পর ক্ষণদ্বয় ব্যাপীত্ব হেতু, আবার ক্ষণবাদের খণ্ডন হইতেছে। ক্ষণবাদ মতে 'আমার' 'তোমার' ইত্যাদি বিশেষত্ব অসম্ভব হওয়াতে সর্ব্ব সংব্যবহার লোপ হওয়াই সঙ্গত। আর যদি সকলই বুদ্ধি-বিজ্ঞানের (intellect) স্ব-সম্বেদ্য-বিজ্ঞান মাত্র হয়, এবং বুদ্ধি-বিজ্ঞান যদি স্বচ্ছ জ্ঞানের প্রকাশ-মাত্র-স্বভাব স্বীকার করা যায়, এবং যদি বুদ্ধি-বিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্ত, তাহারই দ্রষ্টা বা সাক্ষীরূপে কোন আত্মা না থাকে, তবে যাহা ক্ষণিক, দুঃখাত্মক, অথবা শূন্যমাত্র, তাহার আত্মত্বাদি নানাপ্রকার কল্পনা অসঙ্গত। স্বচ্ছাবভাস-স্বভাবত্ব স্বীকার করাতে দাড়িম্বাদির ন্যায় বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ অনেকাংশবত্ত্ব ও হইতে পারে না। আর যাহা ক্ষণিক বা যাহা দুঃখাদ্যাত্মক তাহা যদি বিজ্ঞানাংশই হইল, তবে অনুভূয়মানত্বহেতু তাহাকে ব্যতিরিক্ত-আত্মচৈতন্যের বিষয় বলাই সঙ্গত। আর যদি বল বিজ্ঞান অনিত্য এবং দুঃখাদ্যাত্মক, তাহা হইলে দুঃখাদির বিয়োগ দ্বারা বিজ্ঞানের বিশুদ্ধি কল্পনা ও অসঙ্গত। সংযোগী-মলের বিয়োগ

দ্বারাই বিশুদ্ধি সিদ্ধ হয়—যেমন আদর্শ প্রভৃতির। কিন্তু স্বাভাবিক ধর্ম্মের সহিত কাহারও বিয়োগ দৃষ্ট হয় না। যেমন স্বাভাবিক প্রকাশ এবং উষ্ণতার সহিত অগ্নির বিচ্ছেদ দৃষ্ট হয় না। যদিও দ্রব্যান্তরযোগে রক্তত্বাদি পুষ্প-গুণের বিয়োজন দৃষ্ট হয়, সেস্থলেও সংযোগ-পূর্ব্বত্বই অনুমান করিতে হয়, যেহেতু বীজভাব ধারণ উপলক্ষেই পুষ্প-ফলাদির মধ্যে গুণান্তরোৎপত্তি দৃষ্ট হয়। অতএব বিজ্ঞানের বিশুদ্ধি কল্পনা অসঙ্গত। বিষয়-বিষয়ী-ভেদরূপ ভ্রমই বিজ্ঞানের মল,—যাহা কল্পনা করা হয়,—বস্ত্বন্তর-সংসর্গের অভাবহেতু সেরূপ কল্পনাও অসঙ্গত। অবিদ্যমানের (অর্থাৎ ভ্রমাত্মক বিষয়-বিষয়ী-ভাবের) সহিত বিদ্যমান স্বচ্ছ-স্বভাব বিজ্ঞানের সংসর্গ হয় না। বস্ত্বন্তর সংসর্গই যখন অবিদ্যমান, তখন যাহা যাহার ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়, তাহা তাহারই স্বভাব। অতএব তাহা হইতে তাহার বিয়োজন হইতে পারে না, যেমন অগ্নি এবং উষ্ণত্ব, বা সূর্য্য এবং তাহার প্রভা। অতএব বস্ত্বন্তর-সংসর্গ দ্বারা বিজ্ঞানের মলিনত্ব, এবং তাহার বিয়োগ দ্বারা তাহার বিশুদ্ধির কল্পনা অন্ধ-পরম্পরার ন্যায় প্রমাণশূণ্য,—ইহাই দেখা যাইতেছে। আর যে সেই বিজ্ঞানের নির্ব্বাণে পুরুষার্থ কল্পনা করা হয়,—সেস্থলেও ফলের কোন আশ্রয় (ভোক্তা) কল্পনার স্থান নাই। কণ্টক হইতে যে বিশুদ্ধ তাহার পক্ষেই কণ্টক-বেধ-জনিত দুঃখের নিবৃত্তিরূপ ফল-লাভ সম্ভব। (ফলীর বা ভোক্তার অভাব অথচ ফল-লাভ,—তাহা হয় না)। কণ্টকবিদ্ধ কাষ্ঠখণ্ডের পক্ষে সেই দুঃখ-নিবৃত্তি-ফলের আশ্রয়ত্ব সম্ভব হয় না। সেইরূপ সর্ব্ব-নির্ব্বাণ হইলেও যদি ফলাশ্রয় বা ভোক্তা কেহ না থাকে, তবে তাহাতে পুরুষার্থ কল্পনা নিরর্থক। যে পুরুষ-শব্দ-বাচ্য সত্ত্ব বা আত্মা, বা বিজ্ঞানের অর্থই 'পুরুষার্থ' বলিয়া কল্পিত হইতেছে, সেই পুরুষের নির্ব্বাণ হইলে,—কাহার 'অর্থ' পুরুষার্থ হইবে? অপরদিকে যাহার মতে অনেকার্থদর্শী, বিজ্ঞান হইতে

ব্যতিরিক্ত আত্মা আছে, তাহার পক্ষে দৃষ্টের স্মরণ, দুঃখাদির সংযোগ এবং বিয়োগ,—সকলই সম্ভব,—অন্য-সংসর্গ-জনিত তাহার কলুষতা, এবং তদ্বিয়োগ-জনিত তাহার বিশুদ্ধি শূন্যবাদী-মত পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার প্রমাণ দ্বারাই অপ্রমাণিত, অতএব তাহার নিরাকরণের জন্য পৃথক্‌ভাবে যত্ন করা গেল না।' বৃহদারণ্যক—পৃঃ ৭৪৬ জীবানন্দ ॥

---

(৩১) শঙ্করের মায়াবাদে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের প্রভাব।

পাঠক দেখিতেছেন শঙ্করাচার্য্য তাঁহার উক্ত উপনিষদ্ভাষ্যে বৌদ্ধদিগের বাহ্যার্থবাদ, বিজ্ঞানবাদ, ক্ষণভঙ্গবাদ, এবং শূন্যবাদ খণ্ডন করিবার জন্য কত যত্ন করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ব্রহ্ম-সূত্র ভাষ্যে (২—২—১৮ হইতে ৩২) তিনি বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের এ সকল মতের আরও বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। স্থানান্তরে তাহা প্রকাশ করিবার আমাদের ইচ্ছা রহিল। ইহা দ্বারা পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন শঙ্করের সময়ে বৌদ্ধ দার্শনিক মতের প্রভাব কিরূপ দেশময় বিস্তৃত ছিল। শঙ্কর নিজেই বলিতেছেন "বৈনাশিকৈঃ সর্ব্বো লোক আকুলীক্রিয়তে" "বৈনাশিক (বৌদ্ধগণ) লোকসকলকে অস্থির করিয়া তুলিতেছেন" (২—২—২৬)। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যদিও শঙ্কর বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের মত খণ্ডনের জন্য এত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তথাপি আমরা দেখিতে পাই, বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ (Idealism) এবং শূন্যবাদ (Nihilism) যেন অদ্যাপি ভারতবাসীর অস্থিমজ্জাতে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। "সংসার মিথ্যা," "সংসার স্বপ্নবৎ" ইত্যাদি বৌদ্ধভাব অদ্যাপি আপামর আমাদিগের সকলেরই অস্থি-মজ্জাগত। এমন কি সংসা-রের অনিত্যতা অসারতার চিন্তায় নিরন্তর সশঙ্কিত থাকাতে, পৃথিবীর অপরাপর জাতি সকলের ন্যায়, অথবা আমাদেরই পূর্ব্ব-পুরুষদিগের

ন্যায়, অধুনাতন ভারতবাসী যেন প্রাণমন ঢালিয়া "অজরামরবৎ" জ্ঞান এবং ধনের বিস্তার দ্বারা দেশের দুঃখমোচনেরও চেষ্টা করিতে পারিতেছে না। ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে সরিষাদ্বারা ভূত ছাড়াইবে, সেই সরিষার ভিতরেই ভূত'! যে 'বিজ্ঞানবাদ' খণ্ডন করিয়া শঙ্কর তাঁহার মায়াবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন, সেই বিজ্ঞানবাদের দোষগুলি সমস্তই যেন শঙ্করের মায়াবাদে ও সংক্রামিত হইয়াছে। মায়াবাদ ভারতের প্রচলিত ধর্ম্মমত সকলের ভিত্তিস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমন কি যদিও অনেকে চৈতন্যদেবকে শঙ্করের বিরোধী বলিয়া কল্পনা করেন, কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই, চৈতন্যদেব শঙ্করের প্রবর্ত্তিত শৃঙ্গগিরি মঠের বিখ্যাত ভারতী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী কেশবভারতীর নিকটে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করিয়া পুনঃ পুনঃ আপনাকে "মায়াবাদী সন্ন্যাসী" বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। শঙ্করের পূর্ব্বে মায়াবাদ নামে কোন দার্শনিক মত ছিল না। মায়াবাদ শঙ্করাচার্য্যেরই প্রতিষ্ঠিত, এবং শঙ্করেরই নামে পরিচিত। আমরা নিম্নে বিদ্যারণ্যমুনীশ্বর কৃত পঞ্চদশীর উক্তির সহিত শঙ্করের নিজের উক্তির তুলনা করিয়া দেখাইব, যে শঙ্কর বৌদ্ধদিগের বিজ্ঞানবাদে, ক্ষণভঙ্গবাদে, এবং শূন্যবাদে যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, শঙ্করের নিজের ত্রুটীতে না হউক, অন্ততঃ তাঁহার সাম্প্রদায়িকদিগের ত্রুটিতে, সেই সমস্ত দোষই তাঁহার মায়াবাদকেও কলুষিত করিয়াছে।

একদিকে শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যে বলিতেছেন :—"অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি—বৈনাশিকদিগের এই মত অসঙ্গত"*। ২—২—২৭ ॥ অপরদিকে পঞ্চদশী বলিতেছেন :—"প্রাগভাবযুতং দ্বৈতং"। ৬—২৫৫ ॥

* অনুপপন্নোয়মভাবাদ্ভাবোৎপত্ত্যভ্যুপগমঃ —২—২—২৭ ॥

"Ex nihilo nihil fit."

"দ্বৈত পূর্ব্বে অভাব মাত্রই ছিল"। ইহাতে পঞ্চদশীর মায়াবাদে যেন আমরা বৌদ্ধ শূন্যবাদেরই আভাস পাইতেছি। একদিকে বৌদ্ধ ক্ষণভঙ্গবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া শঙ্কর বলিতেছেন :—"যাহা নিশ্চিত বলিয়া অনুভূত হয়, যথা "এই বস্তু এইরূপই" তাহা স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। তাহার বিপরীত যাহা কিছু বলা হয়, তাহাতে বক্তার বহুপ্রলাপিত্ব মাত্রই প্রকাশ পায়" ২—২—২৫। কিন্তু অপর দিকে পঞ্চদশী যেন প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্যের অপলাপ করিয়া বলিতেছেন, "ক্ব ধানা কুত্র বা বৃক্ষস্তন্মায়েতি নিশ্চিনু"৬—২৫৫॥ "কোথায় বা বীজ, কোথায় বা বৃক্ষ, এ সকল মায়া বলিয়া জানিবে।" "ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চসাধকঃ"—উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই, বদ্ধ কেহ নাই, সাধক কেহ নাই। ৬—২৩৫। বৌদ্ধ দার্শনিক বলিতেছেন :—"যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা জলধরপটলং" (স-দ-সং)। পঞ্চদশী ও যেন বৌদ্ধদিগের ক্ষণভঙ্গবাদের অনুকরণ করিয়া বলিতেছেন :—"মেঘবৎ বর্ত্ততে মায়া মেঘ-স্থিত-তুষারবৎ" ৬—১৫৬॥ সুধু পঞ্চদশী কেন, শ্রীমদ্ভাগবতে ও আমরা বৌদ্ধ ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদের আভাস পাইতেছি। শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে উপদেশ করিতেছেন :—"আলোকরশ্মি সম্বন্ধে 'এই সেই আলোকরশ্মি', অথবা স্রোতজল সম্বন্ধে 'এই সেই জল', ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞাবাক্য (Recognition of identity) যেমন সাদৃশ্যজনিত ভ্রমমাত্র, অবিবেকীদিগের 'এই সেই মানুষ' ইত্যাদি বাক্য এবং প্রত্যভিজ্ঞাও সেইরূপ মিথ্যা।"* ১১—২২—৪৪॥ চৈতন্যদেবের মতে ব্যাসের স্বকৃত এই ভাগবতই আবার ব্যাস-কৃত বেদান্ত-সূত্রের যথার্থ ভাষ্য। "সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত"। "সূত্রে পরিণাম-বাদ তাহা না মানিয়া। বিবর্ত্তবাদ স্থাপি ব্যাসে ভ্রান্ত কহিয়া" ইত্যাদি। চৈতন্য-

* "সোঽয়ং দীপোঽর্চ্চিষাং যদ্বৎ স্রোতসাং তদিদং জলং। সোঽয়ং পুমানিতি নৃনাং মৃষা গীর্ধীর্মৃষায়ুষাং"। ভাগবত ১১—২২—৪৪।

চরিতামৃত-মধ্য-২৫-৫০,৪৯॥ যাহা হউক শঙ্করকে পরিণামবাদীই বল আর বিবর্ত্তবাদীই বল,তিনি নিজে এইরূপে আপনার মত ব্যক্ত করিতে-ছেন :—"বাহ্যবস্তুর অভাব হইতে পারে না, কারণ তাহার উপলব্ধি হয়। যখনই যে প্রত্যয় জন্মে সেই সঙ্গেই স্তম্ভ, প্রাচীর, ঘট, পট, ইত্যাদি বাহ্যবস্তুরও উপলব্ধি হয়। যাহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়, তাহার অভাবকল্পনা সঙ্গত নয়,—যেমন কোনব্যক্তি আহার করিতে করিতে, এবং সেই আহারজনিত তৃপ্তি স্বয়ং অনুভব করিতে করিতে কখনো বলিতে পারে না, যে আমি আহার করি না, অথবা আহারজনিত তৃপ্তি অনুভব করি না। ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষহেতু যে ব্যক্তি স্বয়ং বাহ্য-বস্তু উপলব্ধি করিতেছে, সেই ব্যক্তি যদি বলে 'আমি বাহ্যবস্তু উপ-লব্ধি করি না', অথবা 'বাহ্যবস্তু নাই', তাহার বাক্য কিরূপে গ্রহণ-যোগ্য হইবে? সূত্র-ভাষ্য—২—২—২৮॥ আবার শঙ্করের মত যে জাগ্রৎ প্রত্যয়ের (Percepts) সহিত স্বপ্নাদি অথবা মায়াদি প্রত্যয়ের তুলনা হইতে পারে না। শঙ্কর বলিতেছেন :—"স্বপ্ন এবং জাগরিতের ধর্ম্ম পরস্পর বিভিন্ন। বিভিন্ন-ধর্ম্মতা কিরূপ? বাধ এবং অবাধ, আমরা বলিতেছি। প্রবুদ্ধ হইলে পর স্বপ্নোপলব্ধ বস্তু বাধিত হয়। মায়াদিজনিত প্রত্যয় ও যথাসম্ভব সেইরূপই বাধিত হয়। কিন্তু স্তম্ভাদি যে সকল বস্তুর জাগ্রৎ কালে উপলব্ধি হয়, সে সকল কোন অবস্থাতেই বাধিত হয় না। (পাঠক এস্থলে লক্ষ্য করিবেন শঙ্কর কি অর্থে মায়াবাদী)। আর স্বপ্নদর্শন স্মৃতিমাত্র,কিন্তু জাগ্রদ্দর্শন উপলব্ধি-স্বরূপ" ইত্যাদি। সূত্রভাষ্য ২—২—২৯॥ বেইন (Bain), স্পেন্সার (Spencer) ও বোধ হয় স্বপ্নকে 'স্মৃতিমাত্র' বলা ভিন্ন অধিক কিছু বলিয়া জাগ্রৎ-প্রত্যয় হইতে স্বপ্ন প্রত্যয়ের বৈধর্ম্ম্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। কিন্তু পঞ্চদশী সংসারকে "অসৎ" বা অভাবাত্মক, এবং "স্বপ্ন-বৎ"ই বলিতেছেন :—"যদসন্তাসমানন্তন্মিথ্যা স্বপ্নগজাদিবৎ"—'যাহা অসৎ অথচ প্রকাশিত হয়, তাহা স্বপ্নদৃষ্ট গজাদির ন্যায় মিথ্যা'।

২—৬৪॥ বস্তুতঃ শঙ্করের উক্তির সহিত পঞ্চদশীর উক্তিসকলের তুলনা করিলে, আমরা পঞ্চদশীর মায়াবাদকে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদেরই বৈদান্তিক সংস্করণ ভিন্ন অন্য কিছু বলিতে পারি না। যে অর্থে পঞ্চদশী মায়াবাদী, সেই অর্থে শঙ্করাচার্য্যকে মায়াবাদী বলিলে, শঙ্করের প্রতি অবিচার করা হইবে। এবং অবিচার যে করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকেই অবগত আছেন যে পঞ্চদশী প্রভৃতির মায়াবাদ শঙ্করের প্রতি আরোপ করিয়া, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি শঙ্করের মায়াবাদকে ও "অসচ্ছাস্ত্র" বা বৈনাশিক দর্শন, এবং শঙ্করাচার্য্যকে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ" বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে শঙ্করাচার্য্যের সহিত তাঁহার সাম্প্রদায়িকদিগের এরূপ মতবিভ্রাটের কারণ কি? অথবা পঞ্চদশী প্রভৃতির মায়াবাদ বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদদ্বারা এরূপ অনুরঞ্জিত হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে এই মাত্র বলা যায়, যে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ সেকালের লোকের এরূপ অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছিল যে শঙ্কর শতচেষ্টা করিয়াও তাহা উন্মূলিত করিতে পারেন নাই। আমরা শঙ্করের ব্যবহারিক বা লৌকিক দ্বৈত এবং পারমার্থিক অদ্বৈত মতের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ২৫ (ঙ)॥ জর্ম্মানদার্শনিকদিগের মধ্যে 'কেণ্ট-ফিকটা', এবং ইংরাজ দার্শনিকদিগের মধ্যে 'হেমিল্টন-মিল' ও এই ব্যবহারিক এবং পারমার্থিকের ভেদবিষয়ে শঙ্করাচার্য্যেরই পদানুসরণ করিয়াছেন। শঙ্কর ব্যবহারিক বা লৌকিক দ্বৈত কখনো অস্বীকার করেন না। তবে শঙ্করের সহিত কেণ্ট্ প্রভৃতির পার্থক্য এই যে পৌরাণিক সময়ে জন্ম গ্রহণ করাতে শঙ্কর পৌরাণিক মহাপ্রলয় মত সমর্থন করেন। মহাপ্রলয়ে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই মাত্র থাকেন। বিশ্ব প্রপঞ্চের লয় হয়। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মের নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ স্বরূপের সহিত ব্রহ্মের সগুণ বা সবিশেষ স্বরূপের বা ঈশ্বরের এক মহাবিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। মহাপ্রলয়ে সগুণ বা

সবিশেষ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অপরাপর প্রাণীগণের ন্যায় থাকেন না, অথবা শক্তিরূপে মাত্র থাকেন। এজন্যেই শঙ্করের মতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য, বিশ্ব-প্রপঞ্চ এবং সেই সঙ্গে সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরও আপেক্ষিক সত্য মাত্র। যাহা হউক ব্যবহারিক জগৎ সম্বন্ধে শঙ্করের মত যে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং বিশ্ব-প্রপঞ্চ সকলি সত্য। তিনি সূত্রভাষ্যে বলিতেছেন :—"আমাদের মতেও ভোক্তৃভোগ্য বিভাগ সঙ্গত"। সূত্রভাষ্য ২—১—১৩॥ "ব্রহ্মের একত্ব এবং নানাত্ব উভয়ই সত্য"। ২—১—১৪॥ "ব্রহ্মাত্ম-বিজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে সমস্ত লৌকিক ব্যবহারের সত্যত্ব যুক্তি-সঙ্গত"। ছান্দোগ্যভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন :—"বীজাঙ্কুরের ন্যায় মানস এবং বাহ্য উভয়ই উভয়ের কার্য্য এবং কারণ হইতে দেখা যায়। অতএব যদিও বাহ্যই মানস, এবং মানসই বাহ্য, তাহাদের নিজের সম্বন্ধে কখনো তাহাদের কোনটিরই মিথ্যাত্ব হইতে পারে না*। ছান্দোগ্য পৃঃ ৫৬১—জীবানন্দ॥ শঙ্করের মত যে পারমার্থিককে সত্যের নিক্তি করিয়া কথা বলিতে গেলে, ব্যবহারিককে মিথ্যা বলা যাইতে পারে, কিন্তু সে মিথ্যা আপেক্ষিক বা তুলনায় মিথ্যা মাত্র†। তাহা বলিয়া ব্যবহারিকের নিজের মধ্যে কখনো কোন মিথ্যাত্ব নাই। তুলনা দ্বারা সত্যত্ব-মিথ্যাত্ব বিচার করিতে গেলে, এবং ব্যবহারিককে সত্যের নিক্তি করিয়া যাহারা কথা বলিয়া থাকেন, তাহারা পারমার্থিককেও সেই অর্থে মিথ্যা, এবং যাহারা পরমার্থ-চিন্তনে রত তাহাদিগকে পাগল বলিয়া থাকেন। এই অর্থে

---

* "মানসানাং বাহ্যানাঞ্চ বিষয়াণামিতরেতর-কার্য্য-কারণত্ব মিষ্যত-এব বীজাঙ্কুরবৎ। যদ্যপি বাহ্যা এব মানসাঃ মানসা এব চ বাহ্যা নানৃতত্বং তেষাং কদাচিদপি স্বাত্মনি ভবতি। পৃঃ—৫৬১॥

† Compare Hamilton's "Relativity of knowledge." Mill's "Unknown cause of known sensations" and "We know that it is, but not what it is," and Kant's Ding-an-Sich, "the mani-fold of sense" and "the unity of reason."

সাংসারিক অজ্ঞানীলোকে অনেক সময়েই পারমার্থিক তত্ত্বকে মিথ্যা প্রলাপমাত্র এবং তত্ত্বজ্ঞানীকে বাতুলপ্রায় মনে করিয়া থাকে। ছান্দোগ্য ভাষ্যে শঙ্করও বলিতেছেনঃ—"মন্দবুদ্ধিদিগের নিকটে দিগেদশাদি-ভেদ-রহিত, পরমার্থ সৎ, অদ্বয় ব্রহ্ম ও অসত্তের ন্যায় প্রতিভাত হয়।" পৃঃ ৫২৯, ছান্দোগ্য-জীবানন্দ। কিন্তু এ অসত্ত্ব আপেক্ষিক, বা ব্যবহারিকের তুলনায় অসত্ত্ব মাত্র। বাক্যের আবরণ পরিত্যাগ করিলে, নিজের সম্বন্ধে নিজে পারমার্থিক যেরূপ সত্য, ব্যবহারিক ও সেই রূপই সত্য। পারমার্থিক পারমার্থিক রূপে সত্য, এবং ব্যবহারিক ব্যবহারিক বা লৌকিক রূপেই সত্য। পারমার্থিকের তুলনায় ব্যবহারিক মিথ্যা, ব্যবহারিকের তুলনায় পারমার্থিক মিথ্যা। বস্তুতঃ শঙ্করের কথার এই সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াই শঙ্করের স্থূলবুদ্ধি সাম্প্রদায়িকগণ অনেক স্থলে পারমার্থিক এবং ব্যবহারিক মিশাইয়া, ইতরেতর-অধ্যাস-দ্বারা এক খিচরি পাকাইয়া, শঙ্করের মায়াবাদে বৌদ্ধ ক্ষণিকবিজ্ঞান-বাদের এবং শূন্যবাদের দোষ সকল সংক্রামিত করিয়াছেন, এবং মায়াবাদকে "অসচ্ছাস্ত্র," এবং শঙ্করকে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ" নামের ভাজন করিয়াছেন।

আবার 'মায়া' শব্দের অর্থ নানা রূপ। দার্শনিক ক্ষেত্রে এই নানার্থক মায়াশব্দের ব্যবহার ও নিরাপদ নয়। ঋগ্বেদেই আমরা মায়াশব্দের নানা অর্থে ব্যবহার দেখিতে পাই। অধুনা 'শিল্প কৌশল' অর্থে 'মায়া' শব্দের ব্যবহার কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু এই অর্থে ঋগ্বেদে 'মায়া' শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। "ত্বষ্টা মায়া বেৎ" (১০-৫৩-৯)। সায়ণ ইহার অর্থ করিতেছেন "অয়ং ত্বষ্টা দৈবশিল্পী মায়াঃ কর্ম্মাণি পাত্রনির্ম্মাণবিষয়ানি বেৎ বেত্তি"। 'দেবশিল্পী' এই ত্বষ্টা মায়া অর্থাৎ দেবগণের সোমপানপাত্রাদি-নির্ম্মাণ-কৌশল অবগত আছেন। শিল্প-কৌশল অর্থে জগৎ-শিল্পীর

জগৎ-রচনা-কৌশলের প্রতি 'মায়া' শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত স্বাভাবিক ('মা' ধাতু নির্ম্মান অর্থে)। আর এক অর্থ 'অচিন্ত্য শক্তি' যথা, হে যজনীয় আদিত্যগণ পরদ্রোহীর জন্য তোমার যে বিচিত্র মায়া, এবং রিপুর জন্য যে বিচিত্র পাশ বিস্তৃত হইয়াছে ইত্যাদি, "যা বো মায়া অভিদ্রুহে যজত্রাঃ পাশা আদিত্যা রিপবে বিচিত্রাঃ" ইত্যাদি ২-২৭-১৬। সায়ন বলিতেছেন :— "অভিদ্রোহকারী রাক্ষসদিগের জন্য নির্ম্মিত তোমাদিগের যে বিচিত্র মায়া" ইত্যাদি। শঙ্করও "অঘটন-ঘটন-পাটবং" অর্থে মায়া শব্দের ব্যবহার করিতেছেন। যাদুকরের যাদুশক্তির ন্যায় অচিন্ত্য আর কি আছে? এজন্য মায়া শব্দের দ্বিতীয় অর্থ যাদুকরের যাদুশক্তি হওয়াও স্বাভাবিক। আর যাদুকরের যাদু মিথ্যা কল্পনা অথবা ভ্রমমাত্র। ইহা হইতে মায়া শব্দের ও তৃতীয় অর্থ হইয়াছে, মিথ্যা কল্পনা বা ভ্রম মাত্র। এই অর্থে ও মায়া শব্দের ব্যবহার ঋগ্বেদেই দৃষ্ট হয়। "হে (ইন্দ্র) তোমার যে সকল যুদ্ধের কথা বর্ণিত হয়, তাহা মায়া-মাত্র। তোমার কোন শত্রু অদ্য ও নাই পূর্ব্বেও থাকা সম্ভব নয়। "মায়েৎ সা তে যানি যুদ্ধান্যাহুর্নাদ্য শত্রুং ন নু পুরা বিবিৎসে।" ১০-৫৪-২॥ মায়া শব্দে এস্থলে মিথ্যা কল্পনা বুঝায়। তবে 'ইন্দ্রজাল" অর্থ ও গ্রহণ করা যাইতে পারে। "মায়েৎ সা" ইত্যাদির সায়ন অর্থ করিতেছেন "হে ইন্দ্র, স্তোত্র দ্বারা বর্দ্ধমান হইয়া যে তুমি প্রাণীগণের মধ্যে তোমার বৃত্রবধাদিরূপ সামর্থ্য ঘোষণা করিয়া বিচরণ করিয়াছ, তোমার এ সকল গতি মায়ামাত্র, অর্থাৎ মিথ্যাই। "তব সা গতির্মায়েৎ মায়ৈব, মৃষেত্যর্থঃ"। আর পুরাবিদ্-গণ তোমার যে সকল যুদ্ধাদির কথা বলিয়া থাকেন তাহাও মায়াই অর্থাৎ মিথ্যাই।"

শঙ্করাচার্য্য ও মায়া শব্দ এই সকল অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তদীয় সাম্প্রদায়িকদিগের ভ্রমে পড়িবার ইহাও

অন্যতম কারণ। আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রদর্শন করিতেছি। (১) ভ্রম-দর্শন, বা যে স্থানে যে বস্তু নাই, সেই স্থানে সেই বস্তু দর্শন (Illusion or hallucination), যেমন রজ্জুতে সর্পদর্শন। অথবা স্বপ্নাদিতুল্য অলীক প্রত্যয়কে শঙ্কর মায়া নামে অভিহিত করিতেছেন। "স্বপ্ন. মায়া, মরীচিকার জল, এবং গন্ধর্ব্বনগরাদিপ্রত্যয় বাহ্যবস্তু বিনাই গ্রাহ্য-গ্রাহকাকারযুক্ত হয়"। সূত্রভাষ্য ২ ২-২৮॥ "বাধ্যতে হি স্বপ্নোপলব্ধং বস্তু প্রবুদ্ধস্য, এবং মায়াদিষ্বপি ভবতি" ২-২-২৯॥ "প্রবুদ্ধ হইলে পর স্বপ্নোপলব্ধ বস্তু যেরূপ বাধিত হয়, মায়াদিতে ও সেইরূপ হয়"। "অব্যক্তশব্দবাচ্যা বীজ-শক্তিঃ পরমেশ্বরাশ্রিতা মায়াময়ী মহাসুষুপ্তিরূপা"। ১-৪-৩॥ আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে শঙ্করাচার্য্য প্রত্যয় সকলকে (Percepts) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেছেনঃ—(ক) বস্তু-রহিত বা মিথ্যা প্রত্যয় বা মায়ামাত্র, যথা স্বপ্নাদি। (খ) সত্য, পারমার্থিক, বা বস্তুর অনুরূপ প্রত্যয়, যথা ব্যবহারিক জগৎ, এবং (গ) আত্যন্তিক পারমার্থিক, বা আত্যন্তিক সত্য প্রত্যয়, যথা, ব্রহ্মাত্ম-দর্শন। "সন্ধ্যে সৃষ্টি রাহ হি" (৩-২-১)—এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেনঃ—"স্বপ্নস্থানকে সন্ধ্য বা জাগ্রৎ এবং সুষুপ্তির সন্ধিস্থান বলা যায়। সন্ধ্য বা স্বপ্ন-বিষয়ক সৃষ্টি পারমার্থিকী নয়, মায়াময়ী। স্বপ্ন মায়ামাত্র, তাহাতে পরমার্থ গন্ধ ও নাই। "মায়ামাত্রন্তু" (৩-২-৩)। স্বপ্নগত সৃষ্টি আকাশাদি-সৃষ্টির ন্যায় সত্য নয়। আবার আকাশাদির ও আত্যন্তিকী সত্যতা নাই, কারণ মহাপ্রলয়ে আকাশাদিও লয়প্রাপ্ত হয়। সমস্ত প্রপঞ্চই মায়ামাত্র, কিন্তু স্বপ্নগত সৃষ্টি প্রতিদিনই বাধিত হয়, আর আকাশাদি-প্রপঞ্চের স্বরূপ ব্রহ্মাত্মদর্শনের পূর্ব্বপর্য্যন্ত ব্যবস্থিত থাকে"। ৩-২-৪॥

'মায়া' শব্দকে (২) 'অচিন্ত্য বিস্ময়কর রচনা শক্তি' অর্থে পঞ্চদশী যে রূপ ব্যবহার করিয়াছেন, শঙ্কর ও সেইরূপ করিয়াছেন। "অচিন্ত্য-রচনা-শক্তি-বীজং মায়েতি নিশ্চিনু," "বিস্ময়ৈকশরীরা," "ন জানামি কি মপোতদিত্যন্তে শরণং তব" (পঞ্চদশী ৬—১৫১, ১৩৯, ১৪৬)। এস্থলে আত্যন্তিক পরমার্থ-ভূত শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপ, সর্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্মা হইতে, অশুদ্ধ, অচেতন, পরতন্ত্র, এবং অশক্তি-স্বভাব এই ব্যবহারিক জগৎ-প্রপঞ্চ-প্রকাশের শক্তিই "অঘটন-ঘটন-পাটবং" বা মায়া নামে অভিহিত হইতেছে (Objectivization of the subject)। পরমাত্মার এই আত্ম-বহুত্ব-সাধক একত্বকেই (Self-differentiating unity) শঙ্করাচার্য্য মায়াশক্তি নামে অভিহিত করিতেছেন। শঙ্কর বলিতেছেনঃ— "নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হইতেই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়। সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের মায়াশক্তিই প্রকৃতি বা জগতের উপাদান।" ২-১-১৪। তিনি অন্যত্র বলিতেছেনঃ— "সৃষ্টির প্রাগবস্থাতে জগৎ যখন ব্যাকৃত-নাম-রূপ-রহিত বীজ-শক্তির অবস্থায় ছিল, তখনই তাহা অব্যক্ত নামের যোগ্য ছিল। জগৎ যখন প্রলয়প্রাপ্ত হয়, তখন ও শক্তি অবশিষ্ট থাকে, এবং সেই শক্তিরূপ মূল হইতে পুনরায় উৎপন্ন হয়"। ১-৩-৩০। স্রষ্টার এই সর্বাশ্চর্য্যময়ী সৃষ্টিশক্তিকেই শঙ্কর মায়া নামে অভিহিত করিতেছেন। শঙ্কর বলিতেছেনঃ—"মায়াই অব্যক্ত, কারণ মায়া ব্রহ্মই, অথবা ব্রহ্ম হইতে ভিন্নই,—তাহা নিরূপণ করা অসাধ্য"। ১-৪-৩॥ এস্থলে একথা বলা আবশ্যক যে ন্যায় যাহাকে সমবায় সম্বন্ধ নামে অভিহিত করে, যথা দ্রব্যের সহিত গুণের সম্বন্ধ, অথবা কর্তার সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধ, তাহা সর্ব্বত্রই এইরূপ। দ্রব্য হইতে গুণ ভিন্নও বলা যায় না, অভিন্নও বলা যায় না, মায়াকেও সেইরূপই ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বলা যায় না, অভিন্নও বলা যায় না (Different

but not seperable)। "অব্যক্তই মায়া শব্দে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাই সংসার প্রপঞ্চের বীজভূত সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের মায়াশক্তি।" ১-৪-৩।

মায়া শব্দের (২) তৃতীয় অর্থ "ঐন্দ্রজালিক শক্তি" (Hypnotic spell)। যাদুকরের অন্যতর নাম মায়াবী। পঞ্চদশী বলিতেছেন:— "যাহা নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা যায় না, অথচ স্পষ্টই প্রতিভাত হয়, ইহারই নাম মায়া। ইন্দ্রজালাদি সম্বন্ধে লোকের এইরূপই ধারণা।" ৬-১৪১॥ শঙ্করাচার্য্য ও পরমেশ্বরের জগৎরচনাশক্তিকে ঐন্দ্রজালিকের মায়ারচনা-শক্তির সহিত তুলনা করিয়া মায়া নাম প্রদান করিয়াছেন। মায়া "বিস্ময়ৈকশরীরা।" ।ঐন্দ্রজালিকের কল্পিত শক্তির তুল্য বিস্ময়কর কি আছে? বিস্ময়করত্ব সম্বন্ধে বিশ্বসৃষ্টির উপমা হইতে পারে, ঐন্দ্রজালিকের কল্পিত শক্তির মত আর কি আছে? তবে আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে দুর্বোধ্যত্ব এবং বিস্ময়করত্ব সম্বন্ধেই মাত্র ইন্দ্রজালের সহিত বিশ্ব-রচনার সাদৃশ্য। মাণ্ডূক্যের গৌড়পাদীয় কারিকা-ভাষ্যে শঙ্কর "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপঈয়তে" এই শ্রুতিবাক্যের "মায়া" বা পরমেশ্বরের বিশ্ব-রচনা-শক্তিকে ঐন্দ্রজালিকের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন:—"মায়াবী যখন আকাশে সূত্র নিক্ষেপ করিয়া, যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, সেই সূত্র দ্বারা আকাশে আরোহণ করিয়া অদৃশ্য হয়, এবং যুদ্ধে ছিন্নাঙ্গ হইয়া তাহার শরীর খণ্ডশঃ ভূপতিত হইলে পর, পুনরায় সে অক্ষতশরীরে সমুত্থিত হয়, তখন সেই মায়াবীর কৃত মায়াদির তত্ত্বচিন্তায় দর্শকদিগের বিশেষ আগ্রহ থাকে না (কারণ তাহা মায়ামাত্র)। জীবের সুষুপ্ত-স্বপ্নাদি অবস্থার প্রকাশ ও সেই মায়াবীর সূত্র-প্রসারণের তুল্য। স্বপ্নাবস্থাপন্ন বাহ্য-বিষয়হীন ভোক্তারূপী জীব বা তৈজস, এবং সুষুপ্তাবস্থাপন্ন প্রজ্ঞা-স্বরূপ (undifferentiated con-

[illegible]) জীব বা 'প্রাজ্ঞ' উভয়ই সেই সূত্রারূঢ় মায়াবীর তুল্য। যথার্থ মায়াবী বা যাদুকর যেমন সেই সূত্র এবং সূত্রারূঢ় যাদুকর হইতে ভিন্ন, এবং সে যেমন নিজে দর্শকদিগের মধ্যেই ভূমিতে থাকিয়া মায়াবলে প্রচ্ছন্ন এবং দর্শকদিগের নিকটে অদৃশ্য থাকে, তুরীয় পদবাচ্য পরমার্থতত্ত্ব ও সেই রূপ" (তৈজস এবং প্রাজ্ঞ হইতে ভিন্ন এবং সকলের নিকটে অদৃশ্য থাকে।) মাণ্ডুক্য কারিকা ভাষ্য-১-৭। শঙ্কর তাহার সূত্র ভাষ্যে ও এই ঐন্দ্রজালিকের উপমা ব্যবহার করিয়াছেন "মায়াবী যেমন আপনার প্রসারিত মায়া দ্বারা কখনও স্বয়ং সংস্পৃষ্ট হয় না, কারণ সে জানে যে তাহা বাস্তবিক নয়, পরমাত্মা ও সেইরূপ সংসারমায়াদ্বারা সংস্পৃষ্ট হয়েন না।" ২-১-৯॥ "মায়াবী যেমন অনায়াসেই ইচ্ছামত আপনার প্রসারিত মায়ার উপসংহার করে, পরমাত্মা ও সেইরূপ" ২-১-২১॥ "মায়াবী যেমন তাহার মায়ার স্থিতির কারণ, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর ও সেই রূপ তাহা হইতে উৎপন্ন এই জগতের নিয়ন্তৃত্ব হেতু, তাহার স্থিতির কারণ—"মায়াবীব মায়ায়াঃ।" ২-১-১।

এইরূপে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে দার্শনিক ক্ষেত্রে এই নানার্থক "মায়া" শব্দের অসতর্ক ব্যবহারই দেশময় বিজ্ঞানবাদ এবং শূন্যবাদ প্রচারের জন্য প্রধানতঃ দায়ী। দার্শনিক শব্দের সংজ্ঞা-নির্দ্ধারণের অভাবে অনেক সময়েই বিষম বিভ্রাটের সূত্রপাত হইতে দেখা যায়। শঙ্করের 'মায়া' শব্দের ব্যবহার ও তাহারই একটি নিদর্শন। 'রচনা কৌশল' 'অচিন্ত্য শক্তি,' 'ঐন্দ্রজালিক শক্তি', 'ভ্রম দর্শন,' এবং 'মোহ' বা অন্ধ আসক্তি—শঙ্করের 'মায়া' শব্দের ব্যবহারে এই সমস্ত অর্থই মিশ্রিত* এবং একীভূত হইয়া তাহার মায়াবাদকে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ এবং শূন্যবাদের সহিত মিশ্রিত এবং

---

* পাঠক ইহার সহিত চৈতন্য-চরিতামৃতে 'মায়া' শব্দের ব্যবহারের তুলনা করুন্। "চরণে ধরি হরিদাস কহে না করিহ মায়া।" "মায়া-সীতা

একীভূত করিয়া 'অনচ্ছাস্ত্র' বা 'বৈনাশিক'বাদ বলিয়া দেশে প্রচার করিয়াছে, এবং শঙ্করাচার্য্য ও 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' নামে তিরস্কার-ভাজন হইয়াছেন। মাধবাচার্য্যের শঙ্কর-দিগ্বিজয়ের বর্ণনাতে দেখা যায় যে শঙ্করের সমসাময়িকদিগের মধ্যে ও যেন কেহ কেহ তাঁহার মায়াবাদকে বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদেরই বৈদান্তিক সংস্করণ বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের কাশ্মীর-ভ্রমণ কালে যখন তিনি তত্রত্য শারদাপীঠনামক বিদ্যামণ্ডপে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন তাহাকে বাধা দিয়া, তাহার প্রতিপক্ষ তাহার প্রতি প্রশ্ন করিয়াছিলঃ—"বল, বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের সহিত তোমার মতের কি পার্থক্য"—'বিজ্ঞানবাদস্য চ কিং বিভেদকং ভবন্মতাদ্‌ব্রূহি"। শঙ্কর-দিগ্বিজয় —১৬-৭৪॥*

এইরূপে আমরা দেখিতেছি 'মায়া'শব্দের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণের অভাবই মায়াবাদ-বিষয়ক অর্থ-বিপ্রতিপত্তির প্রকৃত কারণ। দার্শনিক ক্ষেত্রে শঙ্কর মায়াশব্দ মুখ্য অর্থে অর্থাৎ 'পরমেশ্বরের বিচিত্র জগৎ-রচনা-

নিল রাবণ তাহাতে (কূর্ম্ম পুরাণে) লিখন। শুনিএগ প্রভুর হৈল আনন্দিত মন।" বস্তুতঃ 'মায়া' শব্দের অর্থ যে কত বিস্তৃত ইহাতেই দেখা যায় যে একদিকে মায়ার অর্থ শঠতা বা ছলনা। ইহাকে শাম্বরী বা আসুরী মায়া বলা যায়। অপরদিকে মায়ার অর্থ দুর্গা বা অঘটন-ঘটন পটিয়সী ঈশ্বর-শক্তি। এমন কি বাক্যালঙ্কাররূপে ঋগ্বেদে ও 'ছলনা বা কপট' অর্থে 'মায়া' শব্দ দৃষ্ট হয়ঃ—"মায়াভিরিন্দ্র মায়িনং ত্বং শুষ্ণমবাতিরঃ (১-১১-৭)। সায়ণ ব্যাখ্যা করিতেছেনঃ—"হে ইন্দ্র ত্বং মায়িনং নানাবিধ-কপটোপেতং শুষ্ণং ভুতানাং শোষণহেতুমেতন্নামকম অসুরং মায়াভিস্তৎপ্রতিকুলৈঃ কপট-বিশেষৈঃ। যদ্বা, তদ্বধোপায়-গোচর-প্রজ্ঞাভিঃ। অবাতিরঃ। হিংসিতবানসি। ইন্দ্র সম্বন্ধে 'মায়ার' অর্থ কপট-বিশেষ না বলিয়া, সায়ণ ও যেন প্রজ্ঞা-বিশেষ বলিতে ইচ্ছুক।

* "বিজ্ঞানবাদী ক্ষণিকত্বমেষামঙ্গীচকারাপি বহুত্বমেষঃ। বেদান্তবাদী স্থির-মদ্বিতীয়ঞ্চৈকত্বমঙ্গীচকারেতি মহান্‌বিশেষঃ" ॥ ১৬-৭৪॥

কৌশল অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন, শূন্যাত্মক ঐন্দ্রজালিক রচনা বা ভ্রমদর্শনাদি গৌণ অর্থে ব্যবহার করিতেছেন না। বরাহ-পুরাণেও মায়ার দৃষ্টান্তরূপে নানা প্রকার বিস্ময়কর নৈসর্গিক ব্যাপারেরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা, প্রাণীগণের জন্মরহস্য,* চন্দ্রের ক্ষয় বৃদ্ধি এবং অদর্শন, সূর্য্যের পশ্চিমদিকে অস্তগমন এবং পূর্ব্বদিকে উদয়, কূপজলের শীতকালে উষ্ণত্ব এবং গ্রীষ্মকালে শীতলত্ব, লবণ-সমুদ্র হইতে মেঘের লবণ-রহিত সুমিষ্ট জল গ্রহণ এবং বর্ষণ, ইত্যাদি। "মেঘা গৃহ্নন্তি সলিলং লবণাৎ সলিলার্ণবাৎ। বর্ষন্তি মধুরং লোকে সর্ব্বং মায়াবলং মম"। যাহারা মায়াশব্দের গৌণ অর্থ বা শূন্যাত্মক ঐন্দ্রজালিক রচনা বা ভ্রমদর্শনকেই মুখ্য অর্থ বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন, তাহারাই শঙ্করের মায়াবাদকে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের অথবা শূন্যবাদের রূপান্তর বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি তাহাতে পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন যে সেরূপ অর্থে শঙ্কর মায়াবাদী নহেন। শঙ্করাচার্য্য ঈশ্বর-প্রাণ মহাপুরুষ। তিনি নিজে তাঁহার দার্শনিক মতকে মায়াবাদ নাম প্রদান করেন নাই। এমন কি মাধবাচার্য্য ও শঙ্করের মতকে "বিবর্ত্তবাদ" নামেই অভিহিত করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক মতকে মায়াবাদ বলিতে হইলে, মায়াশব্দের অর্থ "অঘটন-ঘটন-পটিয়সী ঐশী শক্তি" বা পরাশক্তি করিতে হয়— "পরাস্যশক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ"—শ্বেতাশ্বতর ৬—৮॥ এই জ্ঞানবলক্রিয়াশক্তিকেই শঙ্কর মায়ানামে অভিহিত করিতেছেন:— "সর্ব্ব-বিষয়-জ্ঞান-প্রবৃত্তিঃ"—যে শক্তি বলে ঈশ্বর সকল বিষয় অবগত আছেন, এবং যে শক্তিবলে ঈশ্বর একমাত্র আপনার সান্নিধ্যদ্বারা সকলকে বশীভূত করিয়া, স্বস্ব বিষয়ে নিয়মিত করিতেছেন—"স্বসন্নিধি-মাত্রেণ সর্ব্বং—বশীকৃত্য নিয়মনং"। শঙ্কর ভাষ্য॥

* Reproduction by female and male gametes.

৩২। পুনর্জন্মবাদ।*

(ক) ঋগ্বেদে জীবের অমরত্ব।

পাঠক হয়ত শুনিলে বিস্মিত হইবেন যে ঋগ্বেদে পুনর্জন্মবাদের কোন উল্লেখ নাই, অমর জীবাত্মার স্বর্গবাসের, অথবা অধঃ এবং উর্দ্ধ গমনের মাত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ("জীবো মৃতস্য চরতি স্বধাভি রমর্ত্ত্যো মর্ত্ত্যেনা সযোনিঃ," অথবা "অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গৃভীতো")—'মর্ত্ত্যের অর্থাৎ মরদেহের সহিত একমূল হইতে উৎপন্ন মৃত ব্যক্তির অমর জীবাত্মা (দেবভোগ্য) স্বধাভক্ষণ করতঃ বিচরণ করে। ১-১৬৪-৩০,৩৮। বৈদিক ঋষি বলিতেছেনঃ—জীবাত্মা "অমর্ত্ত্য" বা অমর—'অমরণ-স্বভাবঃ' (সায়ণ)। 'মর্ত্ত্যের' সহিত 'সযোনিঃ' অর্থাৎ মর দেহের সঙ্গে একমূল হইতে উৎপন্ন "সমানোৎপত্তি-স্থানঃ" (সায়ণ)। জন্মের পূর্ব্বেই ছিল, এমন কোন জীবাত্মা এই পৃথিবীতে দেহান্তর গ্রহণ করে, ঋগ্বেদ এরূপ বলে না। "চরতি স্বধাভিঃ"—মৃত্যুর পরে জীব অমর দেবগণের সহিত স্বর্গে স্বধা ভক্ষণ করতঃ বিচরণ করে, অথবা "অপাঙ্ প্রাঙেতি"---অধঃ এবং উর্দ্ধে গমন করে। 'জীব এই সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে' ঋগ্বেদ এরূপ বলেনা। সায়ণ "স্বধাভিঃ" অর্থ করিতেছেনঃ—"পুত্রকৃতৈঃ স্বধাকার-পূর্ব্বক-দত্তৈরন্নৈঃ"। অন্য স্থলে তিনি অর্থ করিতেছেন, "স্বধয়া অমৃতান্নেন।" বৈদিক ঋষিদিগের পরলোকবিষয়ক মতের কথঞ্চিৎ আভাস আমরা ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৪ সূক্তে প্রাপ্ত হই। তাহার কয়েকটী ঋকের মাত্র অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

* "The soul if pure departs to the invisible world, but if tainted by communion with the body, she lingers hovering near the earth, and is afterwards born into the likeness of some lower form. That which true philosophy has refined, alone rises ultimately to the Gods."

Plato's Phaedo.

"আমাদের গম্যপথ যমই প্রথমে দেখাইয়াছেন। সেই পথের বিনাশ নাই। সেই পথে আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ অগ্রে গমন করিয়াছেন। স্ব স্ব কর্ম্ম অনুসারে সকলকেই সেই পথে যাইতে হইবে" ॥ ২ ॥ *

পরে আবার মৃত ব্যক্তির আত্মাকে সম্বোধন করিয়া বৈদিক ঋষি বলিতেছেন:—"যাও, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যে পথে যে স্থানে গিয়াছেন, তুমিও সেই পথে সেই স্থানে যাও। তথায় উভয় রাজগণ—যম এবং বরুণদেব,—যাহারা স্বধা ভক্ষণে তৃপ্ত হয়েন,—তাহাদিগকে দর্শন কর† ॥ ৭ ॥ এই সূক্তের প্রথম ঋকে বলা হইয়াছে "যমং রাজানং" এবং সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "রাজানং পিতৄণাং স্বামিনং যমং"। "স্বধয়া অমৃতান্নেন মদন্তৌ তৃপ্যন্তৌ রাজানৌ।" সায়ণ।

"স্বর্গে পিতৃলোকদিগের সহিত মিলিত হও, যমের সহিত মিলিত হও, এবং তোমার কৃত ইষ্টাপূর্ত্তাদি সৎকর্ম্মের ফলের সহিত মিলিত হও। পাপ পরিত্যাগ করিয়া 'অস্ত' নামক গৃহে প্রবেশ কর। তথায় উজ্জ্বল-কান্তিযুক্ত স্বীয় শরীরের সহিত মিলিত হও"। ৮॥ "পরমে ব্যোমন্" সায়ণ অর্থ করিতেছেন "পরমে উৎকৃষ্টে ব্যোমনি স্বর্গাখ্যে স্থানে।" বৈষ্ণব গ্রন্থে 'পরব্যোম' শব্দের পুনঃপুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

"সাধু পথ আশ্রয় করিয়া চতুরক্ষযুক্ত বিচিত্রবর্ণ কুকুরদ্বয়কে সত্বর অতিক্রম কর। তৎপর যে সকল জ্ঞানী পিতৃগণ সর্ব্বদা যমের

---

* "যমো নো গাতুং প্রথমো বিবেদ নৈষা গব্যূতিরপভর্ত্তবা উ।
যত্রা নঃ পূর্ব্বে পিতরঃ পরেয়ুরেনা জজ্ঞানাঃ পথ্যা অনুস্বাঃ ॥"১০-১৪-২

† "প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্যেভির্যত্রা নঃ পিতরঃ পরেয়ুঃ।
উভা রাজানা স্বধয়া মদন্তা যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবং" ॥ ৭ ॥

সহিত আমোদ-আহ্লাদে রত থাকেন, তাহাদের সহিত মিলিত হও” ॥ ১০ ॥ যমের এই কুকুরদ্বয়সম্বন্ধে সায়ণ বলিতেছেন যে এই কুকুরদ্বয় প্রেতদিগের বাধক*। তাহারা সরমা নামক কোন প্রসিদ্ধ দেবকুকুরীর পুত্রদ্বয়। তাহাদের চক্ষুর উপরিভাগে আরো দুইটি চক্ষু আছে।

“হে যম, রক্ষক স্থানীয় তোমার যে চারিচক্ষুযুক্ত কুকুরদ্বয় পথ রক্ষা করিতেছে এবং সকল লোককে দেখিতেছে, হে রাজন্, এব্যক্তিকে তাহাদের হাত হইতে রক্ষা কর। তাহার কল্যাণ কর, তাহাকে রোগমুক্ত কর।”

সং গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেনেষ্টাপূর্ত্তেন পরমে ব্যোমন্।
হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি সং গচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চ্চাঃ ॥ ৮ ॥
অতি দ্রব সারমেয়ৌ শ্বানৌ চতুরক্ষৌ শবলৌ সাধুনা পথা।
অথাপিতৄন্ সুবিদত্রা উপেহি যমেন যে সধমাদং মদন্তি ॥ ১০ ॥
যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথিরক্ষী নৃচক্ষসৌ।
তাভ্যা মেনং পরিদেহি রাজন্ স্বস্তি চাস্মা অনমীবং চ ধেহি ॥
১১—সূ১৪—ম১০ ॥

(খ) পঞ্চাগ্নিবিদ্যা।

বৈদিক ব্রাহ্মণভাগে, বিশেষতঃ উপনিষদেই আমরা পুনর্জন্মবাদের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই। তবে ঋভু নামক মনুষ্যগণ সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছেঃ—‘ঋভু নামক মনুষ্যগণ তপোবলে দেবগণমধ্যে সোমপানের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন’ “ঋভবো বৈ দেবেষু তপসা সোমপীথ মভ্যজয়ন্।” ১৩-৬-২ ॥ উপনিষদসকলের মধ্যে ছান্দোগ্য, এবং বৃহদারণ্যক, এই উপনিষদ্দ্বয়েই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা নামে পুনর্জন্মবাদের বিস্তারিত বর্ণনা দৃষ্ট হয়†। ছান্দোগ্য এবং বৃহদার-

---

* Compare ‘Cerberus’ of Creek mythology.

† ছান্দোগ্য ৫—৩ হইতে ১০, এবং বৃহদারণ্যক ৬—২।

ণ্যক এই উভয় উপনিষদের বর্ণনাতে ইহাই দেখা যায়, যে পুনর্জ্জন্ম-বাদ আদি বৈদিক ঋষিদিগের নিকটে অপরিচিত ছিল। ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক, এই উভয় উপনিষদের বর্ণনার মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে এক উপনিষদ্ অন্য উপনিষদ্ হইতে এই বর্ণনা গ্রহণ করে নাই, এবং ক্ষত্রিয় রাজা প্রবাহণের নিকটে বৈদিক ঋষি আরুণির পঞ্চাগ্নি-বিদ্যাবিষয়ক শিক্ষা লাভ উপকথামাত্র নয়। ঘটনা সত্য যে প্রবাহণ নামে এক ক্ষত্রিয় রাজার নিকটেই বৈদিক ব্রাহ্মণগণ এই পুনর্জ্জন্ম মত সম্বন্ধে প্রথম শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইতেছেঃ—'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ গৌতম-আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু একদা পাঞ্চালদেশের ক্ষত্রিয় রাজা প্রবাহণের রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন রাজা সেই ব্রাহ্মণ কুমারকে পুনর্জ্জন্ম বিষয়ে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। কুমার সে সকল প্রশ্নের একটির ও উত্তর দিতে না পারিয়া, সভামধ্যে আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন। প্রশ্ন পাঁচটি এইঃ—(১) তুমি কি জান, এখান হইতে প্রজা সকল কোথায় গমন করে? (২) তুমি কি জান, কিরূপে তাহারা পুনরাগমন করে? (৩) তুমি কি জান, দেব-যান এবং পিতৃযান পথদ্বয় কোথায় যাইয়া পৃথক্ হয়? (৪) তুমি কি জান এতলোক পিতৃলোকে গমন করে, তবু তাহা কেন পরিপূর্ণ হয়না? (৫) তুমি কি জান, যে পঞ্চম আহুতিতে আহবনীয় দ্রব পদার্থ (আপঃ) পুরুষ নামের যোগ্য হয়?—"বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষ-বচসো ভবন্তীতি"? শ্বেতকেতু উত্তর করিলেন, "নৈব ভগব ইতি"—"না, মহাশয়।" রাজার ব্যবহারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া শ্বেতকেতু স্বীয় পিতা আরুণির নিকটে যাইয়া বলিলেনঃ—"সেই রাজন্যাধম আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন করিয়াছিল, আমি তাহার একটির ও উত্তর দানে সক্ষম হই নাই।" তখন গৌতম-আরুণি সে সকল পুনর্জ্জন্ম-

বিষয়ক প্রশ্ন সম্বন্ধে আপনাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞানী জানিয়া, স্বয়ং সেই রাজার নিকটে যাইয়া, শিষ্যের ন্যায় সে সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থী হইলেন। ছান্দোগ্যে উক্ত হইয়াছে যে, রাজা বলিলেনঃ—"হে গৌতম, তুমি বেদবিৎ ব্রাহ্মণ হইয়াও যে আমার নিকট উপদেশ প্রার্থী হইয়াছ, তাহার কারণ এই যে তোমার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহই এই (পুনর্জন্ম-বিষয়ক) পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা লাভ করেন নাই। ক্ষত্রিয়েরাই লোককে এ বিষয়ে উপদেশ দান করিয়াছেন।" বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে, "রাজা বলিলেন—হে গৌতম, তুমি অথবা তোমার পিতৃ-পিতামহ কেহ আমার কোন অপরাধ গণ্য করিবে না,—কারণ ইহার পূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণই এই বিদ্যা লাভ করে নাই। আমি সেই বিদ্যা তোমাকে প্রদান করিব। তুমি যেরূপ ভাবে কথা বলিতেছ, কে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে?" প্রবাহণ এইরূপ বলিয়া গৌতমের নিকটে পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা প্রকাশ করিলেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এই পুনর্জন্মবিষয়ক পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানিতেন না, বলা, আর এই পুনর্জন্ম মতকে অবৈদিক বলা এককথা। ক্ষত্রিয়েরাই বা এই মত কোথায় পাইলেন? বৈদিক ব্রাহ্মণ-সময়ের তুলনায় গ্রীস্‌দেশীয় অর্‌ফিউজ (Orpheus) না হউক, এম্‌পিডক্লিস্ (Empedocles), অথবা পিথাগোরস্ (Pythagorus), অনেক আধুনিক। ভারতবর্ষকে এই পুনর্জন্মবাদ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা অপেক্ষা, ভারতবর্ষ হইতে পুনর্জন্মবাদ গ্রহণ করাই বরং তাহাদের পক্ষে অধিকতর সম্ভব। রাজা প্রবাহণ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণ সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতেছেনঃ—"এই সম্বন্ধে আমরা ঋষিবাক্য শুনিয়াছি, যথা, দুইটিমার্গের কথা শুনিয়াছি, তাহার একটি দ্বারা মানব পিতৃলোকে এবং অপরটিদ্বারা দেবলোকে গমন করে"—'অপি নি ঋষের্বচঃ শ্রুতং দ্বে সৃতী অশৃনবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্ত্যানাং'। বৃহদারণ্যক ৬-২-২। ইহাতে পুনর্জন্ম মতের কোন কথাই নাই।

ক্ষত্রিয়গণ আদিম অনার্য্যদিগের নিকট হইতে এই পুনর্জ্জন্মমত শিক্ষা করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার ও আমরা কোন কারণ দেখিতেছি না। আরম্ভে আমরা প্লেটোর (Plato) যে উক্তির উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সহিত প্রবাহণের কথার যোগ করিলে মনে হয় যে গ্রীসীয় এবং ভারতীয় আর্য্যদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কোন কোন শাখার মধ্যে এই পুনর্জ্জন্ম মত প্রচলিত ছিল। ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যকের কথায় মনে হয় যে এই আদিম আর্য্যমত বৈদিক ব্রাহ্মণ শাখার ঋষিদিগের অজ্ঞাত ছিল। এজন্যই বোধ হয় ঋগ্বেদে পুনর্জ্জন্মবাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সেই আদিম আর্য্যদিগের ক্ষত্রিয়শাখার মধ্যে গুপ্তভাবে যে এই পুনর্জ্জন্মমত প্রচলিত ছিল, তাহাতে সংশয় করা যায় না। সে যাহা হউক, উভয় উপনিষদ্ একবাক্যে বলিতেছে যে, রাজা প্রবাহণ গৌতম-আরুণিকে এই পুনর্জ্জন্ম-বিষয়ক পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। উভয় উপনিষদের মতেই দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ এবং স্ত্রী, এই পাঁচটি সেই পঞ্চাগ্নি। উভয় উপনিষদের মতেই এই পাঁচ প্রকার অগ্নির পাঁচ প্রকার আহুতি, এবং পাঁচপ্রকার আহুতি-প্রদান ফল। (১) দ্যুলোকাগ্নির আহুতি শ্রদ্ধা। শঙ্কর 'শ্রদ্ধা' শব্দের অর্থ করিতেছেন,—শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত সূক্ষ্ম অপ্ বা জলীয় আকারে পরিণত অগ্নিহোত্রসম্বন্ধী আহুতি। এই আহুতি প্রদানের ফল সোমলতার উৎপত্তি। (২) পর্জ্জন্যাগ্নির আহুতি সেই সোম, এবং আহুতি-ফল বৃষ্টি। (৩) পৃথিবী অগ্নির আহুতি সেই বৃষ্টি, এবং আহুতি-ফল জীবের অন্ন। (৪) পুরুষ অগ্নির আহুতি সেই অন্ন, এবং আহুতি-ফল জীব-বীজ। (৫) স্ত্রী অগ্নির আহুতি সেই জীব-বীজ এবং আহুতি-প্রদান-ফল সন্তান। এইরূপে রাজা প্রবাহণ দেখাইলেন যে পঞ্চম আহুতিতে "আপঃ" অর্থাৎ আহবনীয় সূক্ষ্ম জলীয় পদার্থ পুরুষনামের যোগ্য হয়। এই

পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে,—আকাশ, মেঘ, পৃথিবী, এবং নরনারী সকলকে,—এক মহাযজ্ঞরূপে কল্পনা করিয়া, বিশ্বের সমস্ত ব্যাপারকে তাহারই আহুতি এবং আহুতিফলরূপে কল্পনা করা হইতেছে। পৌরাণিক কালে জন্মগ্রহণ করিয়া শঙ্কর যে সংসারকে মলভাণ্ডবৎ হেয় বলিয়া প্রদর্শন করিতেছেন,—"ব্রহ্মাণ্ডমপি পিণ্ডাণ্ডং ত্যজ্যতাং মলভাণ্ডবৎ"—অথবা যে শরীরকে তিনি (মাতাপিত্রোর্মলোদ্ভূতং) অস্পৃশ্যের ন্যায় দেখাইতেছেন, উপনিষদের ঋষি সেই সংসারকে এবং সেই শরীরকে এক অতিপবিত্র যজ্ঞাগ্নি এবং তাহার আহুতি-ফল রূপে কল্পনা করিতেছেন। ঋগ্বেদেও ঋষি বলিতেছেন ঃ—"অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ" (১—১৬৪-৩৪)। জগদ্ব্যাপার সম্বন্ধে ঋষির এই যজ্ঞ-কল্পনা সকলেরই অতি হৃদয়গ্রাহী হইবে, সন্দেহ নাই। বৃহদারণ্যকে বর্ণিত হইতেছেঃ—"দেবগণ সেই জীববীজকে স্ত্রী অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। সেই আহুতি হইতে পুরুষের জন্ম। পুরুষ জন্ম লাভ করিয়া যত দিন হয়, জীবন ধারণ করে। তাহার মৃত্যুর পর অগ্নিতে অর্পণ জন্য তাহাকে লইয়া যায়। দেবগণ পুরুষকে সেই অগ্নিতে অন্ত্য-আহুতিরূপে প্রদান করেন। সেই অন্ত্য-আহুতি দ্বারা পুরুষ উজ্জ্বলকান্তিযুক্ত হয়"। ছান্দোগ্যে বলা হইতেছে "স্ত্রী অগ্নিতে অর্পিত আহুতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, পুরুষ স্বীয় আয়ুকালান্তে পরলোকে গমন করে। অগ্নিগণ তাহাকে তাহার কর্ম্মনির্দ্দিষ্ট পথে যে রূপে সে আসিয়াছিল, সেইরূপে লইয়া যায়"। অনন্তর রাজা প্রবাহণ গৌতমের নিকটে দেবযান, পিতৃযান, এবং তৃতীয় পথ,—এই পথত্রয়ের উপদেশ করিয়া বলেন ঃ—"যাহারা পঞ্চাগ্নিবিৎ, এবং যাহারা শ্রদ্ধালু বানপ্রস্থ তপস্বী, তাহারা অর্চ্চি অর্থাৎ জ্যোতিরভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। অর্চ্চি হইতে দিবাভিমানী দেবতা, দিবা হইতে আপূর্য্যমান (শুক্ল) পক্ষের অভিমানী দেবতাকে, আপূর্য্যমান পক্ষ হইতে উত্তরায়ণ (পৌষ হইতে জ্যৈষ্ঠ) ছয়মাসের অভিমানী, তাহা

হইতে সম্বৎসরাভিমানী দেবতা, সম্বৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বিদ্যুতের অভিমানী-দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। তথায় এক অমানব পুরুষ তাহাদিগকে ব্রহ্মেতে লইয়া যায়। এই পথের নাম দেবযান পথ। যাহারা গ্রামে থাকিয়া ইষ্টাপূর্ত্তাদি সৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা ধূমাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। ধূম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে অপরপক্ষাভিমানী (কৃষ্ণপক্ষ), তাহা হইতে দক্ষিণায়ণ ছয় মাসের অভিমানী দেবতাকে (আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ) প্রাপ্ত হয়। তাহারা সম্বৎসরাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হয় না। দক্ষিণায়নের ছয় মাস হইতে তাহারা পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ, এবং আকাশ হইতে চন্দ্রকে প্রাপ্ত হয়। চন্দ্রলোকে গিয়া তাহারা দেবগণের (ভৃত্যাদিরূপে) ভোগ্য হয় (যদিও বৃহদারণ্যকে বলা হইতেছে :—"তাহারা চন্দ্রলোকে যাইয়া দেবগণের অন্নে পরিণতহয়,—তথায় দেবগণ তাহাদিগকে ভক্ষণ করেন)। "পুনরাবৃত্তিকাল পর্য্যন্ত তাহারা চন্দ্রলোকে বাস করিয়া সংসারে পুনরাবর্ত্তন করে। যে পথে আসিয়াছিল পুনরায় সেই পথেই আকাশে গমন করে। আকাশ হইতে বায়ুতে, বায়ু হইতে ধূমে, ধূম হইতে অভ্রে, অভ্র হইতে মেঘে, এবং মেঘ হইতে বৃষ্টিতে গমন করে। বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া তাহারা ধান্য, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল, এবং মাষাদি হইয়া জন্মগ্রহণ করে।* অনন্তর যাহারা অন্নরূপে সেই ধান্যাদি ভক্ষণ করিয়া (স্বীয় দেহে) তাহাকে জীববীজরূপে পরিণত করে, তাহাদেরই আকার গ্রহণ করিয়া তাহারা পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়। যাহারা সাধু চরিত্র, তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অথবা বৈশ্য প্রভৃতি উন্নত যোনি প্রাপ্ত হয়। আর যাহারা অসাধু

* ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন :—"অবরোহণ কালে জীব যদিও ধান্যাদিভাব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের শরীর সুখদুঃখযুক্ত হয় না; এজন্য বলা হয় অনুশয়ীদিগের অর্থাৎ যাহারা চন্দ্রমণ্ডল হইতে 'কর্ম্মলেশ মাত্র লইয়া ভূতলে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহাদিগের 'ধান্যাদিরূপে জন্ম' বলিতে ধান্যাদির সহিত সংশ্লেষ মাত্র বুঝায়"। ব্রহ্মসূত্র ৩—১—২৭ ॥

চরিত্র তাহারা কুকুর, শূকর, অথবা চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ যোনি প্রাপ্ত হয়। যাহারা জ্ঞানী তপস্বীও নয়, ইষ্টাপূর্ত্তাদি সৎকর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করে না, তাহারা দেবযান এবং পিতৃযান এই উভয় পথ হইতে ভ্রষ্ট হয়। তাহারা দংশমশককীটাদি ক্ষুদ্র প্রাণীরূপে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ইহাই তৃতীয় স্থান"। ছান্দোগ্য।

ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক উভয় উপনিষদ এক বাক্যে বলিতেছে যে এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগেরও অবিদিত ছিল। উভয়ে এক বাক্যে স্বীকার করিতেছে যে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে গৌতম আরুনিই পুর্নজন্মবিষয়ক এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা সর্ব্বপ্রথমে লাভ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় এই উভয় উপনিষদোক্ত পঞ্চাগ্নিবিদ্যাকে ভারতীয় পুনর্জন্মবাদের মূল বলিয়া অনুমান করাই সঙ্গত। উপনিষদের অন্যান্য স্থলে অতি স্থূলভাবে "অমৃতত্ব" বা নিত্য স্বর্গবাসের, অথবা পাপ-পুণ্যের দণ্ডপুরস্কাররূপে—"পুণ্যঃপুণ্যেন কর্ম্মণা পাপঃ পাপেন"—স্বর্গ-নরক বাসের, অথবা ভূতলে পুনর্জন্মলাভের, অথবা অনন্ত উন্নতির মতের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। এমন কি ইচ্ছা করিলে, অনন্ত নরক মতেরও আভাস গ্রহণ করা যাইতে পারে—"নোচেদবেদীদ্ মহতী বিনষ্টিঃ।" বৃহদারণ্যকে উক্ত হইতেছে—"পুরুষ কামময় (অর্থাৎ কামনা দ্বারাই পুরুষের পুরুষত্ব বা ব্যক্তিত্ব)। যাহার বাসনা যেরূপ, তাহার ক্রতু বা অধ্যবসায়ও সেইরূপ। যাহার অধ্যবসায় যেরূপ, তাহার কর্ম্মও সেইরূপ। যাহার কর্ম্ম যেরূপ, সে হয়ও সেইরূপ। যে বিষয়ে আসক্ত হইয়া যে কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্মের সহিত সে তাহাতেই গমন করে। মনই লোকের লিঙ্গ (মন দ্বারা লোকের পরিচয়), যে কর্ম্মে লোকের মন আসক্ত, অথবা ইহলোকে যাহা কিছু কর্ম্ম লোকে করে, শেষ পর্য্যন্ত সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া, কর্ম্মকরণার্থ (অর্থাৎ মানুষরূপেই, দংশ-মশকরূপে নয়), পুনরায় জীব এই কর্ম্মক্ষেত্ররূপ ভূতলোকে আগমন

করে। যাহারা বাসনার বশীভূত তাহাদের গতি এইরূপ”। এস্থলে শ্বযোনি বা শূকরযোনি অথবা দংশ-মশক-কীটত্ব প্রাপ্তির কোন কথা নাই। আর যাহারা বাসনার দাস নয়, এবং যাহাদের চিত্ত সংযত অথবা বিশুদ্ধ, তাহাদেরও ইহলোকে প্রত্যাগমনের কোন কথা নাই। উপনিষদের এই মতের সহিত পাঠক পূর্ব্বোক্ত প্লেটোর (Plato) কথার তুলনা করুন।

(গ)। কঠোপনিষদে পুনর্জন্মবাদ।

ভাষা দৃষ্টে কঠ প্রভৃতি উপনিষদ্ ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক অপেক্ষা অনেক আধুনিক বলিয়া অনুমিত হয়। কঠোপনিষদে যম যেরূপ সংক্ষেপে এবং সাধারণ ভাবে নচিকেতাকে পরলোক সম্বন্ধে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে কঠোপনিষদের সময়েও এদেশে পুনর্জন্মবাদ ভালরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নচিকেতা যমের নিকটে এই বলিয়া বর প্রার্থনা করেনঃ— “হে যম, কেহ বলে মৃত্যুর পর মানুষ থাকে, কেহ বলে থাকে না, তোমার উপদেশে আমি এবিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করিব।” যম যেন অতি অনিচ্ছার সহিত, অতি সংক্ষেপে, এবং অতি স্থূলভাবে দুটি একটি মাত্র অতি অস্পষ্ট কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। “দুর্গম পর্ব্বতাদিতে বর্ষিত বারিধারা যেমন নানাদিকে গমন করে, অজ্ঞানীদিগের পরলোকগতি ও সেইরূপ।” “বিশুদ্ধ জল যেমন বিশুদ্ধ জলে বর্ষিত হইলে মিশিয়া একাকার হয়, জ্ঞানবান্ মুনির আত্মা ও সেইরূপ হয়।” “কোন কোন মানুষ দেহলাভের জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, আর কেহ বা (বৃক্ষ-প্রস্তরাদি) স্থাণু মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়।” “মানুষের হৃদয় হইতে ১০১টী নাড়ী নিঃসৃত হইয়াছে। তাহার একটী মস্তকের মধ্যে প্রবিষ্ট;—যাহারা সেই একটী দ্বারা ঊর্দ্ধে আরোহণ করে, তাহারা অমৃতত্ব লাভ করে। আর যাহারা অন্য

সকল নাড়ীদ্বারা উৎক্রমন করে, তাহারা নানাবিধ গতি প্রাপ্ত হয়। "স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে," "মোদতে স্বর্গলোকে।" "কৃষ্ণ কেমন ? যার মনে যেমন।" কঠশ্রুতির কথাগুলি এত সাধারণ যে পাঠক ইচ্ছামত অনন্ত স্বর্গবাসের, অথবা দণ্ডপুরস্কারার্থ স্বর্গ-নরক-ভোগের, অথবা পুনর্জন্মের, অথবা অনন্ত উন্নতির মতের অনুকূলে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। যমের নিজের মনই যেন এবিষয়ে সংশয়-রহিত ছিল না। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে কঠোপনিষদের সময়েও পুনর্জন্মবাদ দেশে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই।

(ঘ) শঙ্করের মতে অথবা পৌরাণিক মতে পুনর্জ্জন্মবাদ।

সে যাহা হউক উপনিষদের পর হইতে, বিশেষতঃ বৌদ্ধ সময় হইতে, আমাদের দেশে এই পুনর্জ্জন্মবাদ অবিচ্ছেদে একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। পৈত্রিক ত্যজ্য সম্পত্তির ন্যায় উত্তরাধিকার-সূত্রে, এবং বিনা বিচারেই আমরা পুনর্জ্জন্মবাদে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি। বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত পৌরাণিক ধর্ম্মের শত বিরোধ সত্ত্বেও এ বিষয়ে তাহাদের সকলেরই একমত। সুদূর অতীত কাল হইতে পুনর্জন্মে লোকের বিশ্বাস এত বদ্ধমূল যে ইহার যৌক্তিকত্ব বিষয়ে চার্ব্বাক্ ভিন্ন কাহারও মনে কখনও কোন প্রশ্নেরই উদয় হয় নাই। বৌদ্ধ এবং তৎপরে পৌরাণিক সময়েই পুনর্জন্মবাদের বিশেষ বিকাশ দৃষ্ট হয়। জীবের চৌরাশিলক্ষ যোনি ভ্রমনের কল্পনা বৌদ্ধ অথবা পৌরাণিক।

"এইত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে সবে করয়ে ভ্রমণ।"
তার মধ্যে স্থাবর-জঙ্গম দুইভেদ।
জঙ্গমে তীর্য্যক্-জল স্থল-চর ভেদ।

তারমধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ-পুলিন্দ-বৌদ্ধ-শবর"।

চৈতন্য-চরিতামৃত-১৩—৬৪।

পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য নিজেও সেই পৌরাণিক মতেরই পৃষ্ঠ-পোষক। ছান্দোগ্য ভাষ্যের মুখবন্ধে শঙ্কর বলিতেছেন—"বিজ্ঞান-যুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল অর্চ্চিরাদি পথে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি,এবং কেবল বা জ্ঞানরহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল ধূমাদি পথে চন্দ্রলোক-প্রাপ্তি। আর যাহারা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া উন্মার্গগামী হয়, তাহারা উভয় মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয়, এবং অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া কষ্ট ভোগ করে।" শঙ্করের মতে "দেবযান এবং পিতৃযান এই মার্গ দ্বয়ের মধ্যে কোন মার্গেই আত্যন্তিকী পুরুষার্থ-সিদ্ধি হয় না।" তাঁহার মতে "অদ্বৈতাত্মবিজ্ঞান ভিন্ন কিছুতেই আত্যন্তিকী নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ-প্রাপ্তি হয় না।" পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাগ্নিবিদ্যার ভাষ্যে জ্ঞান-রহিত কর্ম্মীদিগের সম্বন্ধে শঙ্কর বলিতেছেন :—"চন্দ্র মণ্ডলে যাহাদের কর্ম্মের ক্ষয় হইয়াছে, তাহারা মেঘ হইতে বৃষ্টিরূপে গিরিতট, দুর্গ, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, এবং মরু প্রভৃতি সহস্র স্থানে বারিধারার সহিত পতিত হয়। অতএব তথা হইতে তাহাদের নিষ্ক্রমন সুকঠিন। গিরিতট হইতে তাহারা জলস্রোতের সঙ্গে নদীতে, এবং নদী হইতে সমুদ্রে গমন করে। তথায় মকরাদি তাহাদিগকে ভক্ষণ করে, এবং সেই মকরাদি অন্য কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। এই রূপে মকরের সহিত তাহারা সমুদ্রে বিলীন হয়। পুনর্ব্বার মেঘ দ্বারা সমুদ্র জলের সহিত আকৃষ্ট হইয়া বৃষ্টিরূপে মরু-দেশে অথবা অগম্য শিলাতটে পতিত হইয়া, তথায় অবস্থান করে। কখনওবা তাহারা জলের সঙ্গে ব্যালমৃগাদিদ্বারা পীত হইয়া, পুনরায় সেই ব্যালমৃগাদির সঙ্গে অন্য দ্বারা ভক্ষিত হয়। এইরূপে তাহারা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে। তাহারা কখনওবা অভক্ষ্য স্থাবরাদিতে জন্ম লাভ করিয়া তাহাতেই শুষ্ক হয়। কিম্বা ভক্ষ্য স্থাবরাদিতে

জন্ম লাভ করিলেও, মনুষ্য পশ্বাদি-দেহের সহিত সম্বন্ধ লাভ তাহাদের পক্ষে দুষ্কর। কারণ স্থাবর অনেক প্রকার। এই সকল কারণেই অনুশয়ী অর্থাৎ যাহারা কর্ম্মক্ষয়ে ভাবিদেহারম্ভার্থ কর্ম্মের যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্টাংশ লইয়া চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহাদের নিষ্ক্রমন সুকঠিন। অপর দিকে যাহারা অনুশয়ী নয়,—অর্থাৎ ভাবিদেহারম্ভার্থ কর্ম্মের কিঞ্চিৎ অবশিষ্টাংশ লইয়া যাঁহারা চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাগত নহেন, অথবা যাহারা ঘোর পাপ কর্ম্মহেতু চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ করিবার পূর্ব্বেই ব্রীহিযবাদিভাব প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় তাহা হইতে সহজেই মনুষ্যাদিভাব লাভ করে, তাহাদের নিষ্ক্রমণ সেই অনুশয়ীদিগের নিষ্ক্রমনের স্থায় কঠিন হয় না। কেন? কারণ তাহারা কর্ম্মদ্বারাই সাক্ষাৎ ভাবে মানুষের ভক্ষ্য ব্রীহি-যবাদি-দেহ গ্রহণ করে। কর্ম্মের ক্ষয় হইলে পর যখন উপভোগের নিমিত্ত-ভূত তাহাদের সেই ব্রীহি-যবাদি স্থাবর দেহ বিনষ্ট হয়, তখন তাহারা জলৌকার ন্যায় সচেতনভাবে পূর্ব্বার্জ্জিত অন্য কর্ম্মানুসারে নব নব দেহান্তর লাভ করে, যে হেতু এক জন্মে সকল কর্ম্মের ভোগ হয় না'—"নৈকস্মিন্ জন্মনি সর্ব্বেষাং কর্ম্মণামুপভোগঃ।" যদিও দেহান্তরগমনকালে ইন্দ্রিয় সকল উপসংহৃত হয়, তথাপি স্বপ্নকালের ন্যায় দেহান্তর-প্রাপ্তির হেতুভূত কর্ম্মদ্বারা উদ্ভাবিত বাসনার জ্ঞান দ্বারা তাহারা 'সবিজ্ঞান' থাকিয়া দেহান্তর গ্রহণ করে। শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। অর্চ্চিরাদি এবং ধূমাদিপথে গমনও সেইরূপ 'সবিজ্ঞান'। শঙ্কর জ্ঞান রহিত কর্ম্মমার্গের ঘোর বিরোধী। এজন্যই কি তিনি অনুশয়ীদিগের অর্থাৎ যে সকল জ্ঞান-রহিত কর্ম্মী কর্ম্মের কিঞ্চিৎ অব-শিষ্টাংশ লইয়া চন্দ্রমণ্ডল হইতে ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহা-দিগের দেহান্তর গ্রহণ 'সবিজ্ঞান' বলিয়া স্বীকার করেন না? অথবা তাহাদিগের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া যাহাতে সেই প্রত্যাবর্ত্তনের যন্ত্রণা তাহাদের অনুভূত না হয়, সেজন্য তাহাদের সেই প্রত্যা-

বর্ত্তন অবিজ্ঞান বা চৈতন্য-রহিত কল্পনা করিতেছেন? শঙ্কর-বলিতেছেন :—"ব্রীহি প্রভৃতি ভাবে জন্ম লাভদ্বারা অনুশয়ীদিগের জীববীজরূপে ব্রীহিদেহের সহিত সম্বন্ধলাভ অর্চ্চিরাদি অথবা ধূমাদি পথে আরোহণের ন্যায় 'সবিজ্ঞান' বলা সঙ্গত নয়। কেন? যেহেতু ব্রীহি প্রভৃতির ছেদন, মর্দ্দন, এবং পেষণ কালে 'সবিজ্ঞান' স্থিতি সম্ভব নয়, কারণ তাহা হইলে ঘোর নরক যন্ত্রণার অনুভব হইত। এবং শাস্ত্রবিহিত ইষ্টাপূর্ত্তাদির অনুষ্ঠান মহা অনর্থেরই কারণ হইত। ফল গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তির বৃক্ষারোহণ কালের সবিজ্ঞানত্বের ন্যায় অর্চ্চিরাদি-মার্গগামী, এবং ধূমাদিমার্গে চন্দ্রমণ্ডলারোহীদিগের সবিজ্ঞানত্ব। কিন্তু বৃক্ষাগ্র হইতে পতিত ব্যক্তির যেমন সচেতনত্ব সম্ভব নয়, চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহনকারীদিগেরও সেইরূপ সচেতনত্ব সম্ভব নয়। মুদ্গর দ্বারা অভিহত ব্যক্তি সেই অভিঘাতজনিত বেদনায় মূর্চ্ছিত এবং অবশেন্দ্রিয় হইলে, যখন তাহাকে স্থানান্তরিত করা হয়, তখন তাহাকে চৈতন্যশূন্য দেখা যায়। যাহারা দেহান্তর গ্রহনার্থ চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহণ করে, স্বর্গভোগের নিমিত্তভূত তাহাদের কর্ম্মের ক্ষয় হেতু, তাহাদের চন্দ্রলৌকিক জলীয় দেহের ক্ষয়বশাৎ ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া প্রতিবদ্ধ হইলে পর, তাহারা দেহবীজভূত সেই জলীয় ভাগ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ না করিয়া, মূর্চ্ছিতের ন্যায় আকাশাদি ক্রমে অবরোহন করে, এবং স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে স্থাবর জাতীয় দেহে সংশ্লিষ্ট হয়। ইন্দ্রিয় সকল প্রতিবদ্ধ থাকাতে তাহাদের চৈতন্যোদয় হয় না।" (জীবানন্দ—ছান্দোগ্য-ভাষ্য—পৃঃ৩৫১-৩৫৬)। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, শঙ্কর যেন কর্ম্মিদিগের পুনর্জ্জন্ম-প্রণালীকে ঘোর নরকযন্ত্রণা ভোগই মনে করিতেছেন। তবে রক্ষা যে অবরোহন কালে অনুশয়ীদিগের চৈতন্য থাকে না। শঙ্করের মতে যাহারা অনুশয়ী নয়, এবং যাহারা ঘোর পাপকর্ম্মকারী, তাহারা 'সবিজ্ঞান' বা সচেতনভাবেই কর্ম্মানু-

সারে নব নব দেহান্তর আশ্রয় করে,—"জলুকাবৎ উৎক্রমন্তে সবিজ্ঞানা এব।" ঘোর পাপীরা সবিজ্ঞান, অতএব ধান্যাদির রূপ গ্রহণ করিয়া ধান্যাদির কর্ত্তন, মর্দ্দন, এবং পেষণ জন্য ঘোর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থকে। আর অনুশয়ীরা অবিজ্ঞান, অতএব ধান্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ও কর্ত্তনাদিজন্য যন্ত্রনা ভোগ করে না। তবে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে ধান্যাদির মধ্যে এই সবিজ্ঞানত্ব-অবিজ্ঞানত্বের ভেদকল্পনার ভিত্তি কোথায় ?

(ঙ) শারীরক-সূত্রে পুনর্জন্ম মত।

শারীরক সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ১ হইতে ২৭ সূত্রের ভাষ্যে পুনর্জন্মবাদ বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চাগ্নিবিদ্যাই সেই বর্ণনার মূল। তাহার প্রথম সূত্র :—"তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং"। শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে এই সূত্রের অর্থ করিয়াছেন :—"এক দেহ হইতে দেহান্তর লাভ কালে (দেহান্তর-প্রতিপত্তৌ), জীব দেহবীজস্বরূপ সূক্ষ্মভূতদ্বারা সম্বেষ্টিত হইয়া (সম্পরিষক্তঃ) গমন করে (রংহতি)। প্রবাহণ এবং আরুণির প্রশ্নোত্তরদ্বারা তাহা জানা যায় (প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাং)" ব্রহ্মসূত্র ৩—১—১॥ প্রবাদ এই সূত্রেরই অর্থ লইয়া ব্যাসের সহিত শঙ্করের বিবাদ হইয়াছিল। এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন :—"জীব তাহার মুখ্য প্রাণ (Vitality), মন, বিদ্যা, কর্ম্ম, এবং পূর্ব্বপ্রজ্ঞা বা জন্মান্তর-সংস্কার লইয়া, এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর প্রাপ্ত হয়" *। "অন্য শ্রুতি বলিতেছে—জলৌকার ন্যায় অন্য দেহ আশ্রয় না করিয়া, পূর্ব্ব দেহ পরিত্যাগ করে না।" তাহাও এই

* "জীবো মুখ্যপ্রাণসচিবঃ সেন্দ্রিয়ঃ সমনস্কো বিদ্যাকর্ম্মপূর্ব্বপ্রজ্ঞাপরিগ্রহঃ পূর্ব্বদেহং বিহায় দেহান্তরং প্রতিপদ্যতে।" ৩—১—১॥

সূত্রের বিরুদ্ধ নয়, কারণ ইহাতে জীবের কর্ম্মানুসারে প্রাপ্তব্য ভাবি দেবাদি-দেহ-বিষয়ক ভাবনা-জনিত দীর্ঘীভাবকেই মাত্র জলৌকার সহিত তুলনা করা হইয়াছে।” অন্য সূত্রে শঙ্কর বিচার করিতে-ছেন:—“যজ্ঞাদি কর্ত্তা ধূমাদিপথে চন্দ্রমণ্ডলে আরোহন করিয়া, ভোগশেষে তাহা হইতে পুনরায় অবরোহণ করে। এখন প্রশ্ন হইতেছে কি সমস্ত কর্ম্ম ভোগ করিয়া নিরনুশয় অবস্থায় (অর্থাৎ কর্ম্মের লেশ মাত্রও যখন অবশিষ্ট না থাকে, তখন অবরোহণ করে, অথবা কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে অবরোহণ করে।” এই প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর বলিতেছেন—“সানুশয় অবস্থায় অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অব-শিষ্ট থাকিতেই অবরোহণ করে। কারণ দেখা যায় জন্ম হইতেই প্রাণীগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট নানারূপ উপভোগ বিভক্ত হয়। তাহার আকস্মিকত্ব অসম্ভব হওয়াতে অনুশয়ের সদ্ভাব সূচিত হয়। অনুশয় কি? কেহ বলেন স্বর্গার্থ কর্ম্মের ভুক্ত ফলের অবশেষের নাম অনুশয়, ভাণ্ডানুসারী ঘৃতের ন্যায়। যখন কোন ঘৃতভাণ্ড ঘৃতশূন্য করা যায়, তখন তাহা সম্পূর্ণ ঘৃতশূন্য হয় না। ভাণ্ডের সঙ্গে ঘৃতের কিঞ্চিৎ অংশ থাকিয়া যায়; অনুশয়ও সেইরূপ”। ৩—১—৮॥ আবার বলিতেছেন:—“শীলযুক্ত কর্ম্মই অনুশয়, এবং তাহাই যোনিলাভের কারণ। সদাচারহীন হইলে কেহই যজ্ঞাদি কর্ম্মে অধিকারী হয় না। আচার-হীনকে বেদও শুদ্ধ করে না।” ৩—১—১০॥

(চ) স্মৃতির বিচ্ছেদে ব্যক্তিগত একত্বের বিচ্ছেদ।

পাঠক দেখিতেছেন কতপ্রকার কষ্টকল্পনার উপরে পৌরাণিক পুনর্জন্মবাদের অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ—‘অনুশয়’ কল্পনা। মৃন্ময় ঘৃতপাত্রের ছিদ্রমধ্যে যেমন ঘৃত প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, ঢালিলেও সম্পূর্ণ পাত্র-চ্যুত হয় না, সেইরূপে চন্দ্রলোকে কর্ম্মভোগ শেষ

হইলেও অশরীরী জীবের শরীরে কিছু কিছু কর্ম্ম লাগিয়া থাকে। এবং তদনুসারে ইহলোকে পুনর্জন্ম লাভ হয়। এই অনুশয় কল্পনা পরিত্যাগ করিলে জীবের পুনর্জন্মগত উৎকর্ষাপকর্ষভেদ আকস্মিক হইয়া পড়ে। জন্মের উৎকর্ষাপকর্ষ আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যদি তাহা আকস্মিক অথবা অহেতুক হয়, তবে পুনর্জন্মবাদ মতকেই জলাঞ্জলি দিতে হয়। অতএব পুনর্জন্মবাদীর পক্ষে অনুশয়-কল্পনা অপরিহার্য্য। দ্বিতীয়তঃ—মূর্চ্ছা কল্পনা। মূর্চ্ছিত অবস্থায় জীব স্বর্গচ্যুত হয়, এবং মূর্চ্ছিত অবস্থায় স্থাবরাদি গতি প্রাপ্ত হয়। কারণ তাহা না হইলে, ব্রীহিপ্রভৃতির ছেদন, মর্দ্দন, এবং পেষণজনিত ঘোর নরক অনুভব হইত; শাস্ত্রবিহিত ইষ্টাপূর্ত্তাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান মহান্ অনর্থেরই কারণ হইত। কিন্তু অপরদিকে দেখা যায় সেই মূর্চ্ছা বা অচেতন অবস্থা সম্বন্ধে কাহারও কোন স্মৃতি থাকে না, অতএব তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণের স্থান নাই। আবার অচেতন অবস্থায় ব্রীহি প্রভৃতি রূপে কর্ম্মভোগ, কথাই বিরুদ্ধ। তৃতীয়তঃ—সংশ্লেষ কল্পনা। কর্ম্মফল ভোগার্থ অনুশয়ী জীব যখন মূর্চ্ছিতের ন্যায় স্থাবর জাতীয় দেহ গ্রহণ করে, তখন যে তাহারা সত্য সত্যই সেই সেই দেহ গ্রহণ করে, তাহানয়, "সংশ্লিষ্ট মাত্র হয়"। এবং তখন "ইন্দ্রিয়াদি প্রতিবন্ধ থাকাতে তাহাদের চৈতন্যোদয় হয় না"। এরূপ অবস্থায় ভোগ শব্দই প্রযুক্ত হইতে পারে না। চতুর্থতঃ—ধান্যাদি ওষধিরূপে অনুশয়ীদিগের অবিজ্ঞানত্ব এবং পাপকারীদিগের সবিজ্ঞানত্বের কল্পনা। কল্পনার উপরে কল্পনা, তাহার উপরে আবার কল্পনা! এরূপ অবস্থায় ভারতীয় পুনর্জন্মবাদকে একপ্রকার তাসের ঘর ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে?

বস্তুতঃ স্মৃতির যোগেই জীবের ব্যক্তিত্ব। পূর্ব্বস্মৃতি যেখানে নাই, সেখানে একত্বের অনুমান ভিত্তিশূন্য কল্পনামাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে শুকদেব যেন বৌদ্ধ ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদেরই মত অনুসরণ করিয়া বলিতেছেন:—"আলোকরশ্মি সম্বন্ধে, এই আলোকরশ্মিই

পূর্ব্বের সেই আলোক রশ্মি, অথবা স্রোতজলসম্বন্ধে, এই জলই সেই পূর্ব্বের জল, ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition of identity) যেমন সাদৃশ্য-জনিত ভ্রম মাত্র, অবিবেকীদিগের 'এই সেই পূর্ব্বদৃষ্ট মানুষ, ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞাবাক্য ও সেইরূপ মিথ্যা। "সোয়ং দীপোর্চ্চিষাং যদ্বৎ, স্রোতসাং তদিদং জলং। সোয়ং পুমানিতি নৃণাং মৃষাগীর্ধীর্ম্মৃষায়ুষাং"। ১১—২২—৪৪॥ শুকদেব লোকের ব্যক্তিগত একত্বই অস্বীকার করিতেছেন। কর্ত্তা এবং ভোক্তা যদি স্থায়ী এবং এক না হয়, তবে কে করে কর্ম্ম, কে করে তাহার ফলভোগ, কেইবা ফল ভোগার্থ ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করে। স্মৃতির দ্বারা যদি জন্মজন্মান্তরের সমস্ত জ্ঞানকর্ম্ম একত্বসূত্রে গ্রথিত না রহিল, সকলই একই ব্যক্তির, যদি এরূপ জানা না গেল, তবে পুনর্জ্জন্ম কল্পনার সার্থকতা কোথায় রহিল? পূর্ব্বস্মৃতি যদি তিরোহিত হয়, এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত একত্ব ভিত্তিশূন্য হয়, তাহা হইলে শঙ্করের মত শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর পক্ষে পুনর্জ্জন্ম কল্পনার সার্থকতা থাকে না। শঙ্কর বলিতেছেন—ঃ "সেন্দ্রিয় সমনস্ক ভাবে জীব পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করে"। কিন্তু জন্মজন্মান্তরে জীবের সেন্দ্রিয়ত্ব সমনস্কত্ব নিয়ত অব্যাহত থাকে, শঙ্করও এরূপ বলিতেছেন না। অতএব তাহার মতে ও পুনর্জ্জন্ম কল্পনার সার্থকতা থাকিতেছে না। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া আমাদের কথা আরও একটু বিশদ করিতে চেষ্টা করিব। মনে কর পূর্ব্বজন্মে কোন রাজা অতি দুষ্ক্রিয়াশীল ছিল। সেই অপরাধে সে ইহজন্মে একজন অন্ধ ভিখারী, অথবা একটি ক্ষুদ্র মশক, অথবা একটি ধানের গাছ, অথবা একখণ্ড প্রস্তর হইয়া পূর্ব্বোক্ত দুর্বৃত্ত রাজার দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছে। এস্থলে একমাত্র অন্ধ ভিখারীই ভোক্তা নামের যোগ্য। তর্কস্থলে না হয় মশককেও ভোক্তা নামের যোগ্য মনে করা গেল। কিন্তু ধানের গাছ, অথবা প্রস্তরখণ্ড কোন মতেই ভোক্তা নামের যোগ্য হইতে

পারে না। ইহাদের পক্ষে রাজার কৃত দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ অসম্ভব। রাজার দিক্ দিয়া দেখিলে, যেহেতু সেই রাজা জানিত না যে দুস্কর্ম্ম করিলে সে ধানগাছ অথবা মশক হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, অতএব তাহার সম্বন্ধে সেরূপ পুনর্জন্ম-কল্পনা সম্পূর্ণ নিরর্থক। অন্ধ ভিখারী অথবা মশক ভোক্তা নামের যোগ্য হইলেও তাহারা জানেনা যে পূর্ব্বজন্মে তাহারাই কোন এক দুস্কর্ম্মশীল রাজা ছিল, অথবা তাহাদের কোন পূর্ব্বজন্ম ছিল। সেই কর্ম্মকর্ত্তা রাজার সহিত যখন তাহার ফলভোক্তা ভিখারীর একত্ব স্মৃতি নাই, তখন উভয়কে এক ব্যক্তি কল্পনা করা নিতান্তই ভিত্তিশূন্য। "উদার বোঝা বুদার ঘাড়ে" কে করিল কর্ম্ম? কে করে তাহার ফলভোগ। শঙ্করাচার্য্যের মূর্চ্ছার কল্পনা একপ্রকার পুনর্জন্মবাদ পরিত্যাগেরই তুল্য। যে জীব "সমনস্ক সেন্দ্রিয়" ভাবে এই দেহ পরিত্যাগ করিল, সেইজীব ইহলোকে দেহান্তর লাভ করিবার পূর্ব্বেই মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হওয়াতে, অমনস্ক নিরিন্দ্রিয় ভাবেই দেহান্তর আরম্ভ করিবে। ইহাদ্বারা স্পষ্টই তাহার ব্যক্তিগত একত্বের বিচ্ছেদ হইতেছে। যখন জীব মন-রহিত স্মৃতি-রহিত হইল, তখন কি দেখিয়া বলা যাইবে যে এজীব সেই পূর্ব্বের জীবই। এইরূপে বিচার করিলে দেখা যায় পুনর্জন্মবাদের কোন প্রতিষ্ঠাযোগ্য ভিত্তি নাই।

(ছ) জাতিস্মর কল্পনা।

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে বৈদিক কালে পুনর্জন্মবাদ পরলোক বিষয়ক অন্যান্য নানাপ্রকার মতের মধ্যে একটি মত মাত্র ছিল। বৈদিক কালে এইমতের কোন বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয় না। বৌদ্ধ কালেই পুনর্জন্ম মতের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। বৌদ্ধদিগের মধ্যে অসংখ্য সম্প্রদায় থাকিলেও পুনর্জন্ম বিষয়ে তাহাদের সকলের এক মত। বুদ্ধদেব স্বয়ং এই মত বিশ্বাস করিতেন। আধুনিক ভারতে

যে পুনর্জ্জন্মমতে লোকের বিশেষ আস্থা দৃষ্ট হয়, তাহাও আমাদের পরম্পরাপ্রাপ্ত বৌদ্ধ শিক্ষার ফল। বৌদ্ধকালে ভারতে দর্শন-বিজ্ঞানাদির বিশেষ বিকাশ দৃষ্ট হয়। দার্শনিক সূত্রগ্রন্থাদি সেই সময়েই রচিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ যখন পুনর্জ্জন্মমত গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহারা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইয়াছিলেন যে জন্মান্তর সম্বন্ধে যদি কাহারো কোন স্মৃতি না থাকে, তবে পুনর্জ্জন্মমত স্বীকার করিলেও, জীবের ব্যক্তিগত একত্বের বিচ্ছেদ অনিবার্য্য। সেরূপ পুনর্জ্জন্মমতের কোন সার্থকতা থাকে না, এবং সেরূপ ভিত্তিশূন্য কল্পনা দার্শনিকের গ্রহণের অযোগ্য। এই দোষ নিরাকরণার্থই বোধ হয় বৌদ্ধদিগের মধ্যে "জাতিস্মর" কল্পনা প্রথমে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায় বুদ্ধাদি অনেক বৌদ্ধ মহাপুরুষই 'জাতিস্মর'— অর্থাৎ তাহাদের নিজের পূর্ব্বজন্ম বিষয়ক স্মৃতি অবিচ্ছিন্ন ছিল। ইহারই প্রভাবে আজকালও আমাদের দেশে সংবাদপত্রে সময়ে সময়ে এরূপ 'জাতিস্মর' লোকের কথা শুনা যায়। তাহারা সকৈতবে অথবা অকৈতবে সময়ে সময়ে স্ব স্ব পূর্ব্বজন্মের কথা বলিয়া প্রতিবেশী সকলকে চমৎকৃত করিয়া থাকেন। পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি যদি অনেকের পক্ষে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে জনসাধারণের পূর্ব্বজন্ম-বিষয়ক বিস্মৃতিকে সাময়িক মূর্চ্ছার ন্যায় মনে করা যাইতে পারে, এবং বিশেষ সাধনা দ্বারা সেই বিস্মৃতি দূর হইবে এরূপও আশা করা যাইতে পারে। এরূপ হইলে পুনর্জ্জন্মমতের বিরুদ্ধে আর কোন আপত্তি থাকিত না। কিন্তু দেশ অথবা কাল-বিশেষে প্রচলিত পরম্পরা-প্রাপ্ত কতগুলি জনপ্রবাদ মাত্র অবলম্বন করিয়া জাতিস্মরদিগের অস্তিত্ব প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া গণ্য করা যায় না। দৃষ্ট হইতেই অদৃষ্টের অনুমান করিতে হয়, অদৃষ্ট হইতে অদৃষ্টের অনুমান করা যায় না। এমন কি বেদ বেদান্তেও কোন জাতিস্মরের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। শঙ্কর বলিতেছেন :—"যখন

ঋষি বামদেব ইহা জানিলেন, তখনই তিনি অনুভব করিলেন— 'আমিই মনু ছিলাম, আমিই সূর্য্য'— সম্যগ্ দর্শন লাভ হইলে সম্যগ্দর্শনের ফলস্বরূপ সর্ব্বাত্মত্বও লাভ হয়,— ইহা দ্বারা তাহাই দেখাইতেছে।" ব্রহ্মসূত্র ৩-৩-৩২ ॥ বেদবেদান্তে বামদেবপ্রভৃতি কৈবল্যপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণকে কোথাও জাতিস্মর বলিয়া উল্লেখ করা হয় না। তবে বৌদ্ধদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া উত্তরাধিকারসূত্রে পৌরাণিকগণও পুনর্জন্মমতকেই একমাত্র শাস্ত্রসিদ্ধ পরলোকবিষয়ক মত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গেই বৌদ্ধদিগের জাতিস্মর-কল্পনাও পৌরাণিকগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাপি কেহই বামদেবপ্রভৃতি কৈবল্যপ্রাপ্ত মহাপুরুষদিগকে জাতিস্মর বলিয়া উল্লেখ করেন না। বৌদ্ধ এবং পৌরাণিক সময়ে জন্মগ্রহণ করাতে শঙ্করাচার্য্যও যেন মাতৃস্তন্যের সহিত পুনর্জন্মমত, এবং সেই সঙ্গেই জাতিস্মর কল্পনা ও গ্রহণ করিয়াছিলেন। শঙ্কর জাতিস্মরের উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু জাতিস্মরের অস্তিত্ববিষয়ক কোন শাস্ত্র প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার মতে জাতিস্মরেরা কৈবল্যপ্রাপ্ত মহাপুরুষ হইতে ভিন্ন, এবং নিম্ন স্তরের। এমন কি ভিন্ন ভিন্ন জন্মে সেই জাতিস্মরদিগের ব্যক্তিগত একত্ব জ্ঞানও শঙ্কর স্বীকার করেন না। অপান্তরতমা প্রভৃতি কৈবল্যপ্রাপ্ত মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে কথা বলিতে গিয়া শঙ্কর জাতিস্মরেরও উল্লেখ করিতেছেন ঃ— "অপান্তরতমা প্রভৃতি ঈশ্বরগণও পরমেশ্বর দ্বারা এইরূপ স্ব স্ব অধিকারে নিযুক্ত হইয়া, কৈবল্যপ্রাপ্তির হেতুভুত সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়াও অক্ষীণকর্ম্মা থাকিয়া স্ব স্ব অধিকার কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। (পাঠক এস্থলে শঙ্করের ঈশ্বর এবং পরমেশ্বর ভেদের প্রতি লক্ষ্য করিবেন)। অধিকৃত কর্ম্মের শেষ হইলে, আবার তাঁহারা অপবর্গ প্রাপ্ত হয়েন। তাহাদের সেই (অধিকার বিষয়ক) কর্ম্মাশয় সকৃৎপ্রবৃত্ত

অর্থাৎ একবারমাত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। (বদ্ধজীবের কর্ম্মাশয়ের ন্যায় বীজাঙ্কুরবৎ এক কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তর উৎপন্ন করে না)। অধিকার ফল-দানার্থ সেই কৈবল্যপ্রাপ্ত মহাপুরুষেরা স্বয়ং নির্মুক্ত থাকিয়া ("স্বাতন্ত্র্যেণ") সেই কর্ম্মাশয়কে ইচ্ছামত অতিক্রম করিয়া, এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে প্রবেশের ন্যায়, ভিন্ন ভিন্ন দেহে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। স্বীয় অধিকৃত কার্য্য সাধনার্থ তাহাদের স্মৃতি ও অচ্ছিন্ন থাকে। দেহ, ইন্দ্রিয়, এবং প্রকৃতির উপরে তাহাদের শাসন থাকাতে, তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ দেহসকল নির্ম্মান করিয়া যুগপৎ অথবা ক্রমানুসারে বহু দেহে অধিষ্ঠিত থাকেন। কিন্তু তাহাদিগকে কেহ 'জাতিস্মর' বলে না, কারণ ইহা স্মৃতিপ্রসিদ্ধ যে তাহারা (অপান্তরতমা প্রভৃতি) সেই সেই ব্যক্তিই। (শঙ্করের এই কথাতে মনে হয়, 'জাতিস্মরেরা সেই সেই ব্যক্তিই' নহেন)। স্মৃতিতে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মবাদিনী সুলভা জনকের সহিত বিচার করিবার মানসে স্বীয় দেহ ত্যাগ করতঃ জনকদেহে প্রবেশ পূর্ব্বক, তাহার সহিত বিচার করিয়া, পুনরায় স্বদেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৩-৩-৩২। জাতিস্মরদিগের অস্তিত্বের উপরে পুনর্জন্মমত প্রতিষ্ঠিত করিবার পুর্ব্বে জাতিস্মরদিগের অস্তিত্ব নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন। সেরূপ প্রমাণ কুত্রাপি দৃষ্ট হইতেছে না। আবার 'জাতিস্মর' নামের যোগ্য একশ্রেণীর লোকের অস্তিত্ব দেশ বা কালবিশেষে প্রমাণসিদ্ধ হইলে ও তাহাদিগের জাতিস্মরত্ব কেবলমাত্র তাহাদিগেরই পুনর্জন্মের প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে। তাহা অপর সকল নরনারীর পুনর্জন্মের প্রমাণ হইবে কিরূপে? এইরূপে আমরা দেখিতেছি জাতিস্মরত্বের উপরে পুনর্জন্মবাদের প্রতিষ্ঠা বন্ধ্যা-পুত্রের রাজ্যলাভের ন্যায় ভিত্তি-শূণ্য।

(চ) পুনর্জন্মবাদের সহিত ক্রমবিকাশবাদের তুলনা।

ডারবিনের (Darwin) ক্রমবিকাশবাদের (Evolution theory) উপরে কেহ কেহ পুনর্জ্জন্মবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন। তাহাদের স্মরণরাখা কর্ত্তব্য যে ক্রমবিকাশবাদ জাতি-সম্বন্ধী (Species)। ভারতীয় পুনর্জন্মবাদ ব্যক্তি-সম্বন্ধী (Personal)। এই উভয় মতের বিষয় পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন। আবার ক্রমবিকাশবাদের মতে কোন জাতিবিশেষের বিনাশ দ্বারা অন্য জাতিবিশেষের উৎপত্তি হয় এরূপ নয়, কিন্তু পুনর্জ্জন্মবাদে এক দেহ-ধারীর বিনাশে অন্য দেহধারীর উৎপত্তি হয়। কিছুদিন হইল সম্বাদ-পত্রে প্রকাশ যে বিলাতে সাসেক্স (Sussex) নামক স্থানে ভূগর্ভ হইতে একটী নারীর শিরঃ-কপাল (Skull) বাহির করা হইয়াছে। আমাদের শিরঃ-কপাল হইতে তাহা দ্বিগুণ পুরু। তাহার চিবুক সিম্পাঞ্জি নামক বানরের মত, কিন্তু দন্ত মানুষেরই মত। মুখের গঠন দৃষ্টে অনুমিত হয় যে আমাদের মত এই জাতিরও কথা কহিবার শক্তি ছিল। ইহার মস্তিষ্কের মগজ-স্থান মানুষ হইতে এক তৃতীয়াংশ অধিক সংকীর্ণ। ডারবিনবাদিরা অনুমান করেন যে এই জাতিই সিম্পান্জি এবং মানবজাতির যোগস্থান। পঞ্চাশ সহস্র কি লক্ষবৎসর পূর্ব্বে এই আদি মানবজাতি জীবিত ছিল। ক্রমবিকাশের সূত্রে এই জাতিই সিম্পান্জি হইতে বর্ত্তমান মানবজাতিতে উন্নীত হইয়াছে। তাহাতে সিম্পান্জি জাতির বিনাশ হয় নাই। আবার এ স্থলে সিম্পান্জি অথবা এই জাতীয় মানব-বিশেষের ক্রমোন্নতির কোন কথাই নাই। মৃত্যুর পর কি হয় বা না হয়, সে সম্বন্ধে ক্রমবিকাশবাদী নীরব। “ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ” চার্ব্বাকের এই মতে ও ক্রমবিকাশবাদীর কোন আপত্তি নাই। তবে এই জাতিগত ক্রমবিকাশ দৃষ্টে যদি

মানবের ব্যক্তিগত ক্রমবিকাশেরও উপমা (Analogy) গ্রহণ করা সঙ্গত বোধ হয়, তবে ইহাদ্বারা মানবের অনন্ত উন্নতির মতই মাত্র সমর্থন করা যায়, কিন্তু মানবের শূকরত্ব বা কীটত্ব প্রাপ্তির মত সমর্থন করা যায় না।

উপনিষদের ও স্থানেস্থানে মানবের ব্যক্তিগত অনন্ত উন্নতির মতের অতি সুন্দর আভাস পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যকে জনকের প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশে আমরা অনন্ত উন্নতির মতেরই আভাস পাইতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেনঃ—"মৃত্যুর সময়ে জীব 'সবিজ্ঞান' থাকে, 'সবিজ্ঞান' ভাবেই গন্তব্য লোকে গমন করে।" শঙ্কর 'সবিজ্ঞান' শব্দের অর্থ করিতেছেন "স্বপ্ন কালের ন্যায় বিশেষ-বিজ্ঞানবান্।" "বিদ্যা, কর্ম্ম, এবং পূর্ব্ব-প্রজ্ঞা জীবের অনুগমন করে"। শঙ্কর 'পূর্ব্ব-প্রজ্ঞা' শব্দের অর্থ করিতেছেন—"অতীত-কর্ম্মফলানুভব-বাসনা," কিন্তু আমাদের বোধ হয় "পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মৃতি" অর্থ করাই সঙ্গত। "যেমন তৃণবিহারী জলায়ুকা (জোক) একটি তৃণ শেষ করিয়া অন্যতর বস্তুকে আশ্রয় করে, এবং স্বীয় শরীর সেই তৃণ হইতে উঠাইয়া, সেই অন্যতর আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত করে, এই জীবাত্মা ও সেইরূপ তাহার পূর্ব্বশরীরকে নিহত (নিপাতিত) এবং চৈতন্য-শূন্য করিয়া, অন্য নূতন পদবীতে আরোহন করে, এবং জলৌকার ন্যায় আপনাকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করে।

* "সবিজ্ঞানো ভবতি। সবিজ্ঞান মেবান্ববক্রামতি। তং বিদ্যাকর্ম্মনী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞাচ। তদ্যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বান্যমাক্রমমাক্রম্যা-ত্মানমুপসংহরত্যেবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাংগময়িত্বান্যমাক্রমমাক্র-ম্যাত্মানমুপসংহরতি। তদ্যথা পেশস্কারী পেশসোমাত্রামুপাদায়ান্যন্নবতরং কল্যানতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যাং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বা ন্যেষাং বা ভূতানাং" ইত্যাদি। বৃহদারণ্যক ৬-৪-২ হইতে ৪॥

সুবর্ণকার যেমন কোন সুবর্ণমূর্ত্তির সুবর্ণাংশ গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা অন্য এক নবতর কল্যানতর মূর্ত্তি নির্ম্মান করে, এই আত্মা ও সেইরূপ এই শরীরকে নিপাতিত এবং চৈতন্য বিহীন করিয়া অন্য নবতর, কল্যানতর রূপ গ্রহণ করে, এবং সেই নবতর কল্যানতর রূপ পিতৃলোকের বা গন্ধর্ব্বলোকের বা দেবলোকের বা প্রজাপতিলোকের, অথবা ব্রহ্মলোকের, অথবা অন্য কোন জীবলোকের যোগ্য হয়।" এস্থলে আমরা দেখিতেছি মৃত্যুর পর জীব যে রূপ গ্রহণ করে, বর্ত্তমানের তুলনায় তাহা "নবতর এবং কল্যানতর," দেবগন্ধর্ব্বাদি কোন উন্নততর জীবলোকের যোগ্য। এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা প্রচলিত পুনর্জ্জন্মমত, কুকুর, শূকর, অথবা কীটাদি রূপে জীবের অধোগতি প্রাপ্তির মত বাধিত হইতেছে। স্বর্ণকারের 'নবতর কল্যানতর,' মূর্ত্তি নির্ম্মানের দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবের অনন্ত উন্নতির মতেরই আভাস পাওয়া যাইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্য পরলোক প্রাপ্তিকে সবিজ্ঞান বলিতেছেন, অর্থাৎ তাহার মতে পরলোকগত জীবের পূর্ব্ব-স্মৃতি, অতএব ব্যক্তিগত একত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। জীবের বিদ্যা-কর্ম্ম এবং পূর্ব্ব-প্রজ্ঞা তাহার অনুসরণ করে। যাজ্ঞবল্ক্য কোন মূর্চ্ছা-প্রাপ্তির উল্লেখ না করাতে, তাহার মতের সহিত শঙ্করের মতের মহাপার্থক্য দৃষ্ট হয়। অনন্ত উন্নতির মতের সহিতই যাজ্ঞবল্ক্যের এই মতের বিশেষ ঐক্য দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ আমাদের মনে হয় যে শূকর কুকুর বা দংশমশককীটাদিরূপে জীবের জন্মগ্রহণ, অথবা লতা-ওষধি রূপে জীবের মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি ইত্যাদি শাস্ত্রীয় কল্পনা অর্থবাদ মাত্র। এই সকল অলীক বিভীষিকা প্রদর্শন দ্বারা শিশুতুল্য লোকসকলকে ধর্ম্মে এবং সদাচারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রাখাই এসকল অলীক কল্পনার উদ্দেশ্য, এবং জীবের অনন্ত উন্নতির মতই আমাদের শাস্ত্রের ও গূঢ় তাৎপর্য্য। যদি আমাদের এই অর্থবাদ-কল্পনা সত্য